মানবেন্দ্রনাথ রায়

জীবন ও দর্শন

সম্পাদনা

সমরেন রায়

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

সূচীপত্র

ভূমিকা

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান মানবেন্দ্রনাথ রায়। মানবেন্দ্রনাথের পিতা দীনবন্ধু ভট্টাচার্য চব্বিশ পরগণার আরবেলিয়ার বিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষক ছিলেন। আমার একটি ইংরাজি ভাষায় লিখিত বই, 'দি টোয়াইস বর্ণ হেরোটিক'' বইটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন এ্যাডভোকেট জেনারেল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতা প্রয়াত স্নেহাংশু আচার্য মন্তব্য করেছিলেন, ''আমাদের সঙ্গে এম. এন. রায়ের অনেক মত-পার্থক্য আছে, কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে চাংড়ীপোতা গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান লেনিনের সহকর্মী হিসাবে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের শীর্ষ নেতৃত্বে পৌঁছেছিলেন। এটি একটি বিস্ময়কর ব্যাপার।''

কিন্তু আরও বেশি বিস্ময়কর হলো এই দরিদ্র ভারতবাসী ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে মেক্সিকো, তাসখন্দ, চিন, রাশিয়া প্রভৃতি দূর দেশে বিপ্লবের নেতৃত্বে আসীন হয়েছিলেন। এবং বিপ্লবের নেতৃত্বে নিজের স্থান করেছিলেন একমাত্র নিজের রাজনৈতিক জ্ঞান ও পারদর্শিতার জন্যই। ১৯১৫ সালে গার্ডেনরীচ ডাকাতির মামলায় জামিনে ছাড়া পাবার পর মানবেন্দ্রনাথ আন্ডারগ্রাউন্ডে যান ২২ ফেব্রুয়ারী। সেইদিন বেলেঘাটায় একটি রাজনৈতিক ডাকাতি করে। তারপর প্রায় ১৬ বছর তিনি বিভিন্ন দেশে বৈপ্লবিক কাজ কর্মে লিপ্ত ছিলেন ২১ জুলাই ১৯৩১ সাল পর্যন্ত যেদিন ব্রিটিশ পুলিশ তাঁকে বোম্বাই শহরে গ্রেপ্তার করেন। আমেরিকার নিউ মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপিকা আমেরিকার গুপ্তচর বাহিনীর একটি ইতিহাসে লিখেছিলেন মানবেন্দ্রনাথকে ধরবার জন্য কলকাতার গুপ্তচর বিভাগের শীর্ষস্থানীয় অফিসার মিঃ জি. সি. ডেনহ্যাম আমেরিকায় পৌঁছে সেখানকার গুপ্তচর বিভাগ সংগঠন করেন। এবং এই মিঃ ডেনহ্যাম মানবেন্দ্রনাথকে ধরবার জন্য মেক্সিকো পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলেন।

১৯২৫ সালে যখন মানবেন্দ্রনাথ জার্মান থেকে বিতাড়িত হয়ে প্যারিস শহর থেকে ''দি মাসেস অফ ইন্ডিয়া'' পত্রিকা করছিলেন তখন তাঁকে ব্রিটিশ সরকারের চাপে ২৪ ঘন্টার নোটিশে ফ্রান্স থেকে বিতাড়ন করা হয়। তার

পরেই মানবেন্দ্রনাথ লন্ডন থেকে প্রকাশিত রজনী পাম দত্ত সম্পাদিত ''লেবার মন্ডলী'' পত্রিকার এপ্রিল মাসে লেখেন ঃ

''আমার চৌদ্দ বছর বয়স থেকে প্রায় ২০ বছর আমার উপর ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেপ্তার এবং অত্যাচার করেছে। ১৯১৫ সালে আমাকে ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচার থেকে দেশের বাইরে পালিয়ে যেতে হয়।

কিন্তু দেশের বাইরেও ব্রিটিশ পুলিশ আমাকে শান্তিতে থাকতে দেয় নি। এক দেশ থেকে অন্য দেশে, জাভা থেকে জাপান, চীন থেকে ফিলিপাইনস, আমেরিকা, মেক্সিকো এবং ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশেই তারা আমাকে তাড়া করে বেরিয়েছে। ১৯১৭ সালে মেক্সিকোয় সেখানকার প্রেসিডেন্ট ক্যারান্ধা আমাকে আশ্রয় দেন এবং দুবার ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক আমাকে তাদের হাতে তুলে দেবার অনুরোধ প্রত্যাখান করেন। মেক্সিকান সরকারের আনুগত্যে এবং পাশপোর্টের সাহায্যে আমি এবং আমার স্ত্রী ইউরোপে খানিকটা নিরাপদে পৌঁছতে পেরেছি''।

''লেবার মন্ডলী'' পরবর্তী সংখ্যায় মানবেন্দ্রনাথের ফ্রান্স থেকে বিতাড়ণের প্রতিবাদে লিখেছিলেন ফরাসী কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী আঁরি বারবুসে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন আর একজনও বিপ্লবীর কথা আমি জানি না যার বিরুদ্ধে ১৯১০ সাল থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে এক ঔপনিবেশিক শাসক শক্তি পাঁচটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মামলায় প্রধান আসামি হিসাবে অভিযুক্ত করে। এগুলি হলো হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা (১৯১০), স্যান ফ্রানসিসকার ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলা (১৯১৭); তিন দফা পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২২-২৪) কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৪) এবং মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯) ; কিন্তু এই সমস্ত সময়ের মধ্যেই তিনি সারা পৃথিবী ঘুরে মেক্সিকো, তাসখন্দ, রুশ, চিন এবং ভারতবর্ষে বিপ্লবের প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে। ১৯৫০ সালে দক্ষিন কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট সীনমান রী এক ভারতীয় সাংবাদিককে (পূর্ণেন্দু রায়) তাঁর বাসভবনে বিশেষ আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর লাইব্রেরিতে দেখান মানবেন্দ্রনাথের সমস্ত বই এবং বলেন, ওঁর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে কার্যকলাপই তাঁকে রাজনৈতিক জগতে অনুপ্রেরণা দেয়। ১৯৫৪ সালের ২৬ জানুয়ারি দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানীর সর্ববৃহৎ দৈনিক পুরো প্রথম পাতাটি জুড়ে মানবেন্দ্রনাথের প্রতি শোক জ্ঞাপন

করা হয়েছিল, যা ভারতবর্ষের কোন পত্রিকা করেনি।

মানবেন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যময় জীবনে তাঁর নিজের সার্থকতা একমাত্র তাঁর চিন্তার ব্যাপ্তিতে, বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি কোন সাফল্যলাভ করেন নি, যা লেনিন, স্ট্যালিন, মাও জে দঙ বা তাঁরই এক সময়ের ছাত্র হো চি মিন করেছিলেন। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবার্ট নর্থ এবং সোনিয়া অয়দিন "এম. এন. রয়েজ মিশন টু চায়না (ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯১৫ সালে প্রকাশিত) পুস্তকে মন্তব্য করেছেন, "এটা বলা মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে অনগ্রসর এবং শিল্পে অনুন্নত দেশগুলির সম্পর্কে মৌলিক কমিউনিস্ট নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এম. এন. রায়ের স্থান লেনিন এবং মাও সে টুঙ - এর সমপর্যায়ের (পৃষ্ঠা ৩)। ১৯১৫ সালের পরিকল্পিত সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটেনি। ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলন তাঁরই উদ্যোগে সংগঠিত হয়েছে কিন্তু কমিউনিস্ট বিপ্লব ঘটেনি, কিন্তু সেই নীতির সঠিক প্রয়োগ করে হো চি মিন ভিয়েতনামে বিপ্লব সংগঠিত করতে সার্থক হয়েছেন। ১৯৩০ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তাঁরই গড়ে তোলা কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক তিনি বর্জিত হয়েছেন। যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে ১৯২০ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত শীর্ষস্থানে ছিলেন, সেই আন্তর্জাতিক থেকে ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি ও তাঁর বহু ইউরোপীয় এবং আমেরিকান সহযোগীরা বহিস্কৃত বলে গণ্য হন। তাঁর অপরাধ ছিল হিটলারের ফ্যাসিবাদী অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট এবং সোশ্যালিস্টদের যৌথ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানানো, যে জন্য ব্র্যান্ডলার-থ্যালহাইমার প্রভৃতি জার্মান কমিউনিস্ট সহ ১৬টি ইউরোপীয় দেশের কমিউনিষ্ট নেতাদের তিনি একত্রিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে যেটি তাঁর একান্ত নিজস্ব, সেখানে তিনি তাঁর বিরাট প্রতিভা নিয়ে বিরাজ করেছেন) কারুর কাছেই মাথা না নুইয়ে, কোন প্রলোভনেই আপোস না করে।

১৪ বছর বয়স থেকেই মানবেন্দ্রনাথ স্বাধীনতা ও মুক্তির আদর্শে নিজেকে নিয়োজিত করেন। সিপাহি বিদ্রোহের পলাতক আসামি শিবনারায়ণ স্বামীর কাছেই প্রথমে যোগ, তারপর সমাজ-বিপ্লব এবং গেরিলা যুদ্ধের কৌশল শেখেন। শিবনারায়ণ স্বামী পরে বলেছিলেন নরেন ভট্টাচার্যই (মানবেন্দ্রনাথের পিতৃদত্ত নাম) তাঁর সবথেকে উপযুক্ত শিষ্য হয়েছিল। শিবনারায়ণ স্বামীই মানবেন্দ্রনাথকে ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যর কুফল সম্পর্কে অবহিত

করেন।

শিবনারায়ণ স্বামীর পর বিখ্যাত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী রামদাস বাবাজীর কাছে ধর্ম এবং দর্শন শিক্ষা, সেই সঙ্গে নিজের পিতা সংস্কৃত পন্ডিত দীনবন্ধু ভট্টাচার্যের কাছে সংস্কৃত সাহিত্য এবং দর্শন শিক্ষা) সমস্তই তিনি দেশের স্বাধীনতা, মানুষের মুক্তির সাধনায় নিয়োজিত করেন। দ্বিতীয়বার দেশ ছাড়ার আগে কপ্তিপোদায় যতীনদার (বাঘা যতীন) কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর ওঁরা দুজনে 'ব্রহ্ম' নিয়ে আলোচনা করেন, একথা আমায় বলেন প্রয়াত নলিনী কর যিনি তখন কপ্তিপোদায় উপস্থিত ছিলেন।

১৯১৬ সালে আমেরিকা পৌঁছবার পর যখন জার্মানদের অস্ত্র পাঠানোর ব্যাপারে কথাবার্তা চলছে তখন আমেরিকার স্যান ফ্র্যানসিসকো শহরে জার্মান সামরিক উপদেষ্টা ফন ব্রিনকেন -এর সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথকে কয়েকবার দেখা করতে হয়। ফন ব্রিনকেন স্যান ফ্রানসিসকোর হিন্দু-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হ'ন এবং দু'বছর কারাদন্ডে দন্ডিত হন। পরে ১৯২০ সালে ৬ অক্টোবর প্রকাশিত তাঁর স্মৃতিকথায় একটি কিস্তিতে 'সান ফ্রানসিসকো এগজামিনার' পত্রিকায় তিনি লেখেন ঃ "প্রাচ্য থেকে একজন নেতা এসেছিলেন, তিনি উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর আসল নামটি আমি জানতুম না, মিঃ মার্টিন বলেই তাঁকে জানতুম। এম. এন. রায় যখন ১৯১৫ সালে দ্বিতীয়বার ব্যাটাভিয়ায় যান, তখন মিঃ মার্টিন নামে একটি পাশপোর্ট নিয়ে যান। দীর্ঘাঙ্গী, সুপুরুষ, রাশভারি লোক, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অত্যন্ত বিদগ্ধ। বেশির ভাগ কাজই তিনি প্রধান জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে করতেন, কিন্তু অল্প বিস্তর কাজ আমার সঙ্গেও করেছিলেন। (ভারতীয়) বিপ্লবীদের মধ্যে তিনি খুব উচ্চমানের লোক ছিলেন।"

মানবেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে ছিলেন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী। দেশের ও দেশের মানুষের মুক্তিই ছিল তাঁর অনুসৃত আদর্শ। পরবর্তী জীবনে একজন মার্কসীয় আদর্শবাদী হন' শোষিত মানুষের মুক্তিই তখন তাঁর জাতীয় মুক্তির লক্ষ্য। জাতীয় মুক্তি তখন আর কয়েকজন মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর তাঁর আর লক্ষ্য নয়। কীভাবে তিনি জাতীয়তাবাদী বিপ্লব থেকে মার্কসীয় আন্তর্জাতিকতা, যার মূল আদর্শ শ্রমিক এবং শোষিত জনসাধারণের মুক্তি, গ্রহণ করলেন, কেন করলেন এবং কীভাবে তাঁর চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটালো তার

বিশ্লেষণ এবং কীভাবে তাঁর চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটালো তার বিশ্লেষণ এবং অনুধাবনের প্রয়োজন আছে। কাজটি কঠিন, কারণ এই সময়ে তাঁর কর্মজীবন সুদূর মেক্সিকো থেকে রাশিয়া এবং চিন পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

মানবেন্দ্রনাথের মতাদর্শ এবং চিন্তাধারার বিবর্তন নিয়ে অনুশীলন করার একটি অন্তরায় হলো, তাঁর মার্কসবাদী চরিত্র সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা। মানবেন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর সম্পর্কে এই সব ধ্যান-ধারণা দূর করবার জন্য অনেক লিখেছেন এবং বক্তৃতা দিয়েছেন। মার্কসবাদ সম্পর্কে তাঁর একটি নিজস্ব চিন্তাধারা ছিল। মার্কসবাদ বলতে তিনি কি বোঝেন তা নিয়ে অনেক লিখেছেন এবং তাঁর নিজের বিচার ও বিশ্লেষণ পেশ করেছেন।

মার্কসীয় তত্ত্বের বিশ্লেষণের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে লেনিনের মত-পার্থক্য হয়েছিল এবং বিপ্লবের পর্যায় নির্ধারণের ব্যাপারে শুধু লেনিন নয়, লেনিনের মার্কসীয় পূর্বসূরীদের মতের সঙ্গেও তাঁর মতের অমিল দেখা যায়। মানবেন্দ্রনাথ মনে করতেন যে উপনিবেশেই আগে বিপ্লব সংগঠন করা প্রয়োজন এবং উপনিবেশে বিপ্লবের ফলেই শাষক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে অর্থাৎ পশ্চিম ইউরোপীয় শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বিপ্লব সম্ভব হবে। কারণ উপনিবেশগুলি থেকে শিল্পোন্নত দেশগুলি যে মুনাফা অর্জন করে, সেই মুনাফার কিছু অংশ শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বন্টন করে সেখানকার শ্রমিক শ্রেণীকে বিপ্লব-পরান্মুখ করতে সক্ষম হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দেখা গেল দ্বিতীয় (সমাজতান্ত্রিক) আন্তর্জাতিকের বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দলগুলি নিজের দেশের জাতীয় স্বার্থে ভিড়ে গেল, ফলে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙ্গে গেল। এই সময়েই, ১৯১৫ সালে লেনিন তৃতীয় (কমিউনিস্ট) আন্তর্জাতিক সংগঠন করার ডাক দেন) জাতীয়তাবাদের আদর্শের বিরুদ্ধে।

গোঁড়া ইউরোপীয় মার্কসবাদীরা স্থির সিদ্ধান্ত করে রেখেছিলেন যে আগে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তারপর ঐসব উন্নতশীল দেশের সমাজতান্ত্রিক সরকার উপনিবেশ এবং অনুন্নত দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। মানবেন্দ্রনাথ ঠিক উল্টোটাই বললেন। তিনি বললেন যতদিন না উপনিবেশিক এবং অনুন্নত দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন শিল্পোন্নত দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতে পারে না; এবং বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আজও কোন শিল্পোন্নত দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়নি।

একমাত্র ভিয়েতনাম. চিন, কিউবা প্রভৃতি কয়েকটি অনুন্নত দেশেই তা সম্ভব হয়েছে। তৃতীয় (কমিউনিস্ট) আন্তর্জাতিকে লেনিনের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের যে ঐতিহাসিক বিতর্ক হয়েছিল. দুজনের এই ব্যাপারে মত-পার্থক্যই ছিল তার অন্যতম বিতর্কের বিষয়।

এছাড়াও অন্য অনেক বিষয়ে গোঁড়া মার্কসবাদীদের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের মত-পার্থক্য ছিল। বস্তুত প্রায় সকলের সঙ্গেই ওঁর কিছু কিছু মত-পার্থক্য ছিল, মতদ্বৈধতা যেন ওঁর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এবং এই মতদ্বৈধতা একদিকে যেমন ওঁর অসাফল্যের কারণ, অন্যদিকে ওঁর জ্ঞান-পিপাসার আধারও) যেজন্য ওঁর চিন্তাধারার বিবর্তনও বৈচিত্র্যময় এবং তা অনুশীলন করা এত চিত্তাকর্ষক।

মার্কস এবং এঙ্গেলস তাঁদের সমসাময়িক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে কতকগুলি সম্ভাব্য পরিণাম সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি ভবিষ্যদ্বানীর মত শুনিয়েছে। অসমালোচক সরল-চিত্ত অনুগামীরা সেইসব ভবিষ্যতবাণীকে নির্ভুল বলে ধরে নেন যার ফলে তাঁদের প্রতিপাদ্যগুলি নিশ্চিত ঐতিহাসিক বিবর্তনের রূপ নেয়, খানিকটা পূর্ব-নির্দিষ্ট অদৃষ্টবাদের মত। মানবেন্দ্রনাথ প্রায় বলতেন এবং লিখতেন যে মার্কস মানব-সমাজের ঠিকুজি-কুষ্ঠি তৈরি করে যান নি। মার্কস এবং এঙ্গেলস -এর রচনা খুবই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং পদ্ধতি দিয়ে ইতিহাস এবং সমাজ বিবর্তনের বিচার ও বিশ্লেষণ। সেইসব বিচার বিশ্লেষণ পথনির্দেশক, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই পরবর্তী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে) তাই সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সেগুলির পুনর্বিচারের প্রয়োজন। প্রতিবন্ধকতার কারণ তাঁদের প্রতিপাদ্যগুলিকে অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যতবাণী বলে ধরে নেওয়ার জন্য। মার্কসীয় চিন্তাধারার বহু চিন্তাবিদকেই এইসব প্রতিবন্ধকগুলিকে সংশোধন করতে হয়েছে। লেনিন, ট্রটস্কী, রোজা লাক্সেমবুর্গ, এমনকি মাও জে দঙ কেও। এঁদেরই সমগোত্রীয় ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ।

শিল্প সভ্যতার বিবর্তন বিশ্লেষণ করে মার্কস এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে শিল্পের উন্নতির চূড়ান্ত পর্যায় সাম্যবাদী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে। মার্কসের বিশ্লেষণে এটি শিল্প-সভ্যতার অনিবার্য পরিণতি। মানবেন্দ্রনাথ এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ধারণাটি সংশোধন করেন। পরবর্তীকালের অবস্থার পর্যালোচনা করে

মানবেন্দ্রনাথ বলেন যে সাম্রাজ্যবাদী শিল্পোন্নত দেশগুলি উপনিবেশে কাঁচামালের পরিবর্তে যে সব ভারী যন্ত্রপাতি সরবরাহ করছে তার ফলে উপনিবেশ এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটছে তার মধ্যেই রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের অঙ্কুর বিরাজ করছে। মানবেন্দ্রনাথের এই চিন্তাধারায় ১৯২৮ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে পেশ করেন "ডিকলোনাই জেশন থিওরি" যেটিকে কুশিনেন ইত্যাদি গোঁড়া মার্কসবাদীরা ধিক্কার করেছিলেন। এর দেড় বছরের মধ্যেই মানবেন্দ্রনাথ দেশে ফিরে আসেন এবং অত্যন্ত সন্তর্পণে লুকিয়ে ফিরে আসার জন্য তাঁর বহু লেখা-পত্তরই তিনি বার্লিনের এক প্রকাশকের ঘরে সেসব রেখে আসেন। হিটলার ক্ষমতায় আসার পর এইসব কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলে।

সম্প্রতি ১৯১৫ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি "ডকুমেন্টস্ অফ দি কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া"র ভলিয়ুম ৩-সি ১৯২৮ খন্ডে প্রয়াত দিলীপ বসুর সহযোগীতায় ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। এবং এই ভলিয়ুমেই কুশিনেনের সমালোচনা এবং মানবেন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তরও প্রকাশিত হয়েছে। ১৯১৫ সালে দিলীপ বসুর বাড়িতে আমি যখন ডঃ অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি তিনি এসব কিছুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন এবং এও অস্বীকার করেন যে মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বার্লিনে তাঁর সৌহার্দ ছিল। অথচ, মুজফ্ফর আহমেদ সাহেব তাঁর "আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি" বইতে দুটি তথ্য পরিবেশন করে গেছেন। এক, ডঃ অধিকারী ১৯২৮ সালে কলকাতায় ওয়ার্কার্স এ্যান্ড পেজান্টস পার্টির সম্মেলনে মুজফ্ফর আহমেদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বলেন "আমি এম. এন. রায়ের কাছ থেকে আসছি। দুই, ঐ বইতেই মুজফ্ফর আহমেদ সাহেব ক্লেমেন্স পাম দত্ত'র একটি চিঠি ছেপেছেন। মুজফ্ফর আহমেদ জানতে চেয়েছিলেন যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক থেকে এম.এন. রায় কেন বিতারিত হয়েছিলেন। ক্লেমেন্স পাম দত্ত ঐ চিঠিতে মুজফ্ফর আহমেদকে লিখছেন, গঙ্গাধর অধিকারী জানবেন, তাঁর সঙ্গে রায়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, এবং রায় তাঁকে সবকিছুই বলেছেন। ইতিহাসের কি বিচিত্র গতি।

পুরাতন নিষ্প্রাণ চিন্তাধারা বা মতবাদকে মানবেন্দ্রনাথ কোনদিনই যন্ত্রের মত আকঁড়ে ধরে থাকেন নি। এজন্য অনেকে তাঁকে অসংলগ্নতা দোষে দুষ্ট

বলেছেন, কিন্তু বোঝবার চেষ্টা করেন নি। যখন তিনি বুঝলেন যে জার্মান অস্ত্র সাহায্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্ভব নয়, তখন তিনি সেই পথ পরিত্যাগ করতে দ্বিধা করেন নি এবং যে দেশের (মেক্সিকো) আতিথেয় তিনি গ্রহণ করেছিলেন, সেই দেশের অর্থাৎ মেক্সিকোর সমস্যা সমাধানে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। ১৯৩৯ সালে যখন তিনি দেখলেন যে হিটলারের ফ্যাসি বাহিনী পৃথিবীতে প্রগতি এবং স্বাধীনতার পরিপন্থী এক বিরাট শক্তি হয়ে উঠেছে, তখন তার বিরুদ্ধে তিনি সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন।

মার্কস ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান এবং সমস্যা নিয়ে কিছু লিখে জাননি; তাঁর সময়ে ফ্যাসিবাদের সম্ভাবনা বা লক্ষণ তিনি দেখতে পান নি। মানবেন্দ্রনাথ তখন বললেন যে ফ্যাসিবাদের ধ্বংসের উপরই সমস্ত পৃথিবীর মুক্তি, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ভারতের স্বাধীনতা নির্ভর করছে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করার জন্য জাতীয়তাবাদীদের কাছেও তিনি হেয় গণ্য হয়েছিলেন এবং জাতীয় কংগ্রেস থেকে বহিস্কৃত হয়েছিলেন। (এখন অবশ্য কংগ্রেস দলের নেতা ভি.এন. গ্যাডগিল বলে বেড়াচ্ছেন যে তাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যেমন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, এখন আবার সেই রকম লড়াই করবেন ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে। যখন যে পথ বা মত তাঁর মনে হয়েছে যে মানুষের মুক্তির বা স্বাধীনতার পরিপন্থী, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে মানবেন্দ্রনাথ কোনদিন ইতস্তত করেন নি।

কেবল একটিমাত্র ক্ষেত্রে এর ব্যাতিক্রম দেখা যায়। সেটি পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে। মৃত্যুর (১৯৫৪ সালের ২৫ জানুয়ারি) আগে পর্যন্ত তাঁর মনে ভয় ছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বহির্বিপদ কাটেনি। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পশ্চিমী শক্তিগুলি প্রথম থেকে যে চক্রান্ত করেছিল যা তিনি দেখেছিলেন এবং ফ্যাসিস্ত জার্মানিকে যে সাহায্য এবং উৎসাহ ওঁরা প্রথম দিকে দিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে ব্যহত করবার জন্য সেই সময়কার ইতিহাসের প্রভাব তাঁর মন থেকে তিনি কোনদিন দূর করতে পারেন নি।

যে কারণে একটি রাষ্ট্রে সোশ্যালিজম বাঁচিয়ে রাখার জন্য মানবেন্দ্রনাথের আগ্রহ এতই প্রবল ছিল যে তার জন্য ট্রটস্কির সঙ্গে তাঁর সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে স্তালিনের পক্ষ অবলম্বন করতে তিনি দ্বিধা করেন নি। স্তালিনের

প্রতি মানবেন্দ্রনাথের সম্প্রীতি তারপর থেকে কোনদিনই ক্ষুন্ন হয়নি। স্তালিনের আমলে সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সমস্ত অত্যাচার, নিপীড়ন সত্ত্বেও। কমিনটার্নের যে বিতর্কে একটি রাষ্ট্রে সোশ্যালিজম বাঁচিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ১৯২৮ সালের সেই সভায় শেষ বক্তা হিসাবে মানবেন্দ্রনাথ ট্রটস্কিকে প্রশ্ন করেছিলেন, "যদি সোভিয়েতের বাইরে আর কোন দেশে আজ সোশ্যালিষ্ট বিপ্লব সম্ভবপর না হয় তাহলে কি আমরা একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নেই সাম্যবাদী ব্যবস্থা দৃঢ় করে রাখব না?"

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে স্তালিন যখন পূর্ব ইউরোপে সৈন্য ও অস্ত্রের মাধ্যমে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করেন একমাত্র তখনই মানবেন্দ্রনাথ স্তালিনের এই পদক্ষেপের প্রতি তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। স্ট্যালিনের কাছেই তিনি 'রেড নেপোলিয়ানিজম' -এর তাৎপর্য শুনেছিলেন, কিন্তু ১৯৪৫-৪৬ সালে তিনি যখন· বাস্তব ক্ষেত্রে ইউরোপে এর প্রয়োগ দেখলেন তখন প্রতিবাদ না করে থাকতে পারেন নি। "আমি যদি স্তালিন হতুম" (If I were Stalin) শীর্ষক কতকগুলি প্রবন্ধে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন, তাঁর পত্রিকা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়ার পাতায়। মানবেন্দ্রনাথের মতে ইউরোপের মানবতাবাদী সংস্কৃতি এবং উন্নততর সভ্যতার ভিত্তিতেই কমিউনিজম-এর পূর্ণ এবং সুস্থ বিকাশ সম্ভব।

মানবেন্দ্রনাথ নিজে মার্কসবাদ এবং মানবতাবাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব আছে বলে স্বীকার করতেন না। শুধু তাই নয়, তিনি মনে করতেন কার্ল মার্কস নিজেও মানবতাবাদী ছিলেন। কিন্তু মার্কসের গোঁড়া অনুগামীরা তাঁর রচনা আক্ষরিকভাবে ব্যাখ্যা করে সেইসব রচনাকে ধর্ম সূত্রের মত গোঁড়াভাবে মেনে নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। যদিও তিনি মনে করেন, মার্কসের অনেক রচনা তাঁরই অন্য রচনার বিরোধী মত প্রকাশ করেছে। তাই, মানবেন্দ্রনাথ বহুবার বলেছেন এবং লিখেছেন যে মার্কসবাদ অভ্রান্ত অপরিসীম অপরিবর্তনীয় কিছু সূত্রের সমষ্টি নয়, মার্কসবাদ ইতিহাস এবং ঘটনাবলীর বিচার এবং অনুশীলনের একটি প্রকৃষ্ট পন্থা - যেখানে ব্যক্তি বিশেষের মাহাত্ম্য বা নেতৃত্ব বড় কথা নয়। যা গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় তা হলো ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক তাৎপর্যের বৈজ্ঞানিক বিচার - সভ্যতা এবং সংস্কৃতির অগ্রগতির মাপকাঠিতে।

স্তালিন সম্পর্কে তাঁর অবশ্য দুর্বলতা ছিল। যে জন্য ১৯৫০ সালে একটি

প্রবন্ধে তিনি স্তালিনকে 'বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ' বলে অভিহিত করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে একটি বিশেষণ যোগ করে দেন - শ্রেষ্ঠ মানুষ মানেই ভাল মানুষ নয়। এর কিছু দিন পূর্বেই তিনি যতীন মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে একটি রচনায় লেখেন, "আমি পৃথিবীর বহু মহান ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসেছি, তাঁরা মহান, ইতিহাসে স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, কিন্তু যতীনদার মত সৎ এবং ভাল মানুষ আমি আর দেখিনি।

মানবেন্দ্রনাথের চারিত্রিক একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কোন মতেই রাজনৈতিক মত-পার্থক্যের কারণে ক্ষুন্ন হতে দিতেন না। একটি ছোট্ট ঘটনার কথা উল্লেখ করব। প্রয়াত ভূপতি মজুমদারের সঙ্গে যখন আমি সাক্ষাৎ করি, নরেন ভট্টাচার্যের জীবন সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান, তখন তিনি আমায় এটি বলেছিলেন। ১৯০২ সালের নির্বাচনে ভূপতি মজুমদার পরাজিত হন। সকালের খবরের কাগজে খবরটি পড়ে মানবেন্দ্রনাথ ওঁকে ফোন করে বলেন, "ভূপতি অভিনন্দন নিও, আমরা আসছি"। ভূপতি আমায় বলেন, "স্বভাবতই আমার মনটা খারাপ ছিল, কিন্তু নরেন সস্ত্রীক এসে হৈ হৈ করে সমস্ত দিন কাটিয়ে আমায় নির্বাচনের শোক ভুলিয়ে দিয়েছিল। একমাত্র নরেনের পক্ষেই এটা সম্ভব ছিল।"

বার্লিনে থাকাকালীন ব্যাঙ্ক মালিক সাইমনের বাড়িতে মানবেন্দ্রনাথ প্রায়ই আড্ডা দিতে যেতেন, সেখানে বার্নস্টাইন, কাউৎস্কি, থ্যালহাইমার, আর্নেস্ট মেয়ার প্রমুখ সকলেই আসতেন। প্রত্যেকেরই বিভিন্ন মত ছিল কিন্তু তাতে আড্ডার কোন বিঘ্ন ঘটতো না, বিভিন্ন মত জানার এবং বিনিময়ের একটা সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠতো।

ব্যক্তিগত সাফল্যের চেয়ে চিন্তার ব্যাপ্তি, মানুষের মুক্তির পথ খোঁজা - এর ওপরেই মানবেন্দ্রনাথ বেশি গুরুত্ব দিতেন। একদিক দিয়ে বলা যায় তিনি রাজনৈতিক যোগী ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যেই বলতেন, 'সাফল্য আমার বাসনা নয়'। 'স্মৃতিকথা'য় তিনি লিখেছেন "সাফল্যই জীবনের মাহাত্ম্যের মাপকাঠি হয়েছে। কিন্তু মহৎ লোকেদের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর অনেকেই সাফল্যের দাম দেওয়ায় চেয়ে অসাফল্য এবং অপ্রিয়তা বরণ করে নিয়েছে"। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে যখন ১৯২৮ সালে বার্লিনে চলে আসেন, অসুস্থতার কারণে, তখন স্তালিন নিজে তাঁকে দেশ ছাড়ার অনুমতি পত্রটি দেন, একথা আমায়

বলেছেন প্রয়াত স্নেহাংশুকান্ত আচার্য। (এর আগে ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মানবেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষ ফিরতে চেয়েছিলেন - বস্তুত: প্রয়াত মুজফ্‌ফর আহমেদ আমাকে কয়েকবার বলেছেন, "আপনি খোঁজ নিন, আমরা শুনেছি উনি বোম্বাই-এ এসেছিলেন।" সেই সময় স্তালিন ওঁকে বলেছিলেন, "তুমি পৃথিবীর ৫ ভাগের ১ ভাগ অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট নেতা (কমিনটার্নের নেতৃত্ব ছাড়া তিনি ছাপাখানা কর্মচারী ইউনিয়ন থেকে নির্বাসিত সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্য ছিলেন), কেন তুমি ভারতবর্ষে ফিরে যেতে চাইছ? ভারতবর্ষে তুমি কোনদিনই সাফল্য লাভ করতে পারবে না।" মানবেন্দ্রনাথ হেসে বলেছিলেন, "পৃথিবীর ৫ ভাগের ১ ভাগ মানুষ আমার দেশে বাস করে, তাদের স্বাধীনতা, তাদের মুক্তির চেষ্টা না করে আমি কি করে এখানে নিশ্চিন্তে থাকতে পারি?"

মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতা যে মানুষ জীবনের ব্রত করেছিল, ব্যক্তিগত সাফল্য তাঁর কাছে গুরুত্ব পায়নি। কোন বাধা তাঁকে হতাশ করতে পারেনি।

যখন ভারতবর্ষের জেলের ছোট্ট নির্জন কুঠরির মধ্যে মেনডেলজন -এর মৃত্যু যাত্রার বেহালার সুর পাশের কবর খানা থেকে ভেসে আসতো, সেই সঙ্গীত তাঁকে বিষন্ন করতো না, তাঁর মনকে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করত। জেল থেকে স্ত্রীকে লিখতেন, "এক বছর কেটে গেল, আর পাঁচ বছর বাকি" অথবা "চার বছর কেটে গেল, আর মাত্র দু' বছর"।

এক আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ

এম. এন রায়ের জীবনচরিত বিষয়ক চিন্তন কেবলমাত্র ঘটনাপঞ্জির ক্রমবৃত্তান্ত হতে পারে না, অথবা বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন দেশে তাঁর রাজনৈতিক জীবনভূমিকার গল্পকথার সমষ্টিও হতে পারে না, অথবা তাঁর নিজপক্ষ সমর্থনে বিভিন্ন সময়ে যে কর্মনীতি ও কৌশল তিনি নিয়েছিলেন তাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে কোনো জোরালো যুক্তি খাড়া করার বিষয়ও হতে পারে না। তাঁর মনোগত যে সব ভাবনা ছিলো ও যেসব বিরুদ্ধ ভাবনার সঙ্গে তাঁর বিবাদ ছিল; এবং তাঁর যুগের আর যেসব ধ্যানধারণা ছিলো,- এই সমস্তকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েই রায়ের জীবনচরিতকে বুঝতে হবে। মানবেন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনাগুলি, অথবা বলা যায়, তাঁর ব্যবহার, মর্যাদাবোধ, কোনো ঘটনার বিকাশে যেভাবে ক্রিয়াত্মক হয়েছে অথবা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, সেই সবই বহুল পরিমাণে তাঁর নিজস্ব ভাবনার দ্বারা তাড়িত হয়ে বিশেষ সময়ে বিশেষ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে। ভাবনা এবং ঘটনা পরস্পর গ্রথিত ছিলো তাঁর জীবনে। সফল মানুষ বলতে যা বোঝায় তিনি তা ছিলেন না। যদি তিনি তাঁর ভাবনার বিপরীত কোনো কাজ করতেন তবে তাঁকে সুবিধাবাদী আখ্যা অনায়াসে দেওয়া যেতে পারতো। আর যদি তিনি লোক লজ্জার ভয়ে তাঁর কোনো কোনো অভিপ্রায়কে সংশোধন করতে অস্বীকার করতেন তবে তাঁকে একগুঁয়ে এবং অবাস্তববাদী বলা যেতে পারতো।

স্পষ্ট কথায় বলতে গেলে দেশকে স্বাধীন করার তীব্র আকাঙ্খা থেকেই এম. এন. রায়ের ভাবনাগুলি গড়ে উঠেছিল, যেটা তাঁর পক্ষে ছিলো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রথমদিকে হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতার ওপর অতিভক্তি থেকে তিনি বিশ্বাস করতেন যে হিন্দু সংস্কৃতি পশ্চিমি সংস্কৃতি থেকে অনেক উন্নতমানের। তাঁর এই ধরনের ভাবনা বিদেশির (বা অপরিচিতের) প্রতি আদিম প্রবৃত্তিজাত ঘৃণা বা হিংসা থেকে উদ্ভূত হয়নি, অথবা একদা রাজ্যশাসনে নিযুক্ত কোন পদচ্যুত

উচ্চপদস্থ আমলা পরিবারের আহত অভিমানের পরিণাম থেকেও জাত হয় নি; অথবা পুরোহিত শ্রেণীর জাত্যাভিমান, কিংবা স্বার্থে আঘাতপ্রাপ্ত সুবিধাভোগী সামন্ত বা জোতদারদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার ফল থেকেও নয়। কারণ রায় এই ধরনের কোনো গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। যদিও তাঁদের একটি পারিবারিক কালীমন্দির ছিল। যার আয় থেকেই সংসারযাত্রা নির্বাহ হতো, এবং যে মন্দিরের কার্যকলাপ কোনভাবেই ব্রিটিশ শাসনের ফলে ব্যাহত হয়নি।

বরং তিনি এমন একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যাঁরা অনেক কিছু আশা করতেন। ইংরেজি শিক্ষার ফলে ভারতবর্ষে অগ্রগতির অনেক পথ খুলে গিয়েছিলো যা মুসলমানদের শাসনকালে ছিলো না। প্রকৃতপক্ষে তিনি যে গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা পূববর্তী মুসলমান শাসকদের অপছন্দ করতেন ইংরেজ শাসকদের থেকেও বেশি, এবং সম্ভবত ব্রিটিশরা মুসলমান শাসকদের গদিচ্যুত করার ফলে তাঁরা খানিকটা মুক্তির স্বাদও পেয়েছিলেন। রায় যে রাজদ্রোহী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের অনুপ্রাণিত করতো বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ। এটা অবশ্যই ভাববার বিষয়, আনন্দমঠ গ্রন্থখানি মুসলমানদের হাত থেকে, নাকি ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার জন্য লেখা হয়েছিলো।

যে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে রায় মানুষ হয়েছেন, সেই সমাজ ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের ব্যাপারে হয় উদাসীন ছিলো অথবা বিরোধী ছিলো। সিপাহি বিদ্রোহের সৈন্য এবং নেতাদের সঙ্গে বাঙালিদের বিশেষ কোন সংস্রবই ছিলো না, রায়দের দলের সঙ্গেও নয়। যে শক্তিশালী সামন্তদের প্রভাবে সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিলো তাদের চিন্তাধারার সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালিদের ধ্যানধারণা প্রচুর ব্যবধান সৃষ্টি করেছিলো বলে মনে হয়, এবং তার ফলে সাধারণভাবে বাঙালি জনমানসে সিপাহি বিদ্রোহ যথেষ্ট সাড়া জাগায়নি।

ব্রিটিশ শাসনের ফলে যেসব সুযোগসুবিধা উপস্থিত হয়েছিলো, উচ্চবর্ণের বাঙালিরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সেইসব সুযোগ সুবিধাগুলি খুব তাড়াতাড়ি ভোগ দখল করতে পেরেছিলো। বহু সংখ্যক বাঙালি সরকারি অফিসে নিম্ন ও মধ্যপদস্থ কর্মচারীর কাজে ঢুকে পড়েছিলো এবং কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি সরকারি চাকরিতে অতি উচ্চপদেও আসীন হয়েছিলেন তাঁদের নিজেদের যোগ্যতার কারণেই, বর্ণ বা উচ্চশ্রেণীর বলে নয়। রায়ের যৌবনকালে শুধু

জড়বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরাই বিশ্বাস করতো যে যোগ্যতা পুরস্কৃত হতো না; রায় যে জড়বুদ্ধি ছিলেন না তা বলাই বাহুল্য।

জাতীয়তাবাদের ব্যাপারে রায়ের মানসিকতার কারণ অন্যত্র খুঁজতে হবে। একটি হচ্ছে, ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি এবং প্রায় অশিক্ষিত ইংরেজ পুঙ্গবের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ। এর ফলে বাঙালির আত্মমর্যাদাবোধ আহত হয়, এবং বাঙালিরা চাকুরিক্ষেত্রে সমান অধিকার দাবী করতে থাকে, কারণ কর্মক্ষেত্রে আত্মোন্নতির ব্যাপারে পূর্বের তুলনায় মেধা ও দক্ষতার প্রয়োজন ছিলো বেশি। প্রকৃত পক্ষে এই ব্যাপারকে ঘিরেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭০ সালে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনে অগ্রণী হয়েছিলেন; আর রায় তাঁর সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যোগ দেন যার ফলে রায় তাঁর স্কুল থেকে বিতাড়িত হন। যে সমস্ত কারনে মানবেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে সক্রিয় রাজনীতিতে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন, এটা তার মধ্যে একটি প্রধান কারণ ধরা যেতে পারে।

রায়ের জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণাতে প্রথমদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদ কাজ করেছিলো। তিনি যে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণবংশে জন্মেছেন, সে কথা তাঁর জীবনে পরবর্তীকালেও মাঝে মাঝেই তাঁর কথাবার্তায় প্রকাশ পেতো। পরবর্তীকালে তাঁর আমেরিকান বন্ধুদের একজন, অধ্যাপক রিচার্ড পার্ক, আমাকে ১৯১৫ সালে এক পত্রে জানিয়েছিলেন যে রায় সম্ভবত তাঁর বাল্যজীবনের বাঙালি ব্রাহ্মণত্ববোধকে মনে মনে জাগিয়ে রেখেছিলেন।

ভারতের ইতিহাসে ব্রাহ্মণেরা চিরকালই নিম্নবর্ণের মানুষদের ওপর প্রভুত্ব করে এসেছে; শুধু তাই নয়, শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে শাসকশ্রেণীর ওপরেও তারা প্রভুত্ব করেছে। চতুর্থ খ্রিষ্টাব্দ থেকে হিন্দু শাসকরা ব্রাহ্মণদের প্রভুত্ব স্বীকার না করলেও তাদের সম্মান করতো। ব্রিটিশ শাসকরাও মোটামুটি মুসলমান শাসকদের মতই ব্রাহ্মণদের সম্মান করতো। কিন্তু অষ্টাদশ খ্রিষ্টাব্দে তারা যখন আবিষ্কার করলো যে ব্রাহ্মণদের সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ইউরোপের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষার মিল আছে তখন তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের প্রতি এমন এক ভ্রাতৃভাব জেগে উঠলো, যাকে 'আর্যভ্রাতা' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে সেমেটিক বিরোধী আবেগ থেকে ইউরোপীয়দের মধ্যে শুরু হলো আর্যামি,

আর্যত্ব আর ব্রাহ্মণরা খুশি হল এই ভেবে যে, তারা শাষকশ্রেণী ইউরোপীয়দের সমকক্ষ।

ইউরোপে প্রাচ্যবিদ্যা নিয়ে আলোড়নের ফলে হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা পায়, সেই কারণে ভারতের শাসনকার্যে অংশীদার হবার আকাঙ্খা ভারতীয়দের মধ্যে জেগে উঠেছিলো। কোনো গণতান্ত্রিক ভাবনা থেকে ভারতের শাসনকার্যে অংশীদার হবার আকাঙ্খা ভারতীয়দের মধ্যে জেগে ওঠেনি, বরং পুরোনো দিনের কথা ভেবে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাই শাসকশ্রেণীভুক্ত হতে চেয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙালি ব্রাহ্মণকুলের মধ্যে ক্ষাত্রবীর্যের অভাব ছিলো, এবং সেই কারণে তারা তাদের ইচ্ছা পূরণের উপায় খুঁজেছিলো অন্য পথে) তারা শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে শ্রেষ্ঠ, এই ভাবনা তাদের ছিলো। বঙ্গদেশ এবং তার বাইরে অন্য প্রদেশেও ব্রাহ্মণদের অধিকারে ছিলো বহু জমি। কিন্তু সামন্তপ্রভুদের শাসন করার দিন ফুরিয়ে গিয়েছিলো। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের অসাফল্যতা প্রমাণ করেছিলো যে ইউরোপীয়দের তুলনায় অর্থশক্তি এবং ক্ষাত্রশক্তিতে হিন্দুরা পিছিয়ে ছিলো। সেইজন্য বাস্তবক্ষেত্রে ধনসম্পদে ইউরোপীয়রা এগিয়ে থাকার দরুণ হিন্দুদের একটি সুগম তত্ত্ব খাড়া করতে হয়েছিলো নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে; সেটি হচ্ছে এই, হিন্দুরা আধ্যাত্মিক ব্যাপারে ইউরোপীয়দের থেকে শ্রেষ্ঠ।

শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে হলে সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। বল প্রয়োগের দ্বারা মুসলমানেরা ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যকে অস্বীকার করেছিলো, যেটা রাজপুতেরা পারেনি; কারণ ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করাকে তারা পাপ মনে করতো। ব্রিটিশদেরও ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করার ব্যাপারে সর্বদাই বলপ্রয়োগের সম্ভাবনা ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণদের পক্ষে অস্ত্রধারণ করার একটা সম্ভবনা খুবই সঙ্গত ছিলো)কিন্তু যেহেতু ব্রাহ্মণদের না ছিলো অর্থনৈতিক ভিত্তি আর না ছিলো রাজত্ব, সে কারণে তাদের পক্ষে ব্যক্তিগত ভাবে ছোট ছোট দলে অস্ত্রধারণ করাটাই ছিল একমাত্র পথ। এটাই ছিল সন্ত্রাসবাদের মূল ভিত্তি।

এম. এন. রায় একটি সন্ত্রাসবাদী দলে যোগ দিয়েছিলেন এবং এই সন্ত্রাসবাদী দলটিই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এই অভ্যুত্থানের প্রয়োজনীয়

অস্ত্রশস্ত্র জার্মানি থেকে আসার কথা ছিলো। জার্মানির সঙ্গে এই সম্পর্কটা শুধুমাত্র শত্রুর শত্রু বলে যে বন্ধুত্ব হয় তাছাড়াও একটা সাংস্কৃতিক কারণ ছিলো। উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানির সঙ্গে আমাদের একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জার্মানদের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের যোগাযোগ এবং কথাবার্তার মধ্যে এই সাংস্কৃতিক সম্পর্ক পরিষ্কার দেখা যায়।

তাছাড়া এটাও বাস্তব যে সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠনের একটা যোগসূত্র দেখা যায়। এই যোগসূত্রটি মার্কস্‌বাদী সংগঠনের মধ্যে লেনিনের একটি প্রধান অবদান। দলটি হবে সেইসব ব্যক্তিদের নিয়ে যারা বুদ্ধিমান, দৃঢ়চিত্ত, শৃঙ্খল পরায়ণ এবং যারা জনসাধারণের বেশির ভাগের স্বার্থের জন্য প্রচেষ্টবান, যখন জনসাধারণ তাদের নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে অবহিত বা সচেতন নয়।

এইখানেই বৈপ্লবিক ভাবধারার শুরু। সংস্কারবাদ মনে করে হঠাৎ কিছু করা উচিত নয়। সংস্কারবাদের মতে জনসাধারণ যখন তাদের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হবে এবং সেই সচেতনতার ভিত্তিতে তাদের দাবী স্বার্থক করার জন্য সচেষ্ট হবে তখনই সমাজের পরিবর্তন সম্ভব। সন্ত্রাসবাদীরা এই কাজটি জাতির নামে করতে নিজেরাই উদ্যোগী হয়েছিলো। যে জাতি তাদের কাছে একটি সাংস্কৃতিক ভৌগলিক স্বত্তা, কিন্তু সাধারণ মানুষের ধর্ম বা ভাষার ভিত্তিতে নয়। মানবেন্দ্রনাথ যে সন্ত্রাসবাদ থেকে মার্কসবাদী বিপ্লবী হয়েছিলেন তার পিছনে দুটি বিশেষ ঘটনা দায়ী ছিলো। দেশ থেকে ১৯১৫ সালে অস্ত্রের সন্ধানে লুকিয়ে পালিয়ে যাবার পর তিনি ১৯১৬ সালের মাঝামাঝি আমেরিকা পৌছান, বার্লিন যাবার পথে। বার্লিনেই তাঁর অস্ত্র সরবরাহের চুক্তিটি চূড়ান্ত করার কথা ছিলো। যেটি তিনি চিনে থাকার সময় সান ইয়াৎ সেনের মাধ্যমে ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু বার্লিন যাবার আগেই আমেরিকা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয় এবং ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে মানবেন্দ্রনাথকে মার্কিন সরকার নিউইয়র্কে গ্রেপ্তার করে। তখন তিনি জামিন নিয়ে মে'কোয় পালিয়ে যান।

মেক্সিকোয় যাবার পর থেকে তাঁর ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগও ছিন্ন হয় এবং তাঁর দেশে ফেরার আর আপাত কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তাছাড়া মেক্সিকোতে ষড়যন্ত্রমূলক কাজকর্মেরও কোনো সম্ভাবনা ছিলো না। জার্মানদের

সঙ্গে যোগাযোগ পুনর্বহাল হয়েছিল কিন্তু সেই যোগাযোগের ফল তাৎক্ষণিক কোনো কাজের প্রয়োজনে আসেনি। দ্বিতীয়, মানবেন্দ্রনাথের যার প্রতি সব থেকে বেশি দায়িত্ব ছিলো, ওঁর বৈপ্লবিক দলের যিনি ছিলেন সর্বাধিনায়ক, সেই যতীন মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু তাঁকে সেই দায়িত্ব থেকে খানিকটা মুক্তি দিয়েছিলো। সন্ত্রাসবাদী যোগযোগের আর কোনো জরুরি প্রয়োজন ছিলো না। জরুরি প্রয়োজন না থাকায় তিনি চিন্তা করার সময় পান। বস্তুত মেক্সিকোতে সেইসময় সবাই যুদ্ধের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছিলো, এমনকি জার্মানরাও, তাই সবাই চিন্তায় মগ্ন ছিলো।

আমেরিকায় থাকাকালীন মানবেন্দ্রনাথ এমন কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হন এবং বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে যারা ছিলেন দেশাত্মক বা জাতিগত বাধ্যবাধকতার উর্দ্ধে। এদের মধ্যে একজন হলেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ ডেভিড স্টার জর্ডন। যিনি মানবেন্দ্রনাথকে মেক্সিকোতে তাঁর এক বিশেষ বন্ধুর নামে পরিচিতি পত্র দিয়েছিলেন, যিনি মেক্সিকোতে খুবই শক্তিশালী ও গন্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। পরিচিতিপত্র দিয়েছিলেন এইজন্যে যে যদি প্রয়োজন হয় মানবেন্দ্রনাথ যেন সেখানে আশ্রয় পান। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক আর্থার উফাম পোপ যিনি মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য অধ্যাপকের পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েও মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব বজায় রেখেছিলেন এবং মানবেন্দ্রনাথ মেক্সিকোয় যাবার পর আমেরিকায় তার সহযোগীর কাজ কর্ম চালিয়ে গেছেন। তৃতীয় হলেন এভেলীন ট্রেন্ট। ইনি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফাইবেটা কাপ্পা' স্নাতিকা। যিনি তার স্বচ্ছল জীবন পরিত্যাগ করে মানবেন্দ্রনাথের সহধর্মিনী এবং সহকর্মিনী হন।

মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ম্যাস্ট্রো ক্যাসেস মানবেন্দ্রনাথকে খুব পছন্দ করেন এবং মানবেন্দ্রনাথের নতুন চিন্তাধারার প্রথম যোগাযোগ তার মাধ্যমেই হয়। ক্যাসেস মানবেন্দ্রনাথকে বলেন যে ভারতবর্ষের পক্ষে মিস্‌ট্রিসিজম পরিত্যাগ করে ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার থেকে জ্ঞান আহরন করলে ভালো ছাড়া খারাপ হবেনা। তখন থেকেই শুরু হয় পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও দর্শন সম্বন্ধে মানবেন্দ্রনাথের চর্চা, ভলতেয়ার এবং সেরভান্তেজ পড়ার উদ্যেগ। মানবেন্দ্রনাথের কথায় "সেরভান্তেজ এবং ভলতেয়ার তাঁর কাছে শুধুমাত্র দুটি

নাম ছিলো। তাঁদের কোনো লেখা তিনি আগে পড়েন নি। বস্তুত সেরভান্তেজ এর নামও তিনি শোনেননি।"

নিউ ইয়র্কে থাকতেই আমেরিকান র‍্যাডিক্যালদের প্ররোচনায় তিনি মার্কসবাদ সম্পর্কে পড়াশুনা শুরু করেন, নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীতে। বোধ হয় ওর স্ত্রী এভেলীন এই পড়াশোনার ব্যাপারে সাহায্য করেন। কিন্তু মার্কস্‌বাদ অপেক্ষা যেটি তাঁকে আরও গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা হলো ইউরোপীয় সংস্কৃতির ব্যাপ্তি ও বিকাশ।

মেক্সিকোতে যেটি তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে সেটি হলো সাধারণ ইউরোপীয়নদের ন্যুনতম শিক্ষার মান। জার্মান ব্যবসায়ীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সামর্থ। একজন ব্যবসায়ীর স্ত্রী ওঁকে শিল্প এবং শিল্পীর জগৎ সম্পর্কে অবহিত করেন। সেই সময় প্যাবলো ক্যাজাল, মেক্সিকান সঙ্গীত শিল্পী এবং তাঁর স্ত্রী এবং একজন পোল্যান্ড অধিবাসী পিয়ানো বাদক তাঁকে পাশ্চাত্যে সঙ্গীত সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। মানবেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন এইভাবে তিনি ক্রমশ ইউরোপের মধ্যবিত্ত সমাজের নানান এবং বিবিধ চিন্তাধারা এবং জ্ঞানের জগৎ সম্পর্কে অবহিত হন। অর্থোপার্জন বা অস্ত্রশস্ত্রের দিকটা কোন প্রাধান্য পায় নি। তাঁর মন থেকে সন্ত্রাসবাদী চিন্তা ক্রমশ দূর হতে থাকে আর কমতে থাকে নিজের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির গরিমা।

যদিও তিনি একথা স্বীকার করেননি, তবুও আমার মনে হয় নিউইয়র্কে 'গ্রীনউইচ ভিলেজ' এর প্রভাব) যে প্রভাব মেক্সিকোতেও তাঁর ওপর বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। গ্রীনউইচ ভিলেজের শিল্পী, লেখক এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের মেক্সিকো শহরে অবস্থিতির মাধ্যমে তার মনে সেই সবের প্রভাব প্রাধান্য অনেক পেয়েছিলো। মেক্সিকোয় তিনি এক নতুন কর্মময় সাংস্কৃতিক জগতে বাস করেছিলেন যেটি ছিলো ইউরোপীয় সাংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ। আমেরিকা থেকে যারা মেক্সিকোয় পালিয়ে এসেছিলো - যাদের নাম দেওয়া হয়েছিল ভবঘুরের দল - তাঁদের সঙ্গে তিনি এক নতুনত্ব বিজ্ঞান সম্মত সাংস্কৃতিক কর্মজীবনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কলকাতার বই-পড়া মানুষের মধ্যে ধর্মীয় আচার ব্যবহারে এটির অভাব ছিলো।

মেক্সিকোর এই জীবন এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব পরবর্তী পনের বছর

তাকে অভিভূত করেছিলো) তাঁর সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেও। সাংস্কৃতিক জগতের এই বিস্তার এবং গভীরতা তাঁকে অভিভূত করেছিলো,) পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের জেল থেকে তিনি যে সব চিঠিপত্র তাঁর বাগদত্তা এলেন গটস্চাককে লেখেন তাতে এটি বিশেষভাবে দেখা যায়। জাতীয়তাবাদ এতে কোনো সাংস্কৃতিক প্রাচীর সৃষ্টি করেনি। অনেক স্প্যানিশ মানুষ যেমন ফরাসি সংস্কৃতিকে নিজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বলে গণ্য করেছিলো তেমনই আবার সংস্কৃতির জগতে জার্মান, মে'কান, স্প্যানিয়ার্ডস, আমেরিকান, ইংরাজ, ফরাসি, রাশিয়ান সকলেই অন্যদের সঙ্গে অনায়াসেই সাংস্কৃতিক ভাবনাচিন্তা নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারতেন। ইতিহাস এবং সেই ইতিহাসের সংস্কৃতি সকলের কাছেই পরিচিত ছিলো, বোধগম্য ছিলো। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির একগুঁয়েমি, অন্য সমাজ ও সংস্কৃতিকে দূরে সরিয়ে রাখা এবং নিজের চিন্তাধারা ও সামাজিক নিয়মের বাধ্যবাধকতা এই পরিবেশে অনুপস্থিত ছিলো। একটি বিশ্বজনীন সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং ভ্রাতৃত্ববোধ প্রাধান্য লাভ করেছিলো। রুশ বিপ্লবের প্রথম যুগের এটাই বোধহয় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিলো। ১৯২০ এর এবং ৩০ এর দশকে রুশ বিপ্লব এই যে বিশ্বজনীন আর্ন্তজাতিকতা পৃথিবীর বিশেষ করে পশ্চিমী জগতের বুদ্ধিজীবিদের প্রভাবিত করেছিলো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেই সাংস্কৃতিক পরিবেশ ক্ষুন্ন হতে থাকে এবং তার পরিবর্তে প্রাধান্য লাভ করে জাতীয়তাবোধ।

মেক্সিকো থাকার সময়েই মানবেন্দ্রনাথ তাঁর জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতির উর্দ্ধে উঠেছিলেন এবং যেহেতু জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ছিল সাংস্কৃতিক তাই তিনি জাতীয়তাবাদের উর্দ্ধে উঠতে পেরেছিলেন। এই ব্যাপারে মার্কস্‌বাদ হয়তো তাঁর মনে একটি নুতন আদর্শের ভিত্তি তৈরি করেছিলো কিন্তু ইউরোপীয় সংস্কৃতির ব্যাপ্তির কাছে মার্কস্‌বাদকেও ছোট বলে মনে হয়। যদিও মার্কস্‌বাদ ইউরোপীয় ইতিহাস ও সভ্যতা বোঝার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছিলো বলে তিনি মনে করতেন তবুও আমার ধারণা যে ইউরোপীয় সংস্কৃতি তাঁকে মার্কস্‌বাদেরও উর্দ্ধে নিয়ে গিয়েছিলো।

মেক্সিকোতে বরোদিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ এবং ব্যাপক আলোচনা তাঁকে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইউরোপীয় সংস্কৃতি বুঝতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু তবুও পরবর্তীকালে যখন বার্লিনে অগাষ্ট থ্যালহাইমার এর সঙ্গে তাঁর পরিচয়

হয় তখন থেকে থ্যালহাইমারের প্রভাবে তিনি রেনেশাঁসের পূর্ববর্তীকালের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপরেই আরো বেশি গুরুত্ব দেন। যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে মানবিকতার প্রভাব অনেক বেশি ছিলো।

ইতিহাসের যে ধারায় মানবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন সেটি হলো প্রধানত ইউরোপীয়, গ্রিস এবং রোমে এর শুরু। মধ্যযুগীয় খ্রিষ্টান ধর্মের প্রভাবে খানিকটা অবনমন এবং তারপর রেনেশাঁসের প্রভাবে সেই থেকেই এর বিরামহীন প্রসার। ব্যাক্তিগতভাবে তিনি ইউরোপীয় সংস্কৃতিকেই গ্রহণ করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে (কলকাতায়) এর একটি গ্রহণীয় ভিত্তি তৈরি করেছিলেন ডিরোজিও এবং মেকলে। যদিও তাঁর বেশিরভাগ স্বদেশবাসীরাই এই ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রতি উৎসাহিত হয়নি। মেক্সিকোয় মানবেন্দ্রনাথ যখন দেখলেন যে মেক্সিকোর বুদ্ধিজীবিদের প্রায় সকলেই ফরাসি ভাষা এবং সংস্কৃতিকে নিজেদের বলে ধরে নিয়েছেন তখন তাঁর পক্ষে ব্যাপারটি আরো সহজ হয়ে দাঁড়ায়। বাঙালি বুদ্ধিজীবিরাও ইংরেজিকে ঐভাবে গ্রহণ করেছিলো কিন্তু খুব একটা প্রসন্নচিত্তে বা উৎসাহের সঙ্গে নয়।

মেক্সিকো থেকে মানবেন্দ্রনাথ যখন ইউরোপে যান তাঁর মন ইউরোপীয় সংস্কৃতি এবং সভ্যতাকে জেনে নেবার জন্য বেশ খানিকটা তৈরি হয়েছিলো। যখন তিনি আমেরিকায় পৌঁছান তখনও তিনি মননশীলতার দিক থেকে অন্য এক আধ্যাত্মিক জগতে বাস করতেন যে জন্য তিনি আমেরিকায় বিশেষ লাভজনক কিছু করতে পারেন নি। কিন্তু তিনি আড়াই বছর মেক্সিকোয় থাকার পর যখন ইউরোপে যান তখন তিনি জার্মানির এবং ইউরোপের কর্মযজ্ঞ থেকে লাভ করবার জন্য উন্মুখ হয়েছিলেন। তিনি জানতেন জার্মানিই তখন দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য এবং সঙ্গীতের পীঠস্থান, প্রাসিয়ান যুদ্ধাকাঙ্খা সত্বেও। তিনি হতাশ হননি। আধুনিক সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা জার্মানিতেই সার্থকতা লাভ করেছিলো; তাই সেখানে তিনি এডউয়ার্ড বার্নস্টাইন, কার্ডটস্কি, হিলফারডিং, এডউয়ার্ড ফুকস, অগাষ্ট থ্যালহাইমার এবং আর্নষ্ট মেয়ার প্রভৃতির সঙ্গ লাভ করে শুধু খুশিই হননি, তাঁদের মানবিকতায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং সহনশীলতায় অভিভূত হয়েছিলেন।

মার্কস্‌বাদের প্রতি মানবেন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হয়েছিলেন রাজনৈতিক অথবা

অর্থনৈতিক কারণে নয়। বস্তুত মার্কস্‌বাদের প্রতি তাঁর আকর্ষনের প্রধান কারণ ছিলো মার্কসবাদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। মানবেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে মেক্সিকোতে তাঁরা একটি ছোট বিশ্বজনীন গোষ্ঠী গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন যাঁরা ছিলেন মুক্তি এবং স্বাধীনতার উপাসক। তাই মানবেন্দ্রনাথ যেমন উগ্র প্রোলেতেরিয়ানতা গ্রহণ করতে পারেন নি, তেমনি আবার বুর্জোয়া আচার-ব্যবহারও মেনে নিতে পারেন নি। পরবর্তীকালে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন "যে একমাত্র স্বাধীন চিন্তানায়কদের নেতৃত্বেই নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে, কারণ এরাই মানবিক ঐতিহ্যের ধারক"। মানবেন্দ্রনাথ আরো মনে করতেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই চিন্তানায়কদের এই আধিপত্য বিশেষভাবে দেখা যায় এবং ঐ শতাব্দীতেই ইউরোপীয় সংস্কৃতি শীর্ষস্থানে পৌঁছেছিল। এই বিষয়ে তিনি ইতালীর মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবি অ্যান্টোনিও গ্রাম্‌শ্‌চির সঙ্গে একমত পোষণ করতেন যে মার্কস্‌বাদের দার্শনিক ভিত্তিগুলি নতুন করে ভেবে দেখবার প্রয়োজন হয়েছে এইজন্য যে তাহলে মার্কস্‌বাদ আদর্শবাদীদের মানসিক প্রয়োজন মেটাতে পারবে। তবে গ্রাম্‌শ্‌চি সম্পর্কে তাঁর এই ধ্যানধারণা পরবর্তীকালে হয়েছিল।

ইউরোপ থেকে যখন তিনি তাসখন্দ যান সেখানেও মানবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারার আরো অনেক পরিবর্তন ঘটে। তাসখন্দে তাঁকে প্রচুর মুসলমানদের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছিল। সেইজন্য বিশ্বজনীন সংস্কৃতিতে যেটি ছিল প্রধানত ইউরোপীয়, তার সঙ্গে ইসলামিক সংস্কৃতি ও সভ্যতার সম্পর্ক নিয়ে তিনি গবেষণা করেন। মুসলমানরা গ্রিক সভ্যতার এবং সংস্কৃতির অনেকখানি মধ্যযুগে বাঁচিয়ে রেখেছিল এবং পরবর্তীকালে এই গ্রিক ধ্যানধারণা মুসলমান সমাজ মারফত ইউরোপে প্রবেশ করে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে ইউরোপের জাগৃতির ভিত্তি স্থাপন করে। যদিও ব্যাপারটা এরকম সহজভাবে হয়নি। তবুও গ্রিক সভ্যতা মুসলমান জগৎই ইউরোপে নিয়ে গিয়েছিল এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলিম সমাজের একটি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছিল। মানবেন্দ্রনাথের এই গবেষণা পরবর্তীকালে তিনি একটি বই লিখে প্রকাশ করেছেন। বইটির নাম 'ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান'।

কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ইউরোপের কোন যোগ ছিল কিনা কিংবা কি যোগ ছিল এটি তিনি করে যেতে পারেন নি। মেক্সিকোতে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি তে

ভারতীয় ইতিহাসের একটি বিচার তিনি করেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে সেই বইটি স্প্যানিশ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'ভারতবর্ষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত' এই নামে ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বইটি ভারতীয়দের আর্যত্ব অগ্রাহ্য করা ছাড়া আর বেশি দূর এগোয়নি। ঐ বইতে তিনি দেখিয়েছিলেন যে ভারতীয় সংস্কৃতি মূলত প্রাক-আর্য এবং প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি তৎকালীন অন্যান্য সভ্যতার থেকে খুব বেশি পৃথক ছিল না। ইউরোপ এবং ভারতবর্ষের সভ্যতার বিকাশ সমান্তরাল ছিল, এইরকম একটা চিন্তাধারা মানবেন্দ্রনাথের মনকে বহুদিন আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে তাঁর কার্যকলাপ এবং গবেষণা পরবর্তীকালে তাঁর ভারতবর্ষে ফেরার পর ঘটেছিল। প্রাচীন ভারতে যে একটি মানবতাবাদী এবং খানিকটা বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা ছিল - প্রায় গ্রিসের সমসাময়িক এবং তুলনীয়) যেগুলি পরবর্তীকালে মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণার ফলে চাপা পড়ে যায় এটিই তিনি প্রাথমিকভাবে একটি বইতে লিখেছেন। বইটির নাম 'বস্তুবাদ', যেটি তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন এই বলে যে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারার এটি একটি প্রাথমিক পরিকাঠামো।

ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথের ধ্যানধারণা জওহরলাল নেহেরুর থেকে আলাদা ছিল। জওহরলাল নেহেরু ছিলেন আর একজন প্রাক স্বাধীনতা যুগের ভারতীয় নেতা যাঁর মধ্যে আর্ন্তজাতিক চিন্তাধারা বিশেষভাবে দেখা যেত। নেহেরুও বিশ্বাস করতেন সমস্ত পৃথিবীতেই ইতিহাস এগিয়ে গেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তিনি মনে করতেন যে ভারতবর্ষের অনগ্রসরতার একমাত্র কারণ ছিল বৈদেশিক শক্তির কাছে পরাধীনতা, কিন্তু বৈদেশিক শক্তির কাছে পরাধীনতা যে অনগ্রসরতার জন্যই হয়েছিল সেটা তিনি মনে করতেন না। শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্যের দিক দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম যুগে ভারতবর্ষ আর ইউরোপ প্রায় সমপর্যায়েই ছিল। কিন্তু সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে অনেক পার্থক্য ছিল। নেহেরু মনে করতেন ভারতবর্ষ আর ইউরোপের এই যে পার্থক্য এটির কারণ ছিল ইউরোপের শিল্পবিপ্লব ও প্রসার। ভারতবর্ষকে যদি শিল্পোন্নত করা যায় ভারতবর্ষও ইউরোপের সমপর্যায়ভুক্ত হবে। নেহেরু এটা ভাবেননি যে শিল্পবিপ্লব শুধুমাত্র ওয়াট নামক একজন বিজ্ঞানীর কেটলিতে জল ফোটার থেকে ইঞ্জিন আবিষ্কার করা নয়। এর পেছনে ছিল বহুদিনের জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিকাঠামো রেনেশাঁসের পর থেকে। যে জ্ঞানবিজ্ঞানের

ইতিহাস ইউরোপের রেনেশাঁসের ইতিহাসের সঙ্গে সমান্তরাল। তাই মানবেন্দ্রনাথ শিল্প বিপ্লব অপেক্ষা রেনেশাঁস এবং মননশীলতার জাগৃতির ওপর অনেক বেশি গুরুত্ব দিতেন। এই জন্যেই তিনি অর্থনৈতিক কার্যকারণতা যে সীমিত তা মনে করতেন।

আর কোন ভারতীয় ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার এইভাবে বিচার করবার চেষ্টা করে নি। মানবেন্দ্রনাথ মনে করতেন যে ইউরোপীয় সভ্যতা মানবিকতার একটি প্রকৃষ্ট পর্যায় যেখানে ইউরোপীয় সভ্যতা হয়ে দাঁড়িয়েছে সমস্ত জগতের সভ্যতার কেন্দ্রস্থানীয় যে কেন্দ্রে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সমস্ত সংস্কৃতির ধারা মিশে গিয়ে একটি বিশ্বব্যাপি সভ্যতা পরিপূর্ণ এবং সার্থক করেছে।

মানবেন্দ্রনাথের বিপ্লবী জীবন ও দর্শন

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উপর একটি প্রবন্ধে মানবেন্দ্রনাথ রায় ১৯৩৯ সালের ৩০শে জুলাই তারিখের "ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া" সাপ্তাহিক পত্রিকায় লিখেছেনঃ "দেশ ছাড়ার আগে চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে আমার কয়েকবার দেখা হয়েছিল।......... অরবিন্দ ঘোষের মামলায় অপূর্ব সওয়াল ও বাগ্মীতা তাঁকে রাজনীতিতে টেনে আনে। .... তখনকার রাজনীতি ছিল সত্যই বৈপ্লবিক।" এই বৈপ্লবিক রাজনীতির একজন নেতা হিসাবেই মানবেন্দ্রনাথ, তখন নরেন ভট্টাচার্য, ব্যাটাভিয়া যান জার্মানদের সঙ্গে অস্ত্র আনার জন্য বন্দোবস্ত করতে। প্রথমবার যান ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে এবং দ্বিতীয়বার ১৯১৫ সালের আগস্ট মাসে - চার্লস্ মার্টিন ছদ্মনামে। এই দ্বিতীয়বার দেশ ছাড়ার পর চিন, জাপান, ফিলিপিনস্ ইত্যাদি সব দেশ ঘুরে নরেন ভট্টাচার্য আমেরিকায় পৌঁছান· ১৯১৬ সালের জুন মাসে।

ওই প্রবন্ধে মানবেন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন, "গয়া কংগ্রেসের প্রাক্কালে আমার এক দূত তাঁর (চিত্তরঞ্জন দাশ) সঙ্গে দেখা করেন আমার একটি চিঠি নিয়ে। চিঠিতে আমি যা লিখেছিলুম সে সম্পর্কে তিনি খুবই সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং ওই পত্রবাহক মারফৎ উনি আমায় যা জানিয়েছিলেন তা আমাকে এখনও গোপন রাখতে হচ্ছে।" ওই দূত ছিলেন ১৯২৪ সালের কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী নলিনী গুপ্ত। ১৯৫০ সালে নলিনী গুপ্ত সে সম্পর্কে আমাকে কিছু বলেন। এক, গয়া কংগ্রেসের জন্য মানবেন্দ্রনাথ যে প্রস্তাব ও কার্যসূচী চিত্তরঞ্জন দাশকে মস্কো থেকে পাঠান - উনি সেই প্রস্তাবের প্রতি তাঁর সমর্থন জানান কিন্তু ব্রিটিশ শাসনে দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বিচার করে তিনি সেই প্রস্তাবের মূল বক্তব্যটি নিজের ভাষায় গয়া কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে উল্লেখ করেন। সেটি হলো ঃ "আমি যে স্বাধীনতা চাই তা সাদা চামড়ার পরিবর্তে কালো চামড়ার শাসন নয়, আমি দেশের শতকরা ৯৮

জনের জন্য স্বাধীনতা চাই।" স্মরণ করা যেতে পারে যে মানবেন্দ্রনাথ প্রেরিত ওই প্রস্তাবটি ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রে কংগ্রেস অধিবেশনের ঠিক দুদিন আগে প্রকাশ করা হয়েছিল - কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশের আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য।

চিত্তরঞ্জন দাশ, নলিনী গুপ্তকে আরও বলেন ঃ "নরেন পোস্ট অফিস চায়", অর্থাৎ মানবেন্দ্রনাথ তখন 'ভ্যানফ্যার্ড' ইত্যাদি পত্রপত্রিকা বই পাঠাবার জন্য দেশের মধ্যে কিছু ঠিকানা চেয়েছিলেন, যে সব ঠিকানায় তিনি ওই পত্রিকা পাঠাতে পারবেন দেশের মধ্যে প্রচারের জন্য। ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগের রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায় যে ৩/৪ হাজার কপি পত্র-পত্রিকা মানবেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের মধ্যে পাঠাতেন। চিত্তরঞ্জন দাশ নলিনী গুপ্তকে সারা দেশে বহু গণ্যমান্য লোকের ঠিকানা দেন এবং তাঁদের তিনি জানিয়েও দেন যে জার্মানি, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি জায়গা থেকে তাঁদের নামে মানবেন্দ্রনাথ পত্র পত্রিকা পাঠাবেন। এবং সেগুলি যেন তাঁরা গ্রহণ করেন এবং বিতরণ করেন।

বৈপ্লবিক জীবনের বহু কথাই মানবেন্দ্রনাথ বলে যাননি। তাঁর 'স্মৃতি কথা'-তেও তিনি এসব লেখেননি। তাঁর প্রথম স্ত্রী এভেলিনের কথাও যেমন তিনি লেখেননি, তেমনি তাঁর একজন প্রধান সহযোগী অধ্যাপক আর্থার পোপ-এরও তিনি নামোল্লেখ করেননি। এভেলিনের সঙ্গে তিনি স্ট্যানফোর্ডে পরিচিত হন; অধ্যাপক পোপের সঙ্গেও তিনি স্ট্যানফোর্ডেই পরিচিত হন। দু'জনের সঙ্গেই ওঁর পরিচয় হয় ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় ও তাঁর আমেরিকান স্ত্রীর মারফৎ। ১৯৮১ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে শহরে এ সম্পর্কে আমি অনেক নথিপত্র এবং দলিল পাই। এর মধ্যে একটি দলিল হলো স্যান ফ্র্যান্সিসকোয় অবস্থিত উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলের এ্যাটর্নি প্রেস্টন সাহেবের একটি গোপন নোট, অধ্যাপক পোপ সম্পর্কে - ওয়াশিংটনে এ্যাটর্নি জেনারেলকে লেখা, ১৯১৮ সালের ২রা এপ্রিল তারিখে।

মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার কয়েকমাস পর বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার চাকরিটি পোপ পদত্যাগ করতে বাধ্য হ'ন। তখন তিনি আমহার্স্ট কলেজে একটি অধ্যাপনার কাজ পান কিন্তু সেটিও ওই একই কারণে তাঁকে ছাড়তে হয়। তারপর তিনি আমেরিকার যুদ্ধ বিভাগে একটি চাকরি নেন। ওই নোটটিতে প্রেস্টন সাহেব এ্যাটর্নি জেনারেলকে

লিখছেন কি কারণে পোপকে ওই চাকরিতে রাখা যেতে পারে না।

"অধ্যাপক আর্থার উপহাম পোপ লালা হরদয়ালের সঙ্গে ১৯১১ সালে পরিচিত হ'ন এবং তখন থেকেই হিন্দু বিপ্লবীদের সহযোগী হ'ন। ......কিন্তু সব থেকে ন্যাক্কারজনক হলো হিন্দু বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। এই নরেন্দ্র হলেন ভারতবর্ষের সব থেকে হিংসাত্মক বিপ্লবী। নরেন্দ্রনাথকেই ভার দেওয়া হয়েছিল 'ম্যাভারিক' জাহাজে প্রেরিত জার্মান অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করতে। পরে নরেন্দ্র ভারতবর্ষ থেকে ব্যাটাভিয়া এবং সাংহাই-এ জার্মানদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ১৯১৬ সালের মাঝামাঝি 'মার্টিন' ছদ্মনামে নরেন্দ্র স্যান ফ্রানসিস্‌কো শহরে আসেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই নিজের নাম পরিবর্তন করে মানবেন্দ্রনাথ রায় নাম গ্রহণ করেন। আমেরিকার পশ্চিমকূলে কিছুদিন থাকার পর এবং জার্মানদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে রায় নিউ ইয়র্কে যান। সেখানেও জার্মানদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেন। নিউইয়র্ক থেকে জার্মানি সাববেরিন 'ডয়েচ্‌ল্যান্ড' এ ওঁর বার্লিন যাওয়ার কথা ছিল - দক্ষিণ চিনের এক যুদ্ধনেতার কাছ থেকে অস্ত্র কেনার ব্যবস্থা করতে। এটি কোন কারণে ভেস্তে যায়। তার কিছুদিনের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু-জার্মান ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে, তখন রায় 'ম্যানুয়েল মেন্ডেজ' নাম নিয়ে মেক্সিকো পালিয়ে যান। এবং সেখানে এখনও ওই লোকটি জার্মানদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আমেরিকান মহাদেশ অবস্থিত এই লোকটিই সব থেকে বিপজ্জনক এবং এখনও উনি এই মহাদেশে উপস্থিত। ওঁর সঙ্গে অধ্যাপক পোপের যোগাযোগ থাকার কোন সুকারণ নেই।

অধ্যাপক পোপ প্যালো এ্যাল্টো (স্ট্যানফোর্ড) শহরে রায়ের সঙ্গে দেখা করেন এবং তারপর থেকেই দুজনে এমন অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন যে নিউইয়র্ক থেকে রায় ওঁকে চিঠি লিখে জানান যে রায় 'ম্যানুয়েল মেন্ডেজ' নামটি গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া রায় নিউইয়র্ক থেকে ১৯১৬ সালের শেষ দিকে জাপানে রাসবিহারী বসুকে সাংকেতিক ভাষায় একটি চিঠি লিখে জানান 'কাজ-কর্মের জন্য টাকা পাঠাতে এবং তাতে লেখেন যে ওই টাকা যেন অধ্যাপক পোপের কাছে পাঠানো হয়। পোপের অজ্ঞাতসারে ওই চিঠি লেখা হয়ে থাকতে পারে না।

ওই নোটটি পাঠাবার পর অধ্যাপক পোপের যুদ্ধ-দপ্তরের চাকরিটি যায়। বৈপ্লবিক রাজনীতির একটি মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে গোপনীয়তা এবং সেই গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য বিপ্লবীদলের কর্মীদের অঙ্গীকারবদ্ধতা। যে কারণে ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগ বাংলার বিপ্লবীদের পেছনে এত লোক নিযুক্ত করেছিল সেই গোপনীয়তা থেকে তাদের কাজ-কর্মের পদ্ধতি এবং কে, কোথায় কি করছে তা' উদ্ধার করতে। আমার লেখা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জীবনীর প্রথম খন্ড, "অশান্ত ব্রাহ্মণ" (দি রেস্টলেস্ ব্রাহ্মীন); নামক বইটির ভূমিকায় ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "আমাদের বৈপ্লবিক জীবনে অন্য কোন কর্মীর কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া বা ঔৎসুক্য প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিল। আমরা শুধু নিজেদের দায়িত্ব পালন করতুম, তার বাইরে কোন কিছু জানতে চাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' -এর গুপ্ত সমিতির আদর্শে আমরা অনুপ্রাণিত ছিলাম এবং সেই আদর্শ আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলতাম।" দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এর উপর নিবন্ধটি মানবেন্দ্রনাথ ১৯৯৩ সালে লিখেছেন কিন্তু দেশ তখনও পরাধীন তাই তিনি তখনও সেই গোপনীয়তা রক্ষা করে গেছেন। যে জন্য মানবেন্দ্রনাথের জীবন সম্পর্কে লেখা এত কঠিন-সাধ্য।

আজ আরও অনেক কিছু জানতে পারা যাচ্ছে - গুপ্তচর বিভাগের নথিপত্র, দেশ-বিদেশের সংরক্ষিত গোপন রিপোর্ট যেসব এখন জনসাধারণকে গবেষণার জন্য দেখতে দেওয়া হচ্ছে। এসবের প্রয়োজন মানবেন্দ্রনাথের জীবনী লেখার প্রয়োজন এই জন্য যে তাঁর কার্য পরিধি ভারতবর্ষ থেকে চিন, জাপান এবং আমেরিকা-মেক্সিকো থেকে ইউরোপ এবং রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মানবেন্দ্রনাথ হিটলারের নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদকেই বিশ্বের শান্তি ও স্বাধীনতার প্রধান শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং সেই কারণে আমেরিকা এবং ব্রিটেনকেও সাহায্য করতে এগিয়ে যান। অবশ্য তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত রাশিয়াকে বিপন্মুক্ত করা। রায় যখন ফ্যাসি শক্তির বিরুদ্ধে, মৈত্র শক্তির পক্ষে বিনা-শর্তে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছেন, তার পরেও ১৯৪৩ সালে ১২ সেপ্টেম্বর ভারতে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল একটি গোপন নোটে আমেরিকার প্রচার-সচিবকে জানাচ্ছেন ঃ "আমরা এম, এন, রায়কে বিশ্বাস করি না। আসলে ওঁর

উদ্দেশ্য যুদ্ধের প্রস্তুতি করা।" - হোম রাজনৈতিক ৭:১৭:৪৩, ভারত সরকার।

কিন্তু ১৯৪১ সালের শেষ দিকে, তখনও নেতাজি সুভাষ বোস জাপানে যাননি, রাসবিহারী বসুর এক ভারতীয় দূত মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন একটি গোপন বার্তা নিয়ে। বার্তাটি ছিল আই, এন, এ গঠন সম্পর্কে এবং তার জন্য দেশের মধ্যে প্রয়োজনীয় একটি সংগঠন করা, যে সংগঠন আই.এন. এ'র অগ্রসরকে দেশের মধ্যে সাহায্য করবে। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের প্রস্তুতি সেই উদ্দেশ্যেই হয়েছিল। ১৯১৫ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর আমি জয়প্রকাশ নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করি "রায় সম্পর্কে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আপনার কি মত ছিল?" জয় প্রকাশজি কলকাতায় এসেছিলেন সর্বভারতীয় র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট সম্মেলনের উদ্বোধন করতে। ৬নং শর্টস্ট্রীটে জয়প্রকাশজির শ্যালক এস এন, প্রসাদের ফ্ল্যাটে সাক্ষাৎকারটি হয়। জয়প্রকাশজি আমাকে বলেন ঃ আমরা রায়কে বুঝতাম । জানতাম তিনি আমাদের পথ সমর্থন করেন না। কিন্তু তাঁকে আমরা সব কথা বলতে কুণ্ঠা বোধ করতুম না, আলোচনাও করেছি। কারণ, আমাদের বিশ্বাস ছিল তিনি আমাদের কথা গোপন রাখবেন। এই বিশ্বাস অন্যদের সম্পর্কে আমাদের ছিল না"।

বৈপ্লবিক রাজনীতির মূলভিত্তিই ছিল গোপনীয়তা এবং একের প্রতি অন্যের বিশ্বাস। বিশ্বাস-ঘাতকের শাস্তিও ছিল তাই কঠোরতম। ওই যে দূত রাসবিহারী বসুর কাছ থেকে রায়ের কাছে এসেছিলেন ১৯৪১ সালে, সে সম্পর্কে ১৯৪৬ সালেও রায় লিখছেন ঃ সেই দূত আমাকে বলেছিলেন অন্যদের সঙ্গেও তিনি দেখা করেছেন এবং যাঁদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন বা করবেন তাঁদের নামও তিনি আমাকে বলেন।... কিন্তু এসব তথ্য এখনও আমাকে গোপন রাখতে হবে।" (আই. এন. এ ও আগস্ট বিপ্লব - মানবেন্দ্রনাথ রায়; রেনেশাঁস পাবলিশার্স, ১৯৪৬; পৃঃ ৬৩)

বাংলাদেশের বিপ্লবীদের শপথ নিতে হ'তো গোপনীয়তা রক্ষা করার। 'বাঙলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা' পুস্তকে হেমচন্দ্র কানুনগো লিখেছেন ঃ তিনি ১৯২০ সালে 'গীতা' হাতে ধরে সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে অরবিন্দ ঘোষের কাছে শপথ নিয়েছিলেন দেশকে বিজাতি শাসন থেকে মুক্ত করবেন এবং বিপ্লবী সংগঠনের গোপনীয়তা রক্ষা করবেন এবং সেই গোপনীয়তা যদি রক্ষা না করেন তাহলে সমিতির সভ্যর হাতে মৃত্যুদন্ড ভোগ করবেন। বারীন ঘোষও "অগ্নিযুগের

কথা''-য় একথা লিখে গেছেন।

মানবেন্দ্রনাথের জীবনীর প্রথম খন্ড লেখার সময় আমি ওঁর সমসাময়িক অনেক বিপ্লবী নেতার সঙ্গে কথা বলেছি এবং তাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি - নির্বান স্বামী (সতীশ চন্দ্র সরকার), জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, নলিনী কর, ডাঃ অশ্বিনী রায়, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, কালীচরণ ঘোষ, অমরকৃষ্ণ ঘোষ, ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত প্রভৃতি আরও অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি - যাঁরা বিপ্লবী সংগঠনে ছিলেন। এটি আমার জীবনের একটি অত্যন্ত মূল্যবান অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। শেষ যাঁর সঙ্গে দেখা করি তিনি হলেন সতীশ চক্রবর্তী। যুগান্তর দলের কলিকাতার শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন। ৪/৫ দিন ধরে তাঁর সঙ্গে তাঁর বেহালার বাড়িতে সাক্ষাৎকার চলে। শেষ দিন, সাক্ষাৎকার শেষ হয়ে যাওয়ার পর, তিনি আমায় বলেন ঃ ''আমি হয়তো আর বেশিদিন বাঁচবো না, একটা কথা বলে যাই, তবে এটা আপনি ছাপবেন না''। আমি কথা দিয়েছিলুম উনি বেঁচে থাকতে ছাপবো না। আমার বই যখন প্রেসে তখন উনি মারা যান। উনি আমায় বলেছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে তৎকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার থিবো (Thibonit) - সংস্কৃত প ্ডিত ওঁকেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে বলেন যে কলিকাতাস্থ জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে; জার্মানরা বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আগ্রহী। থিবো সাহেবের বার্তাটি উনি নরেন ভট্টাচার্যকে জানান এবং সেই মত নরেন ভট্টাচার্য ও পরে যতীন মুখোপাধ্যায় সহ নরেন ভট্টাচার্য জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমি এই মূল্যবান জিনিসটি 'অশান্ত ব্রাহ্মণ' - এ সংযোজন করে দিয়েছিলুম।

এই গোপনীয়তাকে বাংলার বিপ্লবীরা রক্ষা করে গেছেন আমৃত্যু। সতীশবাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারটি হয়েছিল ১৯১৫ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার ২২ বৎসর পর। তখনও তিনি খবরটি গোপন রাখতেই চেয়েছিলেন। এই আদর্শের অনুপ্রেরণা ছিল আনন্দমঠ - সমস্ত বিপ্লবীই একথা আমাকে বলেছেন এবং লিখেও গেছেন।

এই বিপ্লবী সংগঠনেরই একজন নেত্রী ছিলেন সরলা দেবী চৌধুরাণী, রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী। 'জীবনের ঝরা পাতা' বইতে তিনি লিখেছেন ঃ

''বঙ্কিমের স্মৃতি প্রসঙ্গে 'বন্দেমাতরম্' গান ও মন্ত্রের স্মৃতি ভেসে না উঠে যায় না.... রবীন্দ্রনাথই 'বন্দেমাতরম্' এর প্রথম সুর বসিয়েছিলেন। ... একদিন মাতুল আমায় ডেকে বললেন - 'তুই বাকিটুকুতে সুর দিয়ে ফেল্‌না।' ... তাঁর আদেশে 'সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকলনিনাদ করালে' থেকে শেষ পর্যন্ত ভাবের সঙ্গে গোড়ার সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুর ফুটিয়ে নিলুম।.... সেই থেকে সভাসমিতিতে সমস্তটাই গাওয়া হতে লাগলো।......... সেই থেকে সারা বাংলায় এবং ক্রমে ক্রমে সারা ভারতবর্ষে ওই মন্ত্রটি ছড়িয়ে পড়লো - বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে যখন গভর্নর সাহেবের অত্যাচার আরম্ভ হল আহিমালয়-কুমারিয়া পর্যন্ত ওই বোলটি ধরে নিল''।
(পৃঃ ৪৭-৪৮)

মানবেন্দ্রনাথ ওই বিপ্লবী দলেরই একজন বহু পুরাতন কর্মী ছিলেন। যদিও তিনি স্মৃতি কথা'য় লিখেছেন যে মে'কো থাকাকালীন যখন তিনি সাম্যবাদ ও পাশ্চাত্য বস্তুবাদী দর্শনে দীক্ষিত হ'ন তখন থেকেই তাঁর উপর 'আনন্দমঠ'-এর প্রভাব ক্ষীণ হয়ে যায়, তবুও তাঁর ব্যবহার আমরা এই বিপ্লবী ধারা দেখতে পাই।

মানবেন্দ্রনাথ তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় এও লিখেছেন ঃ ''সাম্যবাদের প্রতি আমি আকৃষ্ট হই তার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী তাৎপর্যের জন্য। যারা 'আনন্দমঠ' থেকে বিপ্লবী প্রেরণা পেয়েছে তাদের কাছে সাম্যবাদের কাল্পনিক সুখী জগতের লক্ষ্য বা মানবিকতার আদর্শের মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই'' (স্মৃতিকথা পৃঃ ৫৯)।

'স্মৃতিকথা'য় তিনি ডঃ জর্ডান এবং ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কথা লিখেছেন। এও লিখেছেন যে ডঃ জর্ডান তাঁকে মেক্সিকোয় জেনারেল এ্যালভ্যারেভোর কাছে যে পরিচিতি-পত্র দিয়েছিলেন তার জন্যই তিনি মেক্সিকোয় সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন। ডঃ জর্ডান এবং ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, দুজনেই - তিনি যখন ১৯৪৯ সালে 'আত্মকথা' লিখতে শুরু করেন - তার বহুপূর্বে মারা গেছেন; জর্ডান ১৯৩৫ সালে এবং ধনগোপাল ১৯৩৬ সালে। কিন্তু অধ্যাপক পোপ এবং এভেলিন দু'জনেই তখনও জীবিত এবং আমেরিকায় বসবাস করেছেন। অনেকের মতে আমেরিকার অভ্যন্তরে তৎকালীন কমিউনিস্ট বিরোধী অভিযানের কথা ভেবেই তিনি সম্ভবত ওঁদের কথা লেখেননি। কারণ ১৯২০ সাল থেকে মানবেন্দ্রনাথ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন।

প্রখ্যাত আমেরিকান বুদ্ধিজীবী, মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যাপক রিচার্ড পার্ক যিনি পরবর্তীকালে মানবেন্দ্রনাথের বিশেষ সুহৃদভাজন হয়েছিলেন আমাকে ১৯১৫ সালের ৪ জুন একটি চিঠিতে লেখেন ঃ

"আমার মনে হয় রায়ের মধ্যে তাঁর পুরাতন বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক মনোভাব থেকে গিয়েছিল।.... শেষ জীবনে তিনি বোধ হয় তাঁর দার্শনিক 'ধ্যান-ধারণা' নতুন করে চিন্তা করছিলেন, কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিনি তার কোন প্রকৃষ্ট রূপ দিতে পারেননি।

...... তোমার নিশ্চয় মনে আছে রায় যখন 'সেরিব্রাল থ্রম্বশিস' - এ আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী তখন আমি কয়েক সপ্তাহ দেরাদুনে ছিলুম।.... আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে ওঠার সময় মাঝে মাঝে উনি বাংলায় কথা বলতেন। আর যখন বুলবুল (প্রয়াত আই সি এস, এস কে দে'র স্ত্রী) বাঙ্গালি খাবার রান্না করে, সাদা শাড়ি পরে, এলো চুলে, খালি পায়ে সেই খাবার ওঁকে দিতেন তখন রায় যেন তাঁর শৈশবের আনন্দ ফিরে পেতেন। এই সময় 'এলেন' (মানবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া স্ত্রী) হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন - তাঁর যেন কিছুই করার ছিল না"।

বিপ্লবের ইতিহাস
(History of Revolution)

আমরা এক বিপ্লবের যুগে বাস করছি। সুতরাং বিপ্লবের মূল সিদ্ধান্ত ও সমস্যাগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে ইতিহাস আলোচনা করতে হবে এবং তা' আমাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। অবশ্য আমাদের দেশের সমস্যাগুলির একটা বিশেষত্ব আছে। আমাদের দেশের বিপ্লব অন্যান্য দেশের বিপ্লবের অবিকল প্রতিচ্ছবি হবে না। তবুও ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে এই বিপ্লবও কতকগুলি নিয়মানুবর্তী। প্রয়োজন ব্যতিরেকে জগতে কিছুই ঘটে না। যদি আমাদের দেশে কোন বিপ্লব সাধিত হয় তা হলে বুঝতে হবে যে তার প্রয়োজন ছিল। যা প্রয়োজনীয় তা অবশ্যই ঘটে। কোন কিছুই তাকে বাধা দিয়ে রাখতে পারে না।

ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য আজ ভারতবর্ষেও বিপ্লবের প্রয়োজন। দেশের মধ্যে মাত্র কয়েকজনই সর্বপ্রথম বিপ্লবের এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে। তাদের আমরা বিপ্লবী বলে থাকি। সর্বসাধারণকে দুরবস্থা ও অসহনীয় অবস্থার মধ্যে রেখে যাঁরা ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার অধিকারী এবং সমাজের উন্নতির পথে বাধা হয়ে আছেন বিপ্লব তাঁদের সেই অধিকারকে সমূলে নষ্ট করে দেয়। এই জন্যই বিপ্লবকে যাঁরা ভয় করেন তাঁরা বিপ্লবীদেরও ভয় এবং ঘৃণা করে থাকেন।

মানব জাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করলে আমরা বুঝতে পারি যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানসিক বিকাশে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়, ইতিহাসের এই পরিবর্তন কালে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ এবং বিরাট ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। প্রথম প্রথম প্রগতিশীল শক্তিগুলি প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যেই শক্তিশালী হতে থাকে। মানব সভ্যতার অবিচ্ছিন্ন উন্নতি ও সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য এই সব পরিবর্তনের প্রয়োজন। এই পরিবর্তন যদি বাধাপ্রাপ্ত না হয় তা হলে অশান্তি ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয় না। কিন্তু আমরা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারি যে উন্নতি ও পূর্ণস্বাধীনতা যে সকল শক্তির একমাত্র লক্ষ্য—প্রচলিত ব্যবস্থার

সঙ্কীর্ণতা তাদের পথেই বাধা হয়ে থাকে। সর্বজনীন মঙ্গলের জন্যই প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক। এ পর্যন্ত ইতিহাসে প্রচলিত ব্যবস্থার আপনা আপনি কোন পরিবর্তন হতে দেখা যায় নি এবং পূর্ণ স্বাধীনতা ও উন্নতির ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাকে সার্থক করবার কোন নজিরও পাওয়া যায় নি। সমাজে প্রত্যেকটি পরিবর্তনই তুমুল দ্বন্দ্ব ও বিরোধের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। এই পরিবর্তনকে আমরা বিপ্লব বলি।

পরিবর্তনের পথে বাধা যত বেশি থাকে বিক্ষোভও তত পরিস্ফুট হয়ে উঠে। পদার্থিক প্রক্রিয়াগুলি যে নিয়মে আবদ্ধ সেগুলি আমাদের সামাজিক বিবর্তনের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। কারণ সমাজ বাস্তব জগতেরই একটি অংশমাত্র। উন্নতির জন্য যে সকল পরিবর্তন প্রয়োজন তা' বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এমন এক অবস্থায় উপস্থিত হয় যখন এই বাধা ভেঙ্গে না ফেললে সামাজিক উন্নতি ও বিবর্তন বন্ধ হয়ে আসে। এই ভেঙ্গে ফেলার জন্য শক্তির প্রয়োজন এবং প্রতিক্রিয়া শক্তির দৃঢ়তার উপর তা নির্ভর করে।

ফুটন্ত জলপাত্রের ঢাকনার মত এই সামাজিক বাধাও দূর হয়। উত্তাপের বৃদ্ধি যেমন সমস্ত জলের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নূতন শক্তির প্রাদুর্ভাবও হয়। ঠিক এই ভাবেই মানব সমাজও এক বিক্ষোভ অনুভব করে। পদার্থিক প্রণালীর রীতি অনুযায়ী এই বিক্ষোভ বাড়তে থাকে এবং শেষে চরম অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়। জল না ফুটলে যেমন তা' থেকে বাস্প হয় না ঠিক তেমনি বৈপ্লবিক ধারণাকে যদি আমরা সহ্য করতে না পারি তা হলে সামাজিক উন্নতি বেশিদুর অগ্রসর হতে পারে না। সুতরাং যারা বিপ্লবকে বাধা দেয় তারা সমাজের শত্রু।

ভারতবর্ষে এমন লোক খুব কমই আছেন যাঁরা বলেন যে, এদেশে সব কিছুই বেশ ভালভাবে চলছে; এবং ভারতবাসীদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি এবং সভ্য মানুষের মত বাস করবার জন্য আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থার কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। প্রায় সকলেই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিযোগ করেন। কৃষক ও মজুরদের কথা বাদ দিলেও দেখা যাবে যে, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে দোকানদার ও মিলের মালিকরাও অধিকতর লাভ করতে পারছে না এবং সেই জন্য তাদেরও অভিযোগ আছে। কিন্তু কৃষক ও মজুরেরা যখন নিজেদের দুরবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায় ও অসন্তোষ প্রকাশ করে তখন লোকে তা অবান্তর গোলযোগ বলে মনে করে। কিন্তু বহু লোক এরকম দীনহীন অবস্থার মধ্যে বেঁচে

আছে যে, তাদের সহ্যের সীমা শেষ পর্যায়ে এসেছে। তারা জীবনের প্রতিমুহূর্তে ক্ষুধার তাড়না অনুভব করে এবং সেজন্য তারাই বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়ে আসে। সমাজের কমবেশি সকলেরই সাধারণ দাবীকে সামনে রেখে তারা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে সচেষ্ট হয়।

বিপ্লবের একটি নিয়ম এই যে, যতক্ষণ না সমগ্র সমাজের উন্নতির জন্য প্রচলিত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হয় ততক্ষণ বিপ্লব সংঘটিত হয় না। কিন্তু সকলেই বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। সমাজের কোন একটি শ্রেণী এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় বেশি অনুভব করে এবং সেই অনুভূতির প্রেরণায় সাধারণের দাবীকে পরিস্ফুট করে বিপ্লবের পতাকাবাহীরূপে অগ্রসর হয়, কারণ সমগ্র সমাজের স্বার্থ এবং তাদের স্বার্থ মিলে যায়। সুতরাং কৃষক ও মজুরেরা যদি শান্তি ভঙ্গ করে সেজন্য রাগ করবার কিছু নেই। সমাজে মানুষের মত বাঁচতে হলে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েই আমাদের চলতে হবে কারণ আমাদের মধ্যেও অনেকেই অভাব অনটন ও দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে। বস্তুত, ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, যখনই কোন বিপ্লব প্রয়োজনীয় হয়েছে তখন সমাজের মুষ্টিমেয় লোকই প্রথমে তা' অনুভব করেছে এবং সমস্ত কিছু তুচ্ছ করে তারাই এগিয়ে এসেছে। এই বিপ্লবীরা নীতিহীন, নীচ, অত্যাচারী এবং স্বার্থপর হিসাবেই যে শুধু গণ্য হয়ে এসেছে তা নয়, অমানুষিক অত্যাচার এবং দুঃখকষ্টও এদের সহ্য করতে হয়।

খ্রিষ্টিয়ধর্ম প্রচারক জিশুকেও এই দুঃখকষ্ট বরণ করতে হয়েছিল। এযুগেই বিপ্লবীদেরও তা' ভোগ করতে হবে। তবে এই অত্যাচার ও নৃশংসতার রকমফের হয়েছে এবং অত্যাচারীরা তার উপর একটু ভদ্রতার আবরণ লাগিয়েছে মাত্র। জিশুকে হত্যা করা হয়েছিল কিন্তু জিশুর অনুপ্রেরণা সঞ্জীবিত ছিল। সেই অনুপ্রেরণা যে তুমুল আন্দোলন এনেছিল তার সামনে মহীয়ান রোম সাম্রাজ্যকেও মাথা নত করতে হয়। খ্রিষ্টানদের মত এযুগের বিপ্লববাদীরা হয়ত সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, তাদেরও হয়তো ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে কিন্তু এটা ঠিক যে, তারাই হবে এ যুগের অন্তর্নিহিত প্রেরণার বার্তাবাহক। এই অনুপ্রেরণাই একদিন ভারতবাসীর সুখ, শান্তি ও উন্নতির সমস্ত বাধাকে সমূলে নষ্ট করে দেবে।

সাধারণত লোকে ভাবে যে বিপ্লব জিনিসটা এক ধরণের আধুনিক হট্টগোলের মত একটা কিছু। রুশ বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই এর সূত্রপাত হয় এবং এখন অনেকেই তারই অনুকরণ করছে। ইতিহাস সম্বন্ধে যাদের জ্ঞানের মাত্রা আরো একটু বেশি

তাদের ধারণা যে ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে এই নষ্টামি শুরু হয়েছে এবং তার পূর্বে মানব সমাজ বেশ সুখে শান্তিতেই ছিল। ইতিহাস সম্বন্ধে এটা একটা বিরাট ভুল ও বিকৃত ধারণা। প্রকৃতপক্ষে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, মানব জাতির ইতিহাস—বিপ্লবেরই ইতিহাস এবং বিপ্লবের মধ্য দিয়েই মানবজাতির ইতিহাস গড়ে উঠেছে।

আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। এটা বোধ হয় সত্য যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে অনেক কম সংখ্যক বিপ্লব ঘটেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে এটা আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা না লজ্জার বিষয়। বস্তুত এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। এতবড় একটা দেশ যা নিজের পুরাতন সভ্যতা ও ইতিহাসের গর্বে গর্বিত অথচ এই দেশকেই অন্যান্য দেশের লোকেরা বরাবর খুশিমত জয় করেছে, ধ্বংস করেছে এবং নির্মমভাবে শোষণ করেছে। এর চেয়ে লজ্জার বিষয় কি হতে পারে? ভারতবর্ষের গত হাজার বৎসরের ইতিহাসের এই বিশিষ্ট ঘটনাগুলি কি ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়? জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনাগুলিকে যে ভাবে বুঝাবার চেষ্টা করেন, তা' যে কোন সমাজবৈজ্ঞানিক, যে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ইতিহাসকে বিচার করে—তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না; কারণ, ইতিহাস তার কাছে কেবল মাত্র কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ নয়—ইতিহাস তার কাছে সমাজ বিজ্ঞান। একটির পর একটি বৈদেশিক শক্তির আঘাতে ভারতের জরাজীর্ণ সভ্যতা ভেঙ্গে গিয়েছিল। কারণ তখনকার ভারতবাসীরা প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের দ্বারা সেই জীর্ণ সমাজকে বাঁচাবার চেষ্টা করে নি।

ভারতীয় ইতিহাসের বিপ্লবের সংখ্যাল্পতা থেকে এই বুঝা যায় যে, ভারতে সামাজিক বিকাশের প্রক্রিয়া বাধামুক্ত ছিল না সেজন্য সমাজের পূর্ণবিকাশ স্বাভাবিক ভাবে সম্ভব হতে পারে নি। কিন্তু মানবজাতির উন্নতির অনেক সম্ভাবনাই ভারতীয় সমাজে নিহিত ছিল। সেই সম্ভাবনা আজও আছে এবং ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। যে শক্তি এর ভিতর এতদিন ধরে সৃষ্টি হয়েছে তা একদিন ভয়ঙ্কর রূপে প্রকাশ পাবে এবং সেইটিই বোধ হয় পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ বিপ্লব হবে।

ভারতবর্ষে এক মহান্ বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল—সেই বিপ্লব হচ্ছে বৌদ্ধধর্মের উত্থান। একে অতীত কালের এবং হয়ত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব বলা যেতে পারে। কিন্তু এই বিপ্লবকে জোর করে দমন করা হয়েছিল। গত হাজার বৎসরের দুঃখ-দৈন্য বৌদ্ধধর্মের উত্থানকে বিনষ্ট করার অপরাধেরই প্রায়শ্চিত্ত। পাপ যত

বেশিই হোক না কেন শাস্ত্রানুসারে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তেরও বিধান আছে। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজও শেষ হয় নি। পূর্বপুরুষদের সেই ত্রুটী আজ আমাদের সংশোধন করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন বিপ্লব এবং সেই শ্রেষ্ঠ বিপ্লব আমাদেরই সাধন করতে হবে। শুধু রাজনৈতিক প্রথার পরিবর্তনের দ্বারা বিপ্লবের উদ্দেশ্য সফল হবে না। আধ্যাত্মিক অধঃপতনের ফলে যে জীর্ণগ্রস্ত সমাজব্যবস্থা আজ ভারতের সমাজকে দূষিত করেছে তাকেও ভেঙ্গে ফেলতে হবে। সামাজিক আবর্জনা ও বাধা দূর করে এমন এক মহান, উদার ও স্বাধীন সমাজ গড়ে তুলতে হবে যা সমস্ত জগতের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হবে। এই মহান কাজ আমরা তখনই করতে পারব যখন ভারতের সেই অতীতের বৌদ্ধ বিপ্লব থেকে আমরা অনুপ্রেরণা নেব।

উপরোক্ত উক্তিগুলি অনেকের কাছে হয়ত বাতুলের প্রলাপ বা সুমধুর স্বপ্ন বলে মনে হতে পারে। আমি তাদের বোঝাতে চেষ্টা করবো যে, ভারতে আবার কি ভাবে পৃথিবীর এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে।

গত হাজার বৎসর ধরে ভারত যখন অতি লজ্জাজনক শিথিল সামাজিক জীবন যাপন করছিল তখন ঐ সময়ের মধ্যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মানব সভ্যতার বিবর্তনের তিনটি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। অন্যান্য সমাজের উন্নতিশীল জাতিদের সঙ্গে সমান তালে চলবার জন্য ভারতবর্ষকেও বিপ্লবের এই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। এই অভিজ্ঞতা লাভ করতে যদি হাজার বৎসর কেটে যায় তবে অন্যান্য জাতিরা এই সময়ের মধ্যে আরও অনেক এগিয়ে যাবে এবং সেই সঙ্গে মানবসভ্যতার উন্নতিও অনেক দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করবে।

এই সময়ের ক্ষতি পূরণ করবার জন্য ভারতবর্ষকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অন্যান্য জাতির হাজার বৎসরের জীবন-যাপনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিতে হবে। ভারতীয় সমাজকে তার সেকেলে ধারণা ও প্রাচীন আচার বিচারের কবল থেকে মুক্ত করতে হবে। মধ্যযুগীয় সামন্ত প্রথা ও বর্তমান উৎপাদন প্রণালী থেকে ভারতের সমাজকে মুক্ত করতে হবে কারণ এগুলিই আমাদের আর্থিক উন্নতির প্রধান বাধা। সামন্ততন্ত্রের হাত থেকে মুক্ত হবার পরেও আর এক বাধা হ'ল ধনতন্ত্রবাদ। এর শোষণ থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করবার জন্যই আজ সংগ্রাম শুরু করতে হবে—ধনতন্ত্রবাদের সর্বোন্নত রূপ সাম্রাজ্যবাদ এবং তার চরম পাশবিকরূপ ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে। সুতরাং আজকে আমরা যে বিপ্লবের জন্য লড়ছি তা' একটি মাত্র বিপ্লব নয়। প্রকৃতপক্ষে তা' তিনটি বিপ্লবের সমষ্টি। এই

বিপ্লবগুলি অন্যান্য দেশে বহু হাজার বৎসর এবং বহুপুরুষ ধরে সংঘটিত হয়েছে। এই সব বিপ্লবে যে সব ঐতিহাসিক কার্য সাধিত হয়েছে তা আমাদের মাত্র এক পুরুষের মধ্যে বা আরও অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। মানব সমাজের উপর আজ পর্যন্ত এর চেয়ে কঠিন দায়িত্বের ভার বোধ হয় কোনদিন পড়ে নি। যখনই আমরা বিপ্লবের ইতিহাস অধ্যয়ন করি তখনই এই মহান কাজের বিশেষত্ব অনুভব করতে পারি এবং অন্যান্য দেশের বিপ্লবের ইতিহাস থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করে আমাদের দেশের বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য জানতে পারি।

আমাদের তিনটি বিভিন্ন সমস্যা আছে। কিন্তু সেই সমস্যাগুলির সমাধান পৃথক পৃথকভাবে হতে পারে না কারণ তারা পরস্পর জড়িত। এবং তাদের সমাধান এত জটিল ও দুরূহ যে, অন্যান্য দেশের ইতিহাসও এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারে না কারণ মানব সমাজের ইতিহাসে ইতিপূর্বে এরকম সমস্যার সৃষ্টি আর কোনদিন হয়নি।

বৌদ্ধধর্মের উত্থানকে এক মহান বিপ্লবরূপে চিত্রিত করা অনেকের কাছে হয়ত আশ্চর্যজনক বলে মনে হবে। অনেকে হয়ত বলবেন যে, ধর্ম আন্দোলনের সঙ্গে বিপ্লবের কী সম্বন্ধ? গোঁড়া বিপ্লববাদীরা বিপ্লবকে শুধু রাজনৈতিক ঘটনা বলেই ভাবেন এবং তাদের ধারণা যে, রক্তপাত, কোলাহল সৃষ্টি ও দাঙ্গাহাঙ্গামাই হচ্ছে বিপ্লব। কিন্তু যাঁরা একে সামাজিক ঘটনা হিসাবে চিন্তা করেন তাদেরও মধ্যে অনেকেই বিচার-বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতাবশত এর শুধু উপরটুকু দেখতে পান। আমাদের মূলগত দোষ এই যে, আমরা বিপ্লবের বিশেষত্বগুলিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে অসমর্থ এবং সেই জন্যই বুঝতে পারি না যে, মানব ইতিহাসের এক অধ্যায়ে ধর্ম ও বৈপ্লবিক শক্তি ছিল। তা ছাড়া, এক ধর্ম অন্য ধর্মের চেয়ে অধিক বৈপ্লবিক হতে পারে। এক সময়ে সমগ্র মানবজাতি কেবল ধর্মের ভিতর দিয়েই সব কথা ভাবতো এবং সেই সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলি ধর্ম আন্দোলনের দ্বারাই নিজেদের প্রকাশ করেছিল। মানব জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই বিপ্লবের প্রভাব আছে কারণ মানুষ প্রকৃতিরই একটি অংশ এবং প্রকৃতিতে বহু বিপ্লব সংঘটিত হয়ে এসেছে তার জীব ও জড় পদার্থের মধ্য দিয়ে। প্রত্যেক বিপ্লবই মানুষের সমগ্র কর্মক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে। প্রাচীনযুগে ধর্ম ও অলৌকিক ব্যাপারগুলিই মানুষের মনে সর্বদা জাগ্রত থাকত। তখনকার লোকেরা আমাদের মত বেঁচে থাকলেও এমন এক আবহাওয়ার মধ্যে বাস করতেন যখন ঈশ্বরের প্রতি অন্ধবিশ্বাস, অলৌকিক শক্তি ও ধর্ম—এই সবের প্রাধান্য ছিল। সুতরাং সেই

সময় ধর্মাত্মক আন্দোলনই ছিল বৈপ্লবিক কারণ এই সব আন্দোলনই তৎকালীন ধর্মাত্মক ভাবধারাকে পরিবর্তন করতে পারতো। সেইজন্যই তখনকার সব বিপ্লবই ধর্ম আন্দোলনের ভিতর দিয়ে হয়ে এসেছে। প্রকৃত পক্ষে সমস্ত সর্বজনীন ধর্মই বিপ্লবের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। বৌদ্ধ, খ্রিষ্ট ও ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে এই একই কথা বলা যেতে পারে। চিনেও তাওবাদ যা পরে কনফিউসিয়ানবাদে চাপা পড়ে যায় তা ও ধর্ম আন্দোলনের ফলেই দেখা দিয়েছিল। পুরাতন ধর্মের প্রাকৃতিক শক্তির পূজার্থীদের বিরুদ্ধেই এই সব বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। হিন্দুধর্মকেও আমরা প্রকৃতিবাদ ধর্মের পর্যায়ে রাখতে পারি।

আদিম মানুষ প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়েই ভগবানের সৃষ্টি করেছিল। সেইযুগে মানুষ রৌদ্র, বৃষ্টি প্রভৃতি প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক ঘটনাকেই এক একটি বিশেষ দেবতার কাজ বলে মনে করত। পৃথিবীতে আমাদের জীবন এইসব প্রক্রিয়াগুলির বশীভূত। সেইজন্য এইসব প্রক্রিয়াগুলিকে নিয়মানুবর্তী করার ইচ্ছা মানুষের মনে জেগে ওঠে। প্রকৃতিবাদী ধর্মের সৃষ্টি হয় তারই ফলে। যখন মানুষের সুখ সুবিধার জন্য দেবতার সৃষ্টি করা হোল তখন সেই দেবতাদের কাছে নিজেদের প্রার্থনা পৌঁছানোর উপায়েরও প্রচেষ্টা চলতে লাগল। তার ফলে পৃথিবীতে ভগবানের অনুচর হিসাবে এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হয় যারা দেবতাদের তুষ্ট করতে পারে। ঝড় হয়ে সমস্ত ফল ও ফসল নষ্ট হয়ে গেলে কৃষকেরা ভাবে যে, ভগবান তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। দেবতা সৃষ্টি করবার পর আদিম মানুষ পূজা ও অর্ঘ্যের দ্বারা দেবতাদের কৃপাদৃষ্টি লাভ করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে প্রবৃত্ত হয়। দেবতাদের অনুগ্রহ লাভের জন্য আদিম মানুষ দেবতাদের অনুচরবৃন্দের সাহায্য নেয় এবং সেই সুযোগে অনুচরশ্রেণী ক্রমে ক্রমে বেশ শক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা বুঝতে পারে যে, তথাকথিত দেবতাদের অনুচর এই পুরোহিত শ্রেণীর লোকেরা সমাজে বেশ প্রাধান্য লাভ করেছে এবং নিজেদের এই প্রাধান্যকে বজায় রাখবার জন্য এই পুরোহিতশ্রেণী সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর বিকাশের পথে এক বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কারণে অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরা তাদের সেই প্রাধান্য থেকে বিচ্যুত করবার চেষ্টা করতে থাকে। এই প্রচেষ্টার ফলেই মানব ইতিহাসে অনেক বিরাট বিপ্লবের সৃষ্টি হয়।

প্রকৃতিবাদ ধর্মে পুরোহিত শ্রেণীর একটি সামাজিক মূল্য ছিল এবং সেই জন্যই তাঁরা এতদিন সমাজে প্রাধান্যলাভ করেছিলেন। মানবসভ্যতার উন্নতির মাপকাঠি

হচ্ছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদনে। সমাজের প্রত্যেকটি লোকের প্রয়োজনের চেয়ে অধিক উৎপাদিত বস্তুকে একটি সাধারণ ভাণ্ডারে রাখা হয় এবং উহাই পরে জাতীয় ঐশ্বর্যরূপে পরিগণিত হয়। আদিম সমাজে পুরোহিতশ্রেণীই এখনকার মহাজনদের মত এই জাতীয় ধনভাণ্ডারের মালিক ছিলেন। ইতিহাসের বিভিন্ন অবস্থায় সামাজিক উৎপাদনের উদ্বৃত্ত বিভিন্ন উপায়ে সঞ্চিত হয়েছে। ধর্মের বিধান অনুসারে সামাজিক উৎপাদনের যে অংশ উদ্বৃত্ত হয়ে পূজা, ভোগ, উপহার ইত্যাদি রূপে জমা হোত পুরোহিত শ্রেণীই প্রকৃত পক্ষে সেই উদ্বৃত্ত বস্তুর মালিক হয়ে দাঁড়ান। উদ্বৃত্ত বস্তুর মালিকানা স্বত্ব তাদের পক্ষে বেশ লাভজনক হয়ে ওঠে এবং এর ফলে জনসাধারণের শোষণের মাত্রাও বাড়ে। ভগবানের উপর অন্ধবিশ্বাস থাকায় আদিম মানুষ ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা এবং গ্রহ-নক্ষত্রের গতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন বোধ করত না। ভোগ, উপহার প্রভৃতি দ্বারা তারা রুষ্ট দেবতাদের খুসি রাখতে চেষ্টা করত এবং ধীরে ধীরে এই ভোগ, উপহার প্রভৃতির উদ্বৃত্ত অংশের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পুরোহিতশ্রেণীই এই জাতীয় ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিলেন এবং তার ফলে তারা শাসক সম্প্রদায়রূপে সমাজে স্থান দখল করেন। মানুষ যে আশায় এইসব ভোগ উপহার দিত পুরোহিতশ্রেণী যদি তা সফল করতে পারতেন তা হলে পুরোহিতশ্রেণীর বিরুদ্ধে কোন অসন্তোষের কারণ থাকত না এবং বিপ্লবেরও প্রয়োজন হত না। তা ছাড়া প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মূল রহস্যগুলি জানবার জন্য আবহাওয়াতত্ত্ব ও জ্যোতির্বিজ্ঞানেরও বিকাশ হতে পারত না।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উৎপাদনের শক্তিও বাড়তে থাকে। ফলে, উদ্বৃত্ত অংশেরও বৃদ্ধি হয় এবং দূর-দূরান্তের এই উদ্বৃত্ত অংশ সরবরাহ হতে থাকে। এইভাবে আর একটি নূতন সামাজিক ব্যবস্থার বিকাশ হয় যাকে আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য বলতে পারি। তবে এই ব্যবসা-বাণিজ্য সামাজিক কর্তব্য হিসাবে করা হত না। উদ্বৃত্ত অংশ সরবরাহ করার মধ্য দিয়ে একদল লোকের আর্থিক সংস্থানের উপায় হয় এবং তাই তারা অধিক মাল সরবরাহ করবার জন্য অধিক উৎপাদনে প্রবৃত্ত হয়। ব্যবসায় যত বাড়ে লাভের মাত্রাও তত বাড়ে, কিন্তু তখনকার দিনে দেশের সীমা অত্যন্ত অল্প আয়তনের মধ্যে ছিল এবং মানুষের উৎপাদন শক্তিও সীমাবদ্ধ ছিল তাই উদ্বৃত্ত অংশও হোত অল্প পরিমাণে। উদ্বৃত্ত অংশের অধিকাংশই দেবতার পূজা ও ভোগে যেতো। কিন্তু উদ্বৃত্ত অংশকে এ ভাবে ব্যয় না করলে আরও বেশি উদ্বৃত্ত বস্তু সরবরাহ করা সম্ভব হত এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-

বাণিজ্যেরও প্রসার হত। এই কারণে পুরোহিত শ্রেণী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

সামাজিক উদ্বৃত্ত পুরোহিতদের অধিকারভুক্ত হওয়া ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে ছিল। উদ্বৃত্ত অংশ পুরোহিতদের উপহার হিসাবে দেওয়া হত না, ভগবানকে অর্ঘ্য বা ভোগ হিসাবে নিবেদন করা হত। সুতরাং পুরোহিতদের প্রাধান্য নষ্ট করতে হলে আগে ভগবানকে তার সিংহাসন থেকে বিচ্যুত করা দরকার তা হলেই দেবতাকে অর্ঘ্য দেওয়ার প্রথা বন্ধ হয়ে যাবে।

জনসাধারণের উদ্বৃত্ত অংশকে জমা করবার একটা সংস্থা হিসাবে প্রথাটা একেবারে মূল্যহীন ছিল না। পুরোহিতদের কাছে সঞ্চিত ধনের কিছু অংশ নিশ্চয়ই সাধারণের হিতার্থে দান-ধ্যান ও তীর্থবাসীদের জন্য পথ ঘাট তৈরি প্রভৃতিতে ব্যয় করা হোত কিন্তু অধিকাংশ অর্থই কোনরূপ কাজে লাগত না। যতক্ষণ না এই উদ্বৃত্ত ধন বা বস্তু আরও অধিক উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয় ততক্ষণ সেই উদ্বৃত্ত মানব সভ্যতার বিকাশে কোন সাহায্য করে না। অর্থাৎ ঠিক মত অর্থের সরবরাহ হওয়া দরকার এবং ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারাই তা সম্ভব। ব্যবসায়ীগণ সেই পথ খুলে দেয়। এই নূতন সামাজিক শ্রেণী সমাজের এবং সামাজিক উদ্বৃত্তের উপর ভগবানের নাম না নিয়েই নিজশক্তিতে প্রভুত্ব স্থাপন করে। তা ছাড়া ব্যবসায়ীরা যার কাছ থেকে মাল নিত তাকে সেই মালের মূল্য হিসাবে কিছু দিত। কিন্তু ভগবানের কাছে অর্ঘ্য হিসাবে যা দেওয়া হত তার বিনিময়ে মানুষ আশা ও সান্ত্বনা ছাড়া আর কিছুই পেত না। ব্যবসায়ীরা সাধারণ মানুষকে অন্তত কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস দিত। তাই ক্রমশ উদ্বৃত্ত বস্তু বা অর্থের অধিক অংশই ব্যবসায়ীদের কাছে যেতে থাকে। এবং দেবতাদের ভোগের অংশ অনেক কমে যায়। পুরোহিতশ্রেণী সমাজের এই নূতন পরিবর্তন বা বিকাশকে মোটেই পছন্দ করতে পারলেন না। ফলে, সমাজের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং বড় বড় বিপ্লব সংঘটিত হয়।

মানব সভ্যতার উন্নতির পথে এই বণিক সম্প্রদায়ের যথেষ্ট মূল্যবান অবদান আছে। ব্যবসা উপলক্ষে তাদের বহু দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করতে হয় এবং এই ভ্রমণের ফলে তারা নূতনভাবে ভাবতে শুরু করে। দূর-দূরান্তরের দেশ-বিদেশের অবস্থা বিশেষত সমুদ্র যাত্রা তাদের প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির মূল কারণ আবিষ্কার করতে সাহায্য করে। ক্রমশঃই এদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির সম্প্রসারণ হয়। এই ভাবে সমাজে এক নূতন ভাবধারা দেখা দেয়। সামাজিক উদ্বৃত্তের আত্মসাৎকারী

পুরোহিত শ্রেণীর উচ্ছেদের জন্যই তারা সত্যিকারের দর্শন সৃষ্টি করে। তারাই প্রথমে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলিকে পদার্থিক সংজ্ঞা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে। ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি যে কোন অলৌকিক শক্তির বলে ঘটে না— এই সহজ সত্য কথাটি যদি সাধারণে বুঝতে পারে তাহলে পুরোহিত শ্রেণীর আর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। অলৌকিক শক্তির উপর বিশ্বাস না থাকলে সাধারণে সমাজে পুরোহিত শ্রেণীর উপযোগিতা বোধ করে না এবং চাল, ডাল, গরু, ছাগল ইত্যাদি ঘুষ দিয়ে দেবতার এই অনুচরবৃন্দকে তুষ্ট করবার দরকারও থাকে না।

যুক্তি দিয়ে প্রকৃতিকে বুঝবার প্রথম চেষ্টাতেই পুরোহিতদের প্রাধান্য অনেক কমে যায়। যুক্তিবাদ প্রাধান্য লাভ করার ফলে এক বিরাট বিপ্লব ঘটে। পুরোহিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে এই বিপ্লবই তখন উন্নতির সোপান হয়ে দাঁড়ায়। প্রাচীন যুগে মানুষের জ্ঞান ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ তাই তাদের দার্শনিক মতবাদও ছিল কল্পনাপ্রসূত । বিপ্লবের ফলে মানব সভ্যতার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং সমাজে আর একটি নূতন ধর্ম গড়ে ওঠে।

মানুষ স্বভাবতই সর্ববিষয়ে উৎসুক এবং যুক্তিবাদী। এই জন্যই সে যুক্তিতর্কে প্রবৃত্ত হয়। যদি কোন যুক্তিবাদী বলে যে সে কোন এক বিশেষ ঘটনার কারণ বুঝতে পারে না তাহলে বুঝতে হবে যে, সে যুক্তিবাদী নয় কিংবা সে স্থিরভাবে চিন্তা করতে পারে না। প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির সঠিক কারণ যুক্তি দ্বারা বুঝতে অসমর্থ হওয়ায় পুরাকালের যুক্তিবাদীদের তত্ত্বজ্ঞানজনিত অনুমাণগুলি সাধারণের কাছে যুক্তিবাদ বলে মনে হয়েছিল। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার জন্য ধর্মই তখন যুক্তিতর্কের আশ্রয় হয়।

প্রকৃতিবাদী পুরোহিতশ্রেণীর প্রাধান্য কমে গেলেও ধর্মের স্থান সমাজে ছিল। অদ্বৈতবাদ হিসাবে নূতন ধর্ম গড়ে উঠে। নৈসর্গিক বহু দেবতার জায়গায় একেশ্বরের আধিপত্ব স্থাপন হয়। প্রকৃতিবাদী ধর্মের দেবতাদের স্থানে বিভিন্ন দেশের লোকেরা বিভিন্ন ভাবে এক জগৎ ব্যাপি সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করে। মূর্ত্তিহীন ভগবানের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পৌরহিত্যের প্রয়োজনীয়তাও রইলো না। পুরোহিতশ্রেণীর এই ক্ষমতাচ্যুত হওয়া এক বিরাট বিপ্লব।

প্রাচীন ভারতেও লোকের বহু সমস্যা ছিল। দেবতারা তার সমাধান করেন নি। সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে মানুষের ঔৎসুক্য বহুদিন থেকেই শুরু হয়েছে। উপনিষদে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রকৃতির রহস্যকে উদ্ঘাটন করবার জন্য যুক্তির

আশ্রয় গ্রহণ করায় প্রকৃতিবাদী বৈদিক ধর্মের মূলে এবং পুরোহিত শ্রেণীর ক্ষমতায় গভীর আঘাত লাগে। কিন্তু সেই সময়ে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নিশ্চয়ই খুব দুর্বল ছিল। ভারতের সবচেয়ে দুর্ভাগ্য এই যে প্রত্যেক সঙ্কটাপন্ন অবস্থাতেই বিপ্লবীদের উপর যে পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল তারা সেই কাজ সম্পন্ন করার সমকক্ষ ছিলনা। পুরোহিত শাসক সম্প্রদায়ই তখন বিপ্লবের আদর্শ প্রচার করেন। ফলে পুরোহিত শাসক সম্প্রদায় এবং বিপ্লবের বিরুদ্ধপক্ষীয় পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়। এই সংঘর্ষ শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং ভারতবর্ষ অপেক্ষা গ্রিসের সংঘর্ষ অনেক প্রচন্ডরূপ ধারণ করেছিল। গ্রিস ও ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থা প্রায় একই রকম থাকার ফলে দু'টি দেশই প্রায় একই অবস্থার মধ্য দিয়ে যায়।

যে চিন্তাধারা প্রকৃতিবাদী বৈদিক ধর্মের মূল শিথিল করে দিয়েছিল সেই সব চিন্তাধারাই ক্রমশ হিন্দু বৈশেষিক ও সাংখ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা করে, এবং পরে বৌদ্ধ বিপ্লবের বার্তা প্রচার করে। পুরোহিত শ্রেণীর সামাজিক প্রাধান্যের বিরুদ্ধেই এই বিপ্লব। অন্যান্য দেশের বিপ্লবের তুলনায় এই বিপ্লবকে আরও অগ্রবর্তী বলা যেতে পারে কারণ ভগবানের অস্তিত্বকে পুরোপুরি অস্বীকার করে এই বিপ্লব ধর্মের প্রধান মূলে আঘাত করে। সময়ের তুলনায় এ বিপ্লব যথেষ্ট অগ্রবর্তী। কিন্তু প্রাকৃতিক রীতি-নীতি সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকায় মানুষ তখনও তত্ত্বজ্ঞান জনিত অনুমান ছাড়া চলতে পারতো না। আধ্যাত্মিক ও সামাজিক এই দুই দিক দিয়েই ধর্ম প্রয়োজনীয় ছিল। বৌদ্ধ চিন্তাধারা সভ্যতা, সংস্কৃতি ও উন্নতির পথ না দেখিয়ে শুধু পুরাতন সমাজের ভাঙ্গনের পথই খুলে দেয়। কিন্তু তা' সত্বেও এই দুর্বলতাই বৌদ্ধধর্মের উত্থানের প্রধান কারণ।

সে যুগে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় দুর্বল হলেও তারাই ছিল প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের মেরুদন্ড। বৌদ্ধধর্মের প্রচারক ছিলেন যোদ্ধৃশ্রেণীর এবং ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রাধান্যে প্রচন্ড আঘাত করেন। পরেও যোদ্ধৃশ্রেণীর মধ্যে অনেকে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক হন। সাতশ' বৎসর ধরে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের আন্দোলন তুমুল ভাবে চলেছিল। কিন্তু এই আন্দোলনের কোন তথ্যই আজ পাওয়া যায় না; প্রতিবিপ্লবীশক্তি ইতিহাস থেকে বৌদ্ধধর্মের সমস্ত কিছুই মুছে দিয়েছে। কিন্তু যে বৈদিক সভ্যতা বৌদ্ধ বিপ্লবের ফলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা প্রতিবিপ্লবীশক্তির পক্ষে সম্ভব হয়নি। পতনোম্মুখ সমাজের ধ্বংস এই বিপ্লবের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল। প্রকৃতিবাদ ধর্মের ভগবানকে ঠেলে ফেলে দিয়ে এবং

ঈশ্বরবাদ ও পরজন্মের অন্ধবিশ্বাসের মূলে আঘাত করে বৌদ্ধধর্ম সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গঠন ধ্বংস করে; যার ফলে পুরাতন সমাজের আধ্যাত্মিক ভিত্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সমাজব্যবস্থাও শিথিল হয়।

যোদ্ধৃ ও ব্যবসায়ীশ্রেণী সংঘবদ্ধ ভাবে সমাজসংস্কারের ভার গ্রহণ করে। তারা অনেকটা কৃতকার্য হয়েছিল। নতুবা বৌদ্ধধর্ম এতদিন পর্যন্ত টিঁকে থাকত না। কিন্তু ক্রমশ এই বিপ্লবের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। যোদ্ধৃশ্রেণী কর্তৃত্ব দখল করে এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়—যারা এই বিপ্লবের প্রধান শক্তি—তাদের পিছনে হটিয়ে দেয়। মনে হয়, বৌদ্ধসমাজের গঠনে সামঞ্জস্য ছিলনা, এবং এই অসামঞ্জস্যতা অশোক ও চন্দ্রগুপ্তের সময় সবথেকে বেশি দেখা দেয়। যোদ্ধৃশ্রেণীর কর্তৃত্বের ফলে তারা সামন্তপ্রথার সমর্থন করে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নানারূপ বাধা বিপত্তি চাপায়।

যোদ্ধৃশ্রেণীর কাজ ক্রমাগত বাড়লে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু যে সব শহরে এবং রাজত্বে ব্রাহ্মণ ধর্মের প্রাধান্য ছিল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবারও প্রয়োজন ছিল। নেপোলিয়নের মত অশোক প্রাচীন ভারতে তাঁর বিপুল সাম্রাজ্যে বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের সামাজিক ভিত্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং ক্রমাগত ঘরোয়া যুদ্ধের ফলে জনসাধারণের দারিদ্র্যও বেড়ে যায় তাতে করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই নিঃস্বতা ও দৈন্যের থেকে সান্ত্বনা পেতে জনসাধারণ এক নূতন ধর্মের আশ্রয় নেয় এবং পরে তাতেই বৌদ্ধধর্মও অধঃপতিত হয়। বৌদ্ধ সমাজ প্রাচীন সামন্ত প্রথা অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। তাই পুরোহিতশ্রেণীর সাহায্য ব্যতিরেকে এই সমাজ দাঁড়াতে পারেনি। বৌদ্ধমঠ ও ভিক্ষুপ্রথা পুরোহিত শ্রেণীর স্থান দখল করে এবং বৌদ্ধ সমাজের ভাঙ্গনের মূলও ইহাই। পরে ইহাই বৌদ্ধধর্মকে বিনষ্ট করে এবং ব্রাহ্মণ প্রতিবিপ্লবের ভিত্তি স্থাপন করে।

পুরাকালের প্রত্যেকটি বিপ্লবের মধ্যেই দুটি ভাব খুব বেশি প্রকাশ পায়। একটি সমাজ সংস্কারের ও অপরটি সমাজ ভাঙ্গনের। এক হিসাবে বিপ্লবেই এই দুইটি ভাব আছে। প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার উন্নতির সম্ভবনা বিলুপ্ত হলে বিপ্লবের প্রয়োজন বোধ হয় এবং সেই প্রয়োজনই পুরাতন ব্যবস্থার উচ্ছেদের কারণ হয়। প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের প্রথম প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে ভাঙ্গন, পরে সংস্কার সাধন হতেও পারে নাও হতে পারে। পুরাতন সামাজিক গঠনের মধ্যেই যে অন্তর্নিহিত শক্তি

নূতন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে তারই ওপর ইহা নির্ভর করে।

ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দুর্বলতার জন্য বৌদ্ধধর্মে সমাজ সংস্কার অপেক্ষা ভাঙ্গনের ভাবই বেশি প্রবল ছিল। বৈদিক সমাজের ভিত্তি দুর্বল করে এবং ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য নষ্ট করে যখন সমাজ সংস্কারের প্রশ্ন ওঠে তখনই এই বিপ্লবের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ভাঙ্গনের ভাবই প্রাধান্য লাভ করে। সেইসব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে লোকে বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ নীতিতে অনুপ্রেরিত না হয়ে তার প্রতিকূল ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হয়। সমাজকে নূতন করে গড়ে তোলবার কঠিন কাজে তাদের কোন উৎসাহ দেখা গেল না। তারা সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যা থেকে দূরে সরে গিয়ে নির্বানের পথ বেছে নেয়। সমাজের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার অন্তর্নিহিত যে দুইটি শক্তির ফলে এই সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় এবং যার মধ্যে থেকে বৌদ্ধ সমাজ সৃষ্টি হয় সেই সংঘাত বৌদ্ধ সমাজ সহ্য করতে পারত— যদি তার সম্মুখে কোন বাধা বিপত্তি না উপস্থিত হত। কিন্তু কতকগুলি প্রতিবিপ্লবী শক্তি যার প্রভাব ক্রমশ কমে আসছিল কিন্তু একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি— তারা প্রত্যক্ষভাবে এগিয়ে আসে। নিজেদের অন্তর্নিহিত সংঘর্ষের ফলে বৌদ্ধ সমাজ এক সঙ্কট জনক অবস্থায় পৌছায় এবং সেই অবস্থায় প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে তারা দাঁড়াতে সমর্থ হয় নি।

বৌদ্ধধর্মকে বিনষ্ট করে নিজেদের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার জন্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তাঁদের ঔপনিষদিক দর্শন, যা তাঁরা নিজেরাই সৃষ্টি করেছিলেন, তাকে বাতিল করে দিয়ে হাজার বৎসর পিছনে বৈদিক যুগে ফিরে যান। বৌদ্ধ বিপ্লবের সাফল্যের যে সব তথ্য পাওয়া যায় তার চেয়ে প্রতিবিপ্লবের ফলে তার যা ক্ষতি হয়েছিল তার তথ্য অনেক কম পাওয়া যায়। বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের এই ঘোরতর সংঘর্ষের ফলে সমাজে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

তখনকার লোকের নূতনভাবে সমাজ গঠনের জ্ঞান না থাকায়, নিজেদের ক্ষমতায় বিশ্বাস না করে তারা এক অলৌকিক শক্তির প্রতি আস্থা রেখে শান্তিলাভ করবার চেষ্টা করে। এজন্মে না হলেও পরজন্মে ভালভাবে জীবন যাপন করবার আশা— বিরাট নিশ্চয়তার মধ্যে থাকার চেয়ে অনেক বেশি মোহনীয়। বেঁচে থাকা হচ্ছে মানব প্রকৃতির প্রধান আশা। ব্রাহ্মণ ধর্ম মানুষের এই দিকে আশার সঞ্চার করে। তাঁরা প্রচার করেন যে দেবতার পূজা করলে এবং ধর্ম থেকে বিচলিত না হলে দেবতারা মানুষকে দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি দেবেন এবং পরজন্মেও সুখসাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রাখবেন। এই প্রচার সমাজকে আকৃষ্ট করে।

সামাজিক রীতিনীতি পালন করাই হচ্ছে ধর্ম; এবং ব্রাহ্মণ ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য মনু যে সব রীতিনীতি নিয়মাবদ্ধ করে গিয়েছিলেন—এই অবস্থার মধ্যেই তার প্রতিষ্ঠা হয়।

মানব সমাজ দুরবস্থার মধ্যে সান্ত্বনা চায়। যে ভগবানকে মানুষই একদিন বিদায় দিয়েছিল সেই ভগবানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেই মানুষ আবার আশা ফিরে পেল। ব্রাহ্মণেরাও এই সুযোগে নিজেদের ভগবানের অনুচর হিসাবে প্রচার করে আবার ক্ষমতার অধিকারী হন। তাঁদের নেতা হলেন শঙ্করাচার্য। এঁকে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী বলে গর্ব করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, তিনি শুধু ভারতের নয় সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন; কিন্তু সমাজের কৃষ্টির দিক থেকে তিনি অত্যন্ত ক্ষতিকারক ছিলেন। ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্ভাগ্য ও লজ্জাজনক অধ্যায়ের তিনি প্রতিবিপ্লবের আদর্শবাদী ছিলেন। তিনিই বৌদ্ধ-বিপ্লবের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন এবং তারপর থেকে ভারতের সমাজসংস্কারের পথ এরূপ বাধাপ্রাপ্ত হয় যে কোন বিপ্লবী শক্তির উত্থান আজও সম্ভব হয়নি। সেই অবস্থা আজও বর্তমান আছে। যদিও এই নিস্তেজতা দূর হয়ে মাঝে মাঝে বিপ্লবী শক্তি দেখা দিয়েছে, তবুও প্রত্যেক বারই তা' হয়েছে বৈদেশিক আক্রমণের সংঘর্ষে। গত হাজার বৎসর ধরে ভারতীয় সমাজে যা কিছু বৈপ্লবিক পরিবর্তন তা' সবই বৈদেশিক আক্রমণের ফলেই হয়েছে। ভারতের ইতিহাসের এই অসাধারণত্বের কারণ এই যে, বিপ্লবের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তা' ভারতীয় সমাজে কোন দিন ছিলনা। এবং এরজন্য দায়ী ভারতের সামাজিক ব্যবস্থার দুর্বলতা। বৈদেশিক আক্রমণের ফলে ভারতের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আলোড়ন না হলে ভারতীয় সমাজ এতদিনে প্রায় নিঃশেষ হয়ে যেত।

মুসলমান অভিযানেই ইহার শুরু হয়। বিপ্লবের ফলেই এই ইসলাম ধর্মের উদ্ভব হয়। ভারতে আসবার পরও প্রথমাবস্থায় এই ধর্ম বৈপ্লবিক শক্তি হিসাবে সাফল্য লাভ করে। অনেকে বলেন যে তলোয়ারের ভয় দেখিয়ে ইসলাম ভারতবাসীকে কোরাণ মানতে বাধ্য করে। কিন্তু তা' ছাড়াও ইসলামের মধ্যে যে আর একটা দিক ছিল তা সাধারণত লোকে জানেনা। কোরাণ মানা মানেই এক বিরাট ভ্রাতৃসঙ্ঘের সভ্য হওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অন্যান্য লোকের মত এক বিরাট ভ্রাতৃত্বের একই সামাজিক স্তরের অভিভুক্ত হওয়া। ইহা অত্যন্ত লোভনীয় নয়? এবং ইহা মেনে নেওয়া কি কাপুরুষতা? বৌদ্ধধর্মের পতনের পর

ব্রাহ্মণ-প্রতিবিপ্লবী শক্তি সাধারণের উপর যথেষ্ট অত্যাচার শুরু করে এবং তার ফলে নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের এমন দুরবস্থা হয় যে, তারা কোরাণের এই বিরাট ভ্রাতৃসঙ্ঘে যোগ দিয়ে সেই সমাজের আর সকলের সঙ্গে একই স্তরে উঠে মানুষের মতন বাঁচবার আশায় অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। তাই ইসলাম এদেশে এত সহজে সাফল্য লাভ করে। নতুবা কয়েকশত মাত্র আরববাসী ভারতকে জয় করতে পারত না।

পরে ব্রিটিশের অভিযানও ঠিক এই ভাবেই হয়। সেই সময়ে বিদেশিয়রা ভারতবর্ষকে জয় করেনি—ভারতবাসীরাই বিদেশিয়দের পক্ষ সমর্থন করে ভারতবর্ষ জয় করে। যতক্ষণ না এই ঘটনাটি উপযুক্ত ভাবে বিচার করা যায় ততক্ষণ ব্রিটিশের ভারত আক্রমণের কোনরূপ ঐতিহাসিক অর্থই খুঁজে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষেরই এত লোক কেন ইংরাজদের ভারত বিজয়ে সাহায্য করেছিল? তখন দেশের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়েছিল এবং একটা আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেই প্রয়োজনকে বাস্তবে পরিণত করবার মত শক্তি তখনও দেশে গড়ে ওঠেনি, এবং ভারতের বিপ্লবী শক্তিরাও নিজেদের দুর্বলতার জন্যই বিদেশি শক্তির সহিত মিলিত হয় এবং বিদেশি শক্তিও নিজেদের স্বার্থের জন্যই এখানকার জীর্ণগ্রস্থ রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থাকে ভাঙ্গতে প্রবৃত্ত হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যারা ইতিহাসকে বিচার করেন সেই সব ঐতিহাসিকেরা ইংরাজের ভারত-বিজয়কে এক বৈপ্লবিক ঘটনা বলে মনে করেন। কিন্তু তা' সত্বেও বিপ্লবের উদ্দেশ্য সাধিত হয়নি কারণ অপরের সাহায্যে বিপ্লবের বিপরীত ফলই হয়। সেই অর্দ্ধেক সম্পন্ন বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল লাভ হতে আজও বাকি আছে।

প্রথমে এক অন্যতম প্রাচীন বিপ্লবের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে যাকে ধর্মাত্মক বিপ্লব বলা যেতে পারে। ঠিক এই ভাবেই খ্রিষ্টান, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধেও আলোচনা করা যায়।

প্রাচীন সভ্যতা ধ্বংস হবার পর সমাজকে এক নূতন ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এই নূতন সামাজিক ব্যবস্থা প্রায় একহাজার বৎসর টিকে থাকে। এই সময়কে আমরা মধ্যযুগ বলি। তারপর পৃথিবীতে আর এক নূতন বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত হয়।

এই যুগের প্রথম ঘটনা ফরাসি বিপ্লব। ফরাসি বিপ্লব আকস্মিক, বা সভ্যতার বিবর্তনে কোন অসংলগ্ন ঘটনা নয়। এই বিপ্লবের সূচনা হয় চতুর্দশ শতাব্দীতে

এবং শেষ হয় ফরাসি বিপ্লবে। এই বুর্জয়া বিপ্লবের সূচনা খ্রিষ্টিয় চার্চের মধ্য থেকেই শুরু হয়, এবং ইহাই উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম ও সামন্ত প্রথার উচ্ছেদ। সেই প্রক্রিয়া কয়েক শতাব্দী ধরে চলবার পর ফরাসি বিপ্লবের আগেই কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সৃষ্টি হয়। এইসব ঘটনা ইউরোপের একটি অশুভ আমলের সূত্রপাত বলে বিবেচিত হয়। এরও আগে ইউরোপ ও আমেরিকায় কয়েকটি বিপ্লব সাধিত হয়। ইংল' প্রথম রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটে এবং সেই বিপ্লবের ফলে "ম্যাগ্নাকাটা" রচিত হয়। ইউরোপের অন্যান্য অংশে ফরাসি বিপ্লবের পূর্বেই তিনশত বৎসর ধরে অনেক বৈপ্লবিক চাঞ্চল্যের প্রকাশ হয়। ইটালিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপক সভার প্রতিষ্ঠা, এবং পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের ধর্ম বিরোধী আন্দোলন ও বিক্ষোভের সৃষ্টি, জার্মানিতে কৃষক যুদ্ধ এবং ওলন্দাজ গণতন্ত্রের উত্থান তা'র মধ্যে বিশিষ্ট ঘটনা।

এই সমস্ত আন্দোলনের ও বিপ্লবের বার্তাবহ ছিল ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। এবং এইসব সংঘর্ষ হয় সামন্ত প্রথার একান্ত অনুগামী জায়গীরদারদের সঙ্গে। মধ্যযুগে এই জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়। তারা পুরোহিত শ্রেণীর হাত থেকে শাসনক্ষমতা দখল করে; এবং নূতন এক পুরোহিত শ্রেণীর সৃষ্টি হয় পুরাতন প্রকৃতিবাদী ধর্মের ধ্বংসের উপর। তারাও খানিকটা শাসন ক্ষমতা দখল করে। বিপ্লব চলে সামন্ত ও তা'দের সমর্থক পুরোহিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে। কিন্তু ইতিমধ্যে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যেও যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা দেয়। তারা শুধু অন্যের উৎপাদিত বস্তুর সরবরাহ করেই সন্তুষ্ট থাকে নি, নিজেরাই তখন উৎপাদন করতে শুরু করে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের এই পরিবর্তন পৃথিবীতে দ্বিতীয় বিপ্লবের সূচনা করে। এর পরেই ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কলকারখানা তৈরি করে উৎপাদন প্রণালীতে নূতন ধারা নিয়ে আসে এবং নিজেরা কলকারখানা সংশ্লিষ্ট এক নূতন সম্প্রদায় হিসাবে গড়ে উঠে।

সামাজিক বিবর্তনের প্রথম যুগে ভূমিই ছিল একমাত্র উৎপাদনের উপাদান। তখন মানুষের বেশির ভাগ পরিশ্রমই জমিতে ব্যয় হ'ত। অবশ্য অন্যান্য প্রয়োজন মিটাবার জন্য অন্য কাজও করতে হত। প্রথম দিকটায় শ্রমশিল্প শুধু কৃষিশিল্পের সহায়ক রূপেই গড়ে ওঠে কিন্তু মধ্যযুগে এর পরিবর্তন হয় এবং অনেক শ্রমিক কলকারখানায় কাজ পেতে থাকে। তারপর শ্রমশিল্প কৃষিশিল্প থেকে স্বতন্ত্রভাবেই চলতে থাকে।

এইসব নূতন শিল্প কেবলমাত্র আদান প্রদানের জন্যই মাল তৈরি করে। তাই ব্যবসায়ীদের সহায়তা ছাড়া এসব কাজ সম্ভব হয় না। ক্রমশ এই সম্প্রদায়

উৎপাদনের ভারও নিজেদের হাতে নেয় এবং প্রাচীন মধ্যযুগীয় ব্যবসায়ী শ্রেণীর থেকে স্বতন্ত্র এক নূতন শ্রেণীতে পরিণত হয়। মধ্যযুগের সভ্যতা নিঃশেষের পর আধুনিক সভ্যতার প্রারম্ভে যে বিপ্লব শুরু হয় তার অগ্রদূত এই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। শিল্পী, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, এবং শিল্পপতি যারা উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট- তাদের নিয়ে এই বিপ্লবীশ্রেণী গঠিত। তখনও ভূমিই ছিল উৎপাদনের প্রধান উপাদান এবং তাতেই বেশিই লোক কাজ করত তাই এই নূতন শ্রেণীর সঙ্গে পুরাতন ভূম্যাধিকারীদের সংঘর্ষ হয়।

সামাজিক উদ্বৃত্ত কার হাতে থাকবে তা' নিয়েই এই সংর্ষের সৃষ্টি। চাষারা কষ্ট করে উৎপাদন করে কিন্তু ভূম্যাধিকারীরাই তার অধিক অংশ আদায় করে নিত। চাষীদের হাতে উদ্বৃত্তের খুব কমই যেত, ফলে তাদের বেঁচে থাকাই কষ্টকর হয়ে ওঠে। নূতন নূতন শিল্পের প্রাদুর্ভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানারকম জিনিস তৈরি হতে থাকে এবং সেগুলি বিক্রির প্রয়োজন হয়। কিন্তু তখন সমাজের বেশির ভাগ লোকই কোনরকমে দু'মুঠো খেয়ে বেঁচে থাকত এবং শুধু বেঁচে থাকতে হলে যা প্রয়োজন তার অধিক কিছু কেনবার মত ক্ষমতা তাদের ছিল না। সেই সময় এক গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়। উৎপাদিত বস্তু বিক্রয়ের জন্য বাজার এবং কেনবার মত লোকও চাই; কিন্তু কিনবে কে? উৎপাদিত বস্তুর সমস্তই জমিদারদের প্রয়োজন হ'ত না সুতরাং অনেক মাল বাজারে থেকে যেত। তাই ব্যবসায়ীশ্রেণী চাষীদের হাতে উদ্বৃত্তের কিছু অংশ দিতে চায় যাতে চাষীরাও জিনিস কিনতে পারে।

এই ভাবে ব্যবসায়ী ও শিল্পী সম্প্রদায় চাষাদের মুক্তিদাতা হিসাবে এগিয়ে আসে। তারাই প্রথম এই দাবী আনে যে চাষীদের জমিদারদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা হোক। জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে এদের স্বার্থের মিল থাকায় ব্যবসায়ী ও শিল্পী সম্প্রদায় বিপ্লবের অগ্রদূত রূপে সমাজে গন্য হয়। উৎপাদনের প্রধান উপাদান ভূমির উপর জমিদারদের একাধিপত্য সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছিল তাই সেই ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে নূতন প্রণালীতে উৎপাদনের ব্যবস্থার প্রচলন সামাজিক উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজন হয়।

এরপর আর সামাজিক উদ্বৃত্তের ভাগ বাঁটোয়ারা বা দখলী স্বত্ব নিয়ে সংঘর্ষ চলে নি। সেই উদ্বৃত্তকে কি ভাবে বাড়ান যায় যাতে সভ্যতা ও সংস্কৃতি আরও উন্নত হতে পারে এই ছিল প্রধান সমস্যা। সমস্ত ধনের মূলে যখন শ্রমশক্তি তখন অধিক উৎপাদনের একমাত্র উপায় সেই শক্তিকে উৎপাদনের এক ক্ষেত্র থেকে

অপর ক্ষেত্রে চালনা করা যাতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ আরও বাড়ান যায়। এই নূতনপন্থাই হচ্ছে—বহুউৎপাদন। উৎপাদনের এই বৃদ্ধি শ্রমজীবিদের চাষবাস ছেড়ে যন্ত্র শিল্পে কাজ করতে আকৃষ্ট করেছিল; এবং যদিও এর ফলে, জমিদার শ্রেণীর হাত থেকে চাষারা চলে আসাতে, তাদের স্বার্থে প্রচন্ড আঘাত লাগে, তবুও সামাজিক উন্নতির জন্য এর অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। উদ্বৃত্ত অংশে তাদের একচেটিয়া অধিকার ছিল এবং তাদের সেই কর্তৃত্ব বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাদের অধীনস্থ জমিতেই অধিকাংশ শ্রম ব্যয় হত সেই সুযোগে উদ্ধৃত্ত অংশে তারা একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। তাই শ্রম কৃষিশিল্প থেকে অন্যান্য শিল্পে নিয়োগ করার পর উদ্ধৃত্তের একাংশ এই নূতনশ্রেণীর হাতে যায়। এই উদ্ধৃত্তের পরিমাণ বহু উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভূম্যাধিকারী সম্প্রদায়ের প্রাধান্যও কমতে থাকে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না এই সম্প্রদায়ের আধিপত্য একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজের পূর্ণ বিকাশ হওয়া সম্ভব নয়—শ্রমজীবিরা বেশি উৎপাদন করতে পারে না, সামাজিক উদ্বৃত্তও বর্দ্ধিত হয় না এবং সামাজিক বিবর্তন শক্তিশালী হয় না। তখনই বিপ্লবের প্রয়োজন হয়।

বুর্জোয়া বিপ্লব ইউরোপে পঞ্চাদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলে। মানব ইতিহাসের এই অধ্যায়টিই সবচেয়ে জ্ঞানদায়ক, ঘটনাবহুল, সার্থক ও উজ্জ্বলতম অধ্যায়। এই সময়েই ইউরোপীয় সমাজে আর এক বৈপ্লবিক শক্তির সৃষ্টি হয় যা সব যুগে সব দেশে বিপ্লবের শক্তি হিসাবে অমর হয়ে থাকবে; তা' হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞান।

বুর্জোয়া সম্প্রদায় বিপ্লব সাধন করতে পারেনি; কারণ বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকে চিরাচরিত প্রথা থেকে মুক্ত হয়ে মানব স্বাধীনতার উদ্দেশ্যকে পরিস্ফুট করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞান তখনও তত উন্নত হয় নি। ব্যবসায়ী রাজা ও বিদ্রোহী পুরোহিতেরা সমাজ বিবর্তনের প্রথমাবস্থায় প্রকৃত দর্শন গড়ে তোলবার যে প্রচেষ্টা করে পদার্থিক জ্ঞানের অনুন্নতার জন্য তারা তা সার্থক করতে পারেনি। ক্রমশ সেই নূন্যতা দূর হয়ে যায় এবং ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে পদার্থিক জ্ঞান অনেক উন্নত হয়। এই পদার্থিক জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ সত্যিকারের দর্শন সৃষ্টি করে যাতে করে মানুষের আয়ত্বের বাইরে কোনরূপ অলৌকিক শক্তির অস্বিত্ব অস্বীকার করা সম্ভব হয়। জ্ঞানই মানুষকে শক্তিদান করে। বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কার মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় ও উৎপাদন প্রণালীতে অনেক পরিবর্তন এনে দেয়; উৎপাদনের অনেক নূতন উপাদানের উদ্ভব হয় এবং সেই সঙ্গে সামন্ত

প্রথার ভূম্যাধিকারীদের ক্ষমতা ও জাঁকজমক অনেক কম হয়ে যায়।

বিপ্লবের প্রকৃত ইতিহাস হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাস। বিপ্লবের ইতিহাসের এই অধ্যায়টিই সবথেকে গৌরবময় ও প্রয়োজনীয়। আধুনিক বিজ্ঞানের সৃষ্টি ইতিহাসের এক চমকপ্রদ ঘটনা। এই ঘটনাগুলি শুধু পড়লেই হবে না—এর থেকে ভাল করে শিক্ষা লাভ করতে হবে। লিওনার্ডো ডা ভিন্সি, রজাক বেকন, কপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, প্রভৃতি সকলেই এক একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই সব পদার্থ-বৈজ্ঞানিক ও অর্থনীতিবিদের সাহায্য ছাড়া ফরাসি বিপ্লব সম্ভব হত না। নিউটন থেকে ডারউইন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক বিকাশের সমন্বয়ে মার্ক্সবাদের সৃষ্টি হয়।

বিপ্লবের ইতিহাসে আর একটি শিক্ষনীয় বস্তু হচ্ছে মানব সভ্যতার বিবর্তনে ধর্মের বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধ, জিশুখ্রিষ্ট, মহম্মদ এঁরা প্রত্যেকেই বিপ্লবের অগ্রদূত ছিলেন। বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রথমাবস্থায় যদিও সেই বিপ্লব ধর্মাত্মক ভাব বিনষ্ট করে তবুও তখন সমাজে ধর্ম এক শক্তিশালী উপাদান ছিল। বুর্জোয়াশ্রেণীর এই অগ্রদূতেরা আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে যে দর্শন সৃষ্টি করে তা অত্যন্ত বৈপ্লবিক এবং সেই দর্শনের সাহায্যে পার্থিব সমস্যার সমাধানের জন্য কাল্পনিক বা অলৌকিক অনুমানের প্রয়োজন হত না। অথচ বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রথমদিকে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। কৃষকেরা ধর্মের দ্বারাই বেশি প্রভাবান্বিত হত। কারণ তারা ধর্ম ও ভগবানে বিশ্বাস রেখেই সবকিছু চিন্তা করে। কেবলমাত্র নূতন উৎপাদনকেন্দ্রে আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে যারা কাজ করত সেই অল্প সংখ্যক লোকের উপরই আধুনিক বিজ্ঞান প্রভাব বিস্তার করে। খুব অল্প কয়েকজন মাত্রই প্রাচীন ধর্ম ভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছিল। বেশির ভাগ লোকই পুরোহিতশ্রেণীর আয়ত্ত্বাধীন ছিল এবং ধর্ম মেনে চলত। প্রথমাবস্থায় বুর্জোয়া বৈশিষ্ট্যই ছিল—কৃষক বিদ্রোহ। ফরাসি বিপ্লবের সাফল্যও কৃষকশ্রেণীর উপবই নির্ভর করে। তা'ছাড়া জার্মানির কৃষকযুদ্ধ ও ইংলন্ডের ওয়াট টাইলারের বিদ্রোহও কৃষকশ্রেণীর দ্বারা হয়। পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের ধর্ম বিরোধীদেরও কৃষক সম্প্রদায় সাহায্য করে। এই সব বিদ্রোহ রাজকীয় শাসন, তাদের ক্ষমতা ও সুখ-সুবিধার বিরুদ্ধে চালিত হয়। এমনকি পুরোহিত সম্প্রদায়ের এক অংশ পৌরহিত্যের বিরুদ্ধতা করে। এইটিই বিপ্লবের ইতিহাসের সবথেকে চমকপ্রদ অধ্যায়।

রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর খ্রিষ্টিয় ধর্মানুষ্ঠানগুলিই শিক্ষা বিস্তারের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এরা অর্থনৈতিক জীবনেরও কেন্দ্র ছিল তা' না হলে দেশের সেই সঙ্কট

কালে তাঁদের বেঁচে থাকা কঠিন হত। এই সব অর্থনৈতিক কেন্দ্রে কুটির শিল্পের প্রসার হতে থাকে। এমন কি এই সব ধর্ম-মন্দিরের নিরালায় প্রথম দিকে আধুনিক বিজ্ঞানও চর্চা হয়। বাস্তবিক পক্ষে আধুনিক বিজ্ঞানের সব অগ্রদূতই খ্রিষ্টিয় যাজক ছিলেন। সেই হিসাবে খ্রিষ্টিয় চার্চগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে বিপ্লবের উদ্দেশ্য সাধন করে। চার্চের কর্তাদের এসব ভাল লাগেনি তাই তারা তা' সহ্য করতে না পেরে বৈপ্লবিক কার্য-কলাপ বন্ধ করতে প্রবৃত্ত হয়। চার্চের ভিক্ষু ও যাচকেরা নির্জন আবহাওয়ায় পড়াশুনায় ব্যাপৃত থাকতেন এবং তার ফলে তাদের মনে অনেক গভীর প্রশ্নের উদয় হয়। তাই তাদের এই সব প্রচেষ্টায় যখন বাধা দেওয়া হয় তখন তাঁরা ধর্ম-প্রভুদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। তখন সমাজ এতই নিম্নস্তরে নেমেছিল যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক বা যাঁরা বৈজ্ঞানিক মতবাদ পোষণ করতেন সেই সব শিক্ষিত ব্যক্তি ও পুরোহিত থেকে আরম্ভ করে সাধারণ লোককে পর্যন্ত ধর্মবিরোধী ও পাষন্ড বলে হেয় গন্য করা হত। বিজ্ঞানের সেই সব আত্মোৎসর্গী কর্মীরাই বুর্জোয়া বিপ্লবের অগ্রদূত। এদের মধ্যে অনেকেই যাজক ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এঁরাই বস্তুবাদী দর্শনের অগ্রদূত এবং এঁরাই ঈশ্বরবাদ ও ধর্মের ভিত্তি শিথিল করেন।

আন্দোলনের প্রথমাবস্থায় কৃষকদের অশান্তিই বিপ্লবের প্রেরণা ও শক্তি দেয়। তখন পুরোহিত শ্রেণী শাসক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল না, তাঁরা জমিদারদের ক্ষমতার আংশিক অধিকারী ছিলেন। কিন্তু মধ্যযুগে চার্চেই ছিল সব থেকে প্রধান জমিদার। ধর্মবিরোধী আন্দোলন ছিল এই আধ্যাত্মিক মহাজনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। যদিও সেই সময় বুর্জোয়া বিপ্লব শুরু হয় তবুও বুর্জোয়া সম্প্রদায় তখনও শ্রেণী হিসাবে গঠিত হয়নি। বিদ্রোহী পুরোহিতেরাই কৃষক বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যে কোন উন্নতিশীল শক্তি নিজেদের সুপরিস্ফুট রূপ ধারণ করবার আগেও বিপ্লবের নেতৃস্থানীয় হয়ে উঠতে পারে। সেই সময় এই শক্তি অদ্ভুত ক্ষমতার সঙ্গে কাজ করতে থাকে। তাই যাজকেরাই ধর্মানুষ্ঠানের ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন এবং শোষিত কৃষকদের দিয়ে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব মহাজনদের অত্যাচার ও তাড়নার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেন।

জার্মান কৃষক যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক বই লেখা হয়েছে। ইহাও ধর্ম আন্দোলনই ছিল এবং এই আন্দোলনের সব নেতাই ছিলেন পুরোহিত শ্রেণীর লোক। এদের মধ্যে যারা আমূল পরিবর্তনের সমর্থক ছিলেন সেই অ্যানাবাপটিষ্ট দলের নেতাও ছিলেন একজন যাজক—তাঁর নাম মুয়েঞ্জর। তিনিই প্রথম সাম্যবাদের কথা

বলেন। প্রথমদিকে বুর্জোয়া বিপ্লব অদ্ভুত ভাবে শুরু হয়। অনেকে অবশ্য একে সমাজ সংস্কার বলে থাকেন কিন্তু এই বিপ্লব শুধু খ্রিষ্টিয় ধর্মানুষ্ঠানকেই সংস্কার করেনি; বস্তুত বুর্জোয়া বিপ্লবেরই ইহা অন্যতম অধ্যায়।

বিজ্ঞান যতদিন না দর্শনকে কল্পনা প্রসূত ভাবধারা থেকে মুক্ত করে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা হিসাবে গড়ে তুলেছে ততদিন ধর্মের প্রভাব মানুষের মন অধিকার করেছিল এবং তারা অলৌকিক বা কাল্পনিক শক্তির কাছে নিজেদের আবেদন জানিয়ে এসেছে। কিন্তু মানুষ নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ভগবান সৃষ্টি করেছে, তাই ভগবান মানুষের প্রতিমূর্তি হিসাবেই গড়ে উঠেছে। রোমের ধর্ম মন্দিরের ভগবান সামন্ত প্রথার শুভানুধ্যায়ী ও রক্ষক ছিল। তাই সামন্তপ্রথার বিরোধীর সেই ভগবানকে মানতে চায়নি। বিজ্ঞানের উন্নতি তখনও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকায় সামন্তপ্রথার বিরোধীরাও ভগবান ব্যতিরেকে চলতে পারেনি এবং তারা এমন এক নূতন ভগবান সৃষ্টি করে যে সামন্তপ্রথার একাধিপত্য থেকে দেবতার পৃষ্ঠপোষকতা দূর হয়। তারা ঘোষণা করে যে, ক্যাথলিকদের ভগবান প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রাচীনপন্থী; তাই এই সভ্যতার যুগে তারা আরও সভ্য, প্রগতিশীল এবং গণতান্ত্রিক ভগবানের দাবী জানায়। এদিকে ভগবানের অনুচরবৃন্দ রোমে তাদের পবিত্র সাম্রাজ্যে বিরাজ করছিল। বাস্তবিকপক্ষে, তখন সমস্ত ইউরোপেই একটি রাজত্ব ছিল এবং সেই সাম্রাজ্যের শাসকদের রোমে ভগবানের দূত-পোপের কাছে মাথা নিচু করে রাজমুকুট পরতে হত তবে তিনি সম্রাট হতেন।

এই পোপের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই ভগবানকে সংস্কার করার প্রয়োজন হয়। ধর্মপ্রবন কৃষক সম্প্রদায় তখনও ভগবান ও পুরোহিত মেনে চলত। তারা একথা কিছুতেই শুনতো না যে, ভগবান মিথ্যা এবং তার কোন প্রয়োজন নাই। সেই জন্য তাদের বলা হয় যে ভগবান ভাল—কিন্তু তার পৃথিবীতে যে সব অনুচরবৃন্দ আছে তারা বদ্‌মায়েস।

সাধারণের একটা ধারণা আছে যে ইংল্যান্ডে সব কিছুই শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিয়মতন্ত্রের মধ্যে গড়ে উঠেছে। একথাও অনেকে বলেন যে ইংরাজদের ইতিহাস প্রমাণ করে যে বিপ্লবের কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের সেই ইতিহাস থেকে শিক্ষা লাভ করা উচিত এবং যদি ভারতীয় ছাত্রেরা এটন এবং হ্যারো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা করে তা হলে আমরাও ইংরাজদের মত বিনা বিপ্লবে ভারতীয় সমাজকে নূতন ভাবে গড়ে তুলতে পারব। ইহা সম্ভব

হতেও পারে নাও হতে পারে। সকলেই অবশ্য খারাপ দাঁত বিনা ব্যথায় তোলবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইংরাজদের ইতিহাস আমাদের এ কথা শেখায় না যে, বিনা বিপ্লবে সমাজ সংস্কার হতে পারে। বরং ইংরাজদের ইতিহাস থেকে আমরা বিপ্লব সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখতে পারি। ফরাসি বিপ্লবের আগে ইংল্যান্ডে এক বিপ্লব হয় যার ফলে ভীষণ রক্তকান্ডও হয়। ফরাসিদের এবং রুশদের অনেক আগেই ইংরাজরা তাদের এক রাজাকে হত্যা করে। এই সব ঘটনা উপেক্ষা করি, কারণ ইংরাজদের বিপ্লব এক প্রবল ধর্ম আন্দোলনকে ভিত্তি করে ঘটেছিল এবং সংস্কারেরই পর্যায়ভুক্ত ছিল। এই আন্দোলনের নেতারা ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। তাঁরা প্রাচীন খ্রিষ্টিয় আচার বিচারের পুনরুত্থান করতে চান। তখন ধর্ম যাজকেরা যেমন একদিকে খুব ধনী হয়ে ওঠে এবং সুখেস্বাচ্ছন্দে দিন কাটান তেমনি অন্যদিকে জনসাধারণ শোষিত হয়ে অত্যন্ত দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করে। কিন্তু নিম্নস্তরের যাজকেরা এই শোষণের কোন ভাগ পেত না; তাই তারা এই বলে বিদ্রোহ শুরু করে যে ধর্ম যাজকেরাই খ্রিষ্টিয় আচার বিচার মেনে চলে না। তারা জনসাধারণকে এই বোঝায় যে, ভেবে দেখো জিশুখ্রিষ্ট ও তার অনুচরেরা কি ভাবে থাকতেন; আমাদেরও তাঁদের মত স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্য ও পবিত্রতার মধ্যে জীবন যাপন করতে হবে। মোটের উপর এই বিদ্রোহীদের আসল উদ্দেশ্য ছিল উচ্চপদস্থ যাজকদের সাধারণের কাছে ঘৃণিত করে তোলা কারণ, তারা নিজেরা অসন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু কৃষকেরা যখন খুব বেশি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তখন তারা তাদের শান্ত করতে প্রবৃত্ত হয়। যদি কৃষকেরা শান্ত ভাবে থাকতো এবং আর বেশিদূর অগ্রসর না হতো তা হ'লে জমির অধিকার নিশ্চিত ভাবে চার্চ থেকে পুঁজিপতি হাতে হস্তান্তরিত হতো। কৃষকদের শান্ত করার ভার নিয়ে এই নূতন শ্রেণী যেন ভগবানের ভারপ্রাপ্ত হয়েই এক নূতন ব্যবস্থার স্থাপনা করে, যাতে করে ভূমির স্বত্বাধিকার সামন্তপন্থী সম্ভ্রান্তদের হাতে থেকে বুর্জোয়াদের হাতে যাওয়া অনুমোদিত হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ক্রমওয়েলের পূর্বেও এই প্রক্রিয়া বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল। ইংলন্ডে বুর্জোয়া বিপ্লব অষ্টম হেনরীর আমলে শুরু হয়; তিনিই প্রথম চার্চের সম্পত্তি দখল করেন। ইংল্যান্ডের বুর্জোয়া শ্রেণীর এই প্রারম্ভ।

এই সব ঐতিহাসিক ঘটনা চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও অনেকে এই তর্ক করেন যে মধ্যে মধ্যে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হলেও শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে জোর জবরদস্তি করবার কোন প্রয়োজন নেই। এরা বলতে চান যে, শান্তি ও শৃঙ্খলার

মধ্যে দিয়ে শাসক শ্রেণীকে কেন ক্ষমতা চ্যুত করা হয় না ? এর উত্তর বিপ্লবের ইতিহাস থেকেই পাওয়া যায়। অত্যাচারী রাজা ও জমিদারকে কেন হত্যাকরা হয়? শুধু কোন লোককে হত্যা করবার জন্য আজ পর্যন্ত কোন বিপ্লব পরিকল্পিত হয় নি। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যে ইংল্যান্ডের রাজাকে শুধু অধিকারচ্যুত করা হয়, তার জন্য কোন ক্ষতি করা হয়নি। তিনি অনায়াসেই শান্তিতে বাস করতে পারতেন। কিন্তু তা' না করে তিনি গোপনে দেশ থেকে পালিয়ে যাবার মতলব করেন ও বাইরে থেকে দেশের উপর আক্রমণ চালাবার চেষ্টা করেন। এই কারণেই তাকে হত্যা করা হয়। তাকে যখন জাতীয় মহাসভায় হাজির করা হয় সেই সময় তুমুল বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বহু নিষ্ঠাবান সদস্য তার প্রাণদন্ডের বিপক্ষে ছিলেন কিন্তু অন্যান্য সকলে এই মত দেন যে রাজা একজন ব্যক্তি মাত্র নন, রাজা এক ব্যবস্থার প্রতীক এবং যতক্ষণ সেই প্রতীক বর্তমান থাকে ততক্ষণ তার চারিধারে প্রতিক্রিয়াশক্তির সমাবেশ হয়। যতদিন সেই রাজা বেঁচে থাকবেন ততদিন তাঁর কাজই হবে- প্রতিক্রিয়াশক্তির সমন্বয় করা এবং অন্যান্য দেশের সাহায্য নিয়ে ইংল্যান্ড আক্রমণের সুযোগ অন্বেষণ করা। তাই তাঁকে হত্যা করার প্রয়োজন হয়।

ঠিক এই রকম ঘটনা ঘটে ফরাসি বিপ্লবের সময় ফরাসিরা তাদের রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর তার প্রতি ইংরাজদের অপেক্ষা অনেক ভদ্র ব্যবহার করে। তারা তাকে নাগরিকের সম্মান দেয় এবং তিনিও ইচ্ছা করলেই নাগরিক হিসাবে ফরাসিদের প্রিয়ভাজন হয়ে বাস করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনিও পালিয়ে যেতে চাইলেন। প্যারীতে তাকে বন্দি করা হয় কারণ সীমান্তের বাহিরের অন্যান্য সাম্রাজ্যের সাহায্য নিয়ে তিনি ফরাসি বিপ্লবকে একেবারে বিনষ্ট করতে পারতেন। শরীরের কোন বিকৃত অংশ যখন সমস্ত শরীরকেই বিষাক্ত করে দিতে বসে তখন চিকিৎসা শাস্ত্রনুযায়ী সেই বিকৃত অংশে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। সামাজিক ক্ষেত্রেও ঠিক সেই নিয়ম। কোন বিশেষ সমাজব্যবস্থা যখন আর সমাজের কোন উন্নতি করে না বরং তাকে আরো দূষিত করে তোলে তখন বিপ্লবের প্রয়োজন হয় এবং অস্ত্রোপচারের মত বিপ্লবও কিছু কষ্ট দিয়ে থাকে।

ফুটন্ত জলের পাত্রের উপরে কোন ঢাকনা না থাকলে জল যেমন শান্ত ভাবেই ফুটতে থাকে, তেমনি নূতন শক্তির উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিবর্তন শান্তিতেই হতে পারে যদি কোন পুরাতন ব্যবস্থা তাকে বাধা না দেয়। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে সমাজ বিবর্তন খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কারণ পুরাতন ব্যবস্থা

বেশির ভাগ সময়েই নূতন ব্যবস্থাকে বাধা দিয়ে থাকে যদিও এই নূতন ব্যবস্থা সমাজের জনসাধারনের মঙ্গলের জন্যই হওয়া উচিত। বস্তুত বিপ্লবীশক্তি অনেকদিন থেকেই ধীরে ধীরে শান্তভাবে বাড়তে থাকে কিন্তু পুরাতন ব্যবস্থার মধ্যে তাদের এই বৃদ্ধি বেশি দিন সম্ভব হয় না। বিপ্লবের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে প্রতিবিপ্লবী শক্তিই প্রথম আঘাত দেয় ও দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু করে। বিপ্লবীশক্তি প্রথম প্রথম এই আঘাত সহ্য করে এবং ধীরে ধীরে বিপ্লবের সমর্থকদের সংঘবদ্ধ করতে থাকে— ফলে পুরাতন ব্যবস্থার সমর্থনকারীরা ভয় পায় ও ক্ষমতার জোরে নিজেদের অধিকার বজায় রাখবার চেষ্টা করে। প্রয়োজনীয় সামাজিক বিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া শক্তির জোরজবরদস্তিকে বাধা দেওয়াই অনেকের কাছে বিপ্লবীদের জুলুম বলে পরিচিত। ঘাতের প্রতিঘাত খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং বিপ্লবের জুলুমও খুব স্বাভাবিক।

বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের পরিস্থিতি বিচার করলেই এটা স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায়। দুর্ভাগ্যবশত নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইতিহাস অধ্যয়ন না করার ফলে, এবং ঘটনা গুলি সঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ না করায়, বিপ্লব সম্বন্ধে এত ভ্রান্তধারণা ও পক্ষপাতিত্বের সৃষ্টি হয়েছে। তাই বিপ্লবের ইতিহাস খুব ব্যাপক ভাবে পড়া উচিত।

আজ আমরা বিপ্লবের এক নূতন পর্যায়ে পৌঁছেছি। এই নূতন বিপ্লবের রূপ প্রকাশ পেয়েছে শ্রেণী দ্বন্দ্বের মধ্যে—শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে, অত্যাচারিত জনসাধারণ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে। এ ছাড়াও বর্তমান বিপ্লবের মধ্যে আর একটি দ্বন্দ্বের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে।

আধুনিক বিজ্ঞান বুর্জোয়া শ্রেণীরই সৃষ্টি। ইহা একটি মহা শক্তিশালী উপাদান। বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কারগুলি শুধু যে আমাদের জীবন যাত্রাতেই বিপ্লব ঘটিয়েছে তা নয় —আমাদের চিন্তাধারাও একেবারে বদলে দিয়েছে। তাই বিজ্ঞানের বিকাশই বিপ্লবের সবচেয়ে বড় অবদান। বিজ্ঞান মানুষকে অনন্ত উন্নতির ও সভ্যতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার শক্তি দিয়েছে। তবু আজও পৃথিবী দুঃখ দারিদ্র্যে পূর্ণ। সাধারণত একথা লোকে ভেবে দেখেনা যে আজ বিজ্ঞানের সাহায্যে পৃথিবীতে এত যন্ত্রশিল্পের আয়োজন হয়েছে যে, সেই যন্ত্রশিল্পগুলিকে পুরো কাজে লাগালে সমগ্র মানবজাতির যত কিছু প্রয়োজনীয় ও কাম্য বস্তু তা' সবই জোগান যেতে পারে এবং তার জন্য কোন লোককেই দৈনিক চার ঘন্টার বেশি কাজ করবার দরকার হয় না। কিন্তু মানুষকে আজও প্রকৃতপক্ষে দশ ঘন্টা বা পনের ঘন্টা দৈনিক খাটতে হচ্ছে এবং তা' সত্বেও দেখা যায় যে অনাহার,

অনশন, রোগ প্রভৃতি সমাজের স্বাভাবিক রীতি হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, সমাজের অনুন্নত অবস্থার এতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে না।

কেন এ রকম হয়েছে? মানুষের প্রতিভা ও সৃজন শক্তি আজ সভ্যতার এক শক্তিশালী উপাদান সৃষ্টি করেছে। ঠিক ভাবে বলতে গেলে আজ পৃথিবীকে নতুন করে গড়ে তোলার শক্তি মানুষের আছে। কিন্তু তবুও মানুষের পক্ষে ব্যাপক ভাবে সেই শক্তি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। শক্তি থাকা সত্বেও তাকে নিয়ন্ত্রণ করার অক্ষমতার জন্যেই আজ মানুষের এত দুঃখ, এত দারিদ্র্য। আর এই জন্যই বিপ্লবের প্রয়োজন। অনেকে শুধু শ্রমশক্তি ও শিল্প যন্ত্রের বিরোধ ও উপযুক্ত মজুরির কথাই বলেন যেন কতকগুলি স্বার্থপরের মতন বিপ্লবীরা মাত্র কয়েক আনা মজুরি লাভের জন্য ঝগড়া বিবাদ করছে।

কিন্তু প্রকৃত বিপ্লবী শুধু সামান্য মাহিনা বাড়ানোর জন্যই সংগ্রাম করে না—যারা বিপ্লবের বিরোধী তাদের মঙ্গলের জন্যও বিপ্লবীরা সংগ্রাম করে এবং তারজন্য সে মোটেই লজ্জা অনুভব করে না। কারণ এরাও সমাজেরই এক অংশ। তাই আজ বিপ্লবীরা সমগ্র মানব জাতির মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছে। আজ পৃথিবীতে এই বিপ্লবীরা সমগ্র মানব জাতির আধ্যাত্মিক মুক্তি এনে দেবে।

যদি এ যুগের বিপ্লবের প্রতিচ্ছবি এই হয়—তা হলে আজ প্রত্যেক সভ্য, শিক্ষিত ও প্রগতিশীল লোক, যাঁরা পৃথিবীতে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাঁদের নিজেদের বিপ্লবী বলে পরিচয় দিতে লজ্জিত বা ভীত হওয়া উচিত নয়। আজ বিচক্ষণ ব্যাক্তি মাত্রেই বিপ্লবী না হয়ে পারেন না। একমাত্র মূর্খ ও স্বার্থপরেরাই অর্থ ছাড়া অন্য কিছুর কথা ভাবতে পারেনা এবং নিজেদের বিপ্লবী বলতে ভয় পায়। শুধু কতকগুলি লোকের মঙ্গলের জন্যই আজ বিপ্লব ঘটবে না, সমগ্র মানব জাতির পূর্ণ বিকাশের জন্য আজ বিপ্লবের প্রয়োজন।

প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হয়ে এবং মহান বিপদের সম্মুখীন হয়ে সমস্ত রকম বিপদ অতিক্রম করবার ক্ষমতা এবং পুনর্গঠনের শক্তি মানুষের হয়েছে। যুগ যুগান্তর ধরে মানুষের সঞ্চিত শ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে এই বিরাট জয়লাভ সম্ভব হয়েছে। মানুষের এই প্রচেষ্টা আদিম সৃষ্টির থেকেই শুরু হয় এবং মানুষকে স্বাধীনতা ও উন্নতির পথে ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের মধ্যেও এই শক্তি আছে এবং এই শক্তিই সমস্ত জগতে বিপ্লব আনবে, তাই আজ আমরা সকলেই বিপ্লবী। কোন লোক তখনই মানব সভ্যতার অংশীদার বলে নিজেকে পরিচয় দিতে পারে, যখন সে জগৎকে নূতন করে গড়ে তোলবার ভার নিয়ে এগিয়ে

আসে এবং সেই গড়ে তোলবার প্রয়োজন অনুভব করে। অনন্ত উন্নতি ও স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করার জন্য আজ আমাদের এমন সাহস ও দৃঢ়তা অর্জন করতে হবে যা কেউ কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। বিপ্লবের ইতিহাস অধ্যয়ন করে আমাদের সেই অনুপ্রেরণা পেতে হবে।

৪

জাতীয়তাবাদের আদর্শ
(The Ideology of Orthodox Nationalism)

ভারতের দেশপ্রেমের প্রধান বৈশিষ্ট্য— পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষ। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শের এই বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সামাজিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে। ধর্মভাব এবং মানসিক পবিত্রতার জন্য হিন্দু মহাসভা বা আর্য সমাজের সভ্যদের মধ্যে এক বিরাট জাতি-বিদ্বেষের ভাব আছে—সনাতন পন্থীদের তো কথাই নাই। অন্যদিকে একদল উদারনৈতিক সমাজ-সংস্কারক আছেন—মত ও পেশা অনুযায়ী তাঁদের যে সামাজিক বিবর্তনের প্রতি অনুরাগ থাকা উচিত, তা' অস্বীকার করে তারা নিজেদের রাজনীতি ও আদর্শকেই শুধু ব্যর্থ করছেন।

যদি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রকৃত রাজনৈতিক রূপ বাস্তবে পরিণত হয় তাহলে ধনতান্ত্রিকতার বিকাশ বাধামুক্ত হ'বে এবং ভারতও পাশ্চাত্যের অনুকরণে সভ্যতার পথে অগ্রসর হবে। উদারনৈতিকতার আদর্শে এই জাতীয় মুক্তি সাধিত হলে উহা অবশ্যম্ভাবী; এবং নিঁখুত জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ এই আদর্শের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংশ্লিষ্ট। পুঁজিপতি স্বার্থের কবল থেকে মুক্ত হতে হলে ভারতের রাজনৈতিক আদর্শকে গোঁড়া জাতীয়তাবাদের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত করতে হবে। জাতীয় মুক্তির আদর্শকে শুধু সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক অভিলাষের গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে জনসাধারণের সামাজিক মুক্তি সাধনের সংগ্রামের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিফলিত করতে হবে। রাজনৈতিক ক্ষমতা শোষিত জনসাধারণের অধিকারে এলে তবেই ভারত ধনতন্ত্রের শোষনের কুফল থেকে মুক্ত হয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার এই বিরাট অবদান—ধনতন্ত্রের উত্তরাধিকারী হবে। একমাত্র তখনই সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি সূক্ষ্মদৃষ্টি দ্বারা ভারতের পুর্নগঠনের আদর্শ সমৃদ্ধশালী হবে। বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি বিচার করে দেখলে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি সমস্ত কটুবাদই অহেতুক মনে হয়;—*ঠিক যেমন চাঁদকে পাবার* জন্য এত চেষ্টা করা সত্বেও শুধু তার কলঙ্কের জন্য তাকে দোষ দেওয়া মূর্খতা।

কিছু না জেনে শুনেই কোন উদ্দেশ্য সাধনার্থে যে আন্দোলন তার নেতৃত্বের মননশীলতা সম্মান জনক তো নয়ই, উপরন্তু তা মানসিক নিকৃষ্টতার লক্ষণ।

প্রাচীন ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন যাঁরা খোলাখুলি সমর্থন করেন তাঁদের এবং আধুনিক উদার নৈতিকদের আত্ম-বিরোধী ভাব—এই দুই চরমপন্থীদের মাঝখানে গান্ধীবাদের উজ্জ্বল আদর্শপন্থী জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস ও তার সমর্থনকারীরা।

কংগ্রেসের মতবাদই সবথেকে বিশিষ্ট ও সর্ব-সমর্থিত। গান্ধীবাদের প্রত্যক্ষ অসঙ্গতি, মানসিক লম্ফঝম্প, অপ্রত্যাশিত বৈপরীত্য এবং বিরাট ভুল (যাকে সাধারণ ভাষায় বিষাদময় ছত্রভঙ্গতা বলা যেতে পারে)— সব সত্ত্বেও গান্ধীবাদই ভারতীয় জনসাধারণের রাজনীতি চেতনাসম্পন্ন ও অগ্রগামীদের (যদিও দূরদর্শী নয়) অধিকাংশেরই আদর্শ। এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার বিপরীত আদর্শ হিসাবেই গান্ধীবাদ পরিচিত।

যদিও গান্ধীপন্থীরা আজ আর ট্রেন বা মোটরগাড়ি এমনকি আধুনিক হাসপাতালকেও দানবীয় কল্পনা বলে অবজ্ঞা করেন না। প্রচারক নিজেই এখন তাঁর পূর্বতন পবিত্রতা অনেকখানি লঙ্ঘন করেছেন। গুজরাটি বস্ত্রব্যবসায়ী এবং আধুনিক ধনী শ্রেণীর সহিত নিবিড় সংযোগ, তাছাড়া ভারতীয় বণিক সমিতির সম্মান-সূচক সভ্যত্ব আধুনিক যন্ত্রশিল্পের প্রতি তাঁর বিদ্বেষকে দমিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। বিড়লা, বাজাজ প্রভৃতি কংগ্রেসের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ গান্ধী টুপি মাথায় দিতে পারেন কিন্তু এঁরা যে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ সত্যিকারের বাধা দেবেন না—তা সুনিশ্চিত। তবুও ভারতের গোঁড়া জাতীয়তাবাদ—গান্ধীবাদের শূন্যতায় প্রমত্ত হয়েও এক নতুন সভ্যতার প্রচারক বলে পরিচয় দেন। তার কারণ, এঁরা আজও জানেন না যে, এঁদের আদর্শ বাস্তবে পরিণত হলে কি দাঁড়াবে। কিন্তু এই সব লোকই খুব জোর গলায় বলেন যে ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সভ্যতার নকল করতে চায় না। এরা যদি বুঝতে পারতেন যে, যে বাঞ্ছিত লক্ষ্যের পিছনে এঁরা ছুটছেন সব সময়ে তারই প্রতিবাদ করছেন—তার চেয়ে হাস্যকর আর কিছু হতো না।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এই বিশ্বাস এতই যুক্তিহীন যে অনেক প্রগতিবাদীও আধুনিক সমাজের রীতিনীতির সমালোচনা করতে গেলে প্রথমেই পাশ্চাত্য সভ্যতার যে তাঁরা সমর্থক নন তা প্রচার করেন। এইসব উৎসাহ-বিহীন, মুখচোরা (লজ্জাশীল) সংস্কারকেরা পাখির মত তখনও পাশ্চাত্য সভ্যতার উদ্ধত প্রতিবাদ করেন যখন অন্যদিকে তারই সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রচলন

তাঁরা প্রচার করেন। যেমন এঁরা বলেন যে ইউরোপ ও আমেরিকার মত আমাদের মেয়েদের স্বাধীনতা পাওয়া উচিত কিন্তু মেয়েরা যেন ভারতীয় নারীত্বের আদর্শচ্যুত না হয়; পাশ্চাত্য দেশের মেয়েদের মত এরা যেন সেই স্বাধীনতার বদ্‌গুণ গুলিতে আসক্ত হয়ে না পড়ে। জাতিভেদ তুলে দাও কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের বিশৃঙ্খলতা থেকে সাবধান থাকতে হবে। ধনতন্ত্রকে উৎসাহিত কর কিন্তু পাশ্চাত্যের বস্তুবাদীয় লোভ সংবরণ করতে হবে। ধর্মাত্মক কুসংস্কার ত্যাগ করে যুক্তিবাদী জীবন যাপন কর, কিন্তু ব্যবহারমূলক বিজ্ঞানকেই একমাত্র জ্ঞানাধার হিসাবে গ্রহণ করনা যাঁরা অনিচ্ছার সঙ্গেও স্বীকার করেন যে, ভারতীয় সমাজে একটা কিছু গলদ আছে, তাঁদের এবং যাঁরা প্রচলিত ও প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতির নিবৃত্তির উপায় নির্দ্ধারনে আপারগ কিন্তু প্রগতিশীল—তাঁদের সকলেরই এই মত ও ধারণা। সহস্র বৎসরের মানব-সভ্যতার প্রতীক পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বর্জন করতেও এঁরা পারেন না, অথচ পুরাতনের সংস্রব ত্যাগ করে নতুনকে আলিঙ্গন করতেও এঁরা কুণ্ঠিত হন।

উন্নতি ও প্রতিক্রিয়ার সমন্বয়ের উপর এবং ভারতীয় সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক প্রতিভার ভিত্তিতে এঁদের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ ঘৃণিত পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রায়শ্চিত্তের পর পবিত্র ভারতে প্রবেশ করতে পারবে। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে পুরোপুরি বাতিল করা হচ্ছে না, কেবল ভারতের পবিত্রতার প্রভাবে আনা হচ্ছে। 'আধ্যাত্মিক সমাজতন্ত্রে'র এই সব মুখপাত্রেরা নিজেরাই জানেন না যে তাঁরা কি বলেন বা কি চান। তাঁরা এক ভুয়ো-পান্ডিত্যে এই সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। কিন্তু দুইটি বিভিন্ন যুগের ঐতিহ্যের সংস্কৃতির ও চিন্তাধারার এই সমন্বয় অসম্ভব।

দার্শনিক মতে কোন পদার্থ যা পূর্বে প্রত্যক্ষ বিদ্যমান ছিল তার বিপরীত ভাবাপন্ন এক নতুন পদার্থের সৃষ্টিই হচ্ছে সমন্বয়। রসায়ন শাস্ত্রে—বিভিন্ন উপাদান একত্র মিশ্রিত হলে সংমিশ্রণ বলে। এই সংমিশ্রিত বস্তু পূর্বেকার উপাদানগুলির থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক এক নতুন জিনিস। পাশ্চাত্য সভ্যতার অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সমাজের বিভিন্ন দ্বন্দ-মূলক উপাদান গুলির সংমিশ্রণের ফলে যে সভ্যতা তা' ধনতন্ত্রের ভিত্তিতেই গড়ে উঠবে। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রত্যক্ষ উপাদানগুলি আরো নতুন সভ্যতার সৃষ্টি করবে; কিন্তু ভারতীয় পন্ডিতেরা যে সমন্বয়ের কথা বলেন তা একেবারে ইহার বিপরীত। তাঁরা বলেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতার 'ভাল' জিনিসগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের জাতীয় সংস্কৃতি খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

মানব সভ্যতার উন্নতির আধার হিসাবে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার দুইটি উপাদান

ভাল বলা যায়। একটি হচ্ছে ধ্বংসাত্মক;—মধ্যযুগের সামন্ত প্রথা এবং তৎসংলগ্ন ধর্মাত্মক ভাবকে ধ্বংস করে এবং তাকে সমূলে উচ্ছেদ করে ধনতন্ত্র সমাজের একটি উপকার করেছে। ধনতন্ত্রের দ্বিতীয় অবদান হচ্ছে—সংস্কার মূলক। যন্ত্রশিল্পকে উন্নত করে ধনতন্ত্র মানবসমাজের অধিকতর উন্নতির পথ উন্মুক্ত করে দেয়। ধনতন্ত্রের ধ্বংসাত্মক ভাবকে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়ান যাবেনা; কারণ যে সামাজিক ভিত্তির উপর তা' প্রতিষ্ঠিত ইউরোপে দুইশত বৎসর পূর্বে সেই সমাজ ব্যবস্থাকে বিধ্বংস করা হয়। সুতরাং ইহা অত্যন্ত সন্দেহ জনক যে ভারতীয় সমাজ প্রবর্তকেরা পাশ্চাত্য সভ্যতার এই অবদানটি গ্রহন করবেন। কারণ; পাশ্চাত্য সভ্যতার এই দ্বিতীয় অবদানটি মেনে নেওয়া মানেই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে পুরোপুরি আহ্বান করা; এবং তাহলে সমন্বয়ের কোন কথাই আর উঠতে পারে না।

যাঁরা ধনতন্ত্রের এই ধ্বংসাত্মক ভাবটির ঐতিহ্যের যথোচিত মর্যাদা দিতে না পারেন, তাঁরা এই সংস্কারমূলক অবদানের প্রত্যক্ষ পরিমাণকেও সাদরে গ্রহণ করতে পারবেন না। কিন্তু এই সংস্কারমূলক অবদানই ভারতের ভবিষ্যত উন্নতির প্রতীক এবং একে প্রাচীন যুগের গৌরবময় দিনের পানে আশাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যাবে না।

ধ্বংসোন্মুখ ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রকৃত বদগুণগুলির বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয়তাবাদীরা প্রতিবাদ করেন না। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা ইহার প্রকৃত গুণগুলিই পরিত্যাগ করেন। মানুষকে চিরন্তন আধ্যাত্মিক বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য বিজ্ঞানের বিরাট উন্নতিই হচ্ছে— ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রত্যক্ষ অবদান।

ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রকৃত দোষ এই যে, মানুষের আধ্যাত্মিক মুক্তির ও সামাজিক উন্নতির সুযোগ সুবিধা করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা তার প্রকৃত আত্মোন্নতির পথে সুব্যবস্থিত এবং অবিচলিত বাধার সৃষ্টি করছে। ঠিক যখন বিজ্ঞানের বিজয়ভিযান অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন যুগের স্মৃতিচিহ্নগুলি ধ্বংস করে দিচ্ছিল তখন ধর্মের আধুনিক রূপ ভুয়ো দর্শন ও যতকিছু কাল্পনিক দুর্জ্ঞেয় ভাব ও চিন্তাধারাকে আবার জাগিয়ে তুলে ধনতান্ত্রিক সমাজ আত্মোন্নতির পথে এই বাধা সৃষ্টি করে। তবুও আশ্চর্যের বিষয়, ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা বস্তুবাদকেই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রধানতম দোষ বলে মনে করেন।

বাস্তবিকপক্ষে, ব্যাপারটা ঠিক বিপরীত। বস্তুবাদী দশর্নকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা যাঁরা আমাদেরা ভাবী শাসকবৃন্দ—ঠিক পাশ্চাত্যের শাসকশ্রেণীর

মতই জুজুর মত ভয় করেন। কারণ, মানবজাতির আধ্যাত্মিক মুক্তির পথে বস্তুবাদী দর্শন এক মহান অবলম্বন। পুরাকালে মহান চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সাহায্যে (সেই অগ্রগামী কার্যে ভারতেরও গৌরবময় অংশ ছিল) যে উপাদান তৈরি হয়—ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে তা' আরও সার্থক হয়েছে। সুতরাং, স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রত্যেক সৈনিক এবং উন্নতিশীল ব্যক্তিমাত্রেই মানব ইতিহাসের এই উজ্জ্বল ঐতিহ্য—পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা দান করা উচিত। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের ন্যায় মানবসভ্যতার সেই বিরাট অবদানকে পুরাকালের সংস্কৃতির মাপে ছোট করা অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শের প্রিয় সঙ্কেতবাণী হচ্ছে—''পাশ্চাত্য সভ্যতা—বস্তুবাদী এবং প্রাচ্য সংস্কৃতি অধ্যাত্মবাদী''। যদিও সকলেই এক ঘেঁয়ে ভাবে এই সুরে সুর মিলিয়ে যাচ্ছে, তবুও ইহার সত্যতা প্রমাণ করবার কষ্ট স্বীকার করতে কেহ রাজী নয়। জোর গলায় একই ভাবে ইহার সত্যতা প্রমাণ করবার চেষ্টায় ইহা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে এবং মনে হয় যেন ইহা স্বতঃ সিদ্ধ। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ প্রতিভা বলে যা' ঘোষণা করা হয় প্রকৃতপক্ষে তা' বিশেষ কিছুই নয়। অধ্যাত্মবাদ, অর্থাৎ ধর্মাত্মক চিন্তাধারা, প্রত্যেক দেশেই সামাজিক বিবর্তনের এক বিশেষ মুহুর্তে মানুষের আদর্শ হয়ে উঠেছে। মানুষের চিন্তাধারা পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে; সুতরাং কোন বিশেষ চিন্তাধারাই কোন এক জাতির চিরন্তন এবং অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।

পাশ্চাত্য জাতিরা যে ধর্মাত্মক আদর্শ ও চিন্তাধারাকে অনেক পিছনে ফেলে এসে আজ তাকে সংস্কার করে আরো উন্নত এক আদর্শকে গ্রহণ করেছে, আজ যদি ভারত সেই ধর্মাত্মক চিন্তাধারার প্রতি আসক্ত হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ এই নয় যে, পাশ্চাত্য জাতির নৈতিক অবনতির জন্য তারা ধর্মের আদর্শের উচ্চ সোপানে উঠতে পারেনি।

ইহা শুধু এই প্রমাণ করে যে, সভ্যতার বিকাশে ওই সব জাতি অন্ধবিশ্বাস ও ভাবপ্রবণ অলীক স্বপ্ন না দেখে যুক্তি এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান দিয়ে চিন্তা করতে শিখেছে। ইহা আরও প্রমাণ করে যে, জীবন যাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আদর্শেও এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। ভারতে সেই সব পরিবর্তন ঘটেনি, তাই ভারত এখনও সেই প্রাচীন চিন্তাধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে। তা না হলে ভারতবাসীরাও আজ পাশ্চাত্য জাতির মত চিন্তা করত। প্রকৃতপক্ষে তিনশ বৎসর পূর্বে তারা তাই করত।

গত দু'শ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে পাশ্চাত্য জাতিদের জীবনে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে তা' তাদের এবং ভারতবাসীর আদর্শের মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য এনে দিয়েছে। আজ যদি ভারতবর্ষেও সেই পরিবর্তন সাধিত হয় তাহলে অল্প সময়ের মধ্যেই সেই পার্থক্য আর থাকবে না।

অধিকাংশ ভারতীয় জাতীয়তাবাদীই বলে ওঠেন 'আমরা ঠিক উহাই এড়িয়ে যেতে চাই এবং এতে করে তাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতির উচ্চতা প্রমাণ করেছেন এই বিশ্বাসে সন্তুষ্ট থাকেন। অন্তর্হিত আধ্যাত্মিক (আত্মিক) প্রবৃত্তির থেকেই কি এই আশার সঞ্চার হয়নি? যদি ভারতবাসী স্বভাবতই অধ্যাত্মভাবী না হতো, তাহলে কি করে তারা পাশ্চাত্যের বহির্মুখী লোকেদের মত লোভ ও পার্থিব জাঁক জমকের প্রতি আকর্ষণ রোধ করতে পারত? কিন্তু প্রশ্নটা অন্য ভাবেও করা চলে, যে ভারতবাসীর কি নিজেদের অপছন্দতার জন্য এই পথে যায়নি এবং তারা কি এখনও সেই লোভসংবরণ করবার চেষ্টা করছেন? ভারতের ঐতিহ্য এবং বর্তমান বাস্তব অবস্থার উপর এতটুকু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে তা ঠিক নয়। ঠিক যেমন হতাশান্বিত শৃগাল ''আঙ্গুর ফল টক' বলে তার প্রতি ঔদাসিন্যের ভাব করে ঠিক সেই রকম এঁরাও নিজেদের হাস্যস্পদ করে তোলেন। যে জাত আজ তার নবজন্মের পথে, নূতন সভ্যতার পথে, এগিয়ে চলেছে সেই জাতের আদর্শে এই রকম ক্ষতিকর আত্মভ্রম থাকা উচিত নয়।

ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য জাতির পথে চলতে চায় না—এই উক্তির মধ্যে দুটি বিশেষ স্বীকৃতি আছে। প্রথম হচ্ছে এই যে, যদি ভারতবাসীর জীবন যাত্রায় সেই পরিবর্তন আসে তাহলে তারাও ঠিক পাশ্চাত্যের অধিবাসীদের মত একই রকম চিন্তা করবে। এই স্বীকারোক্তি ভারতের অন্তর্জাত অধ্যাত্মবাদের সিদ্ধান্তকে সমূলে বিনাশ করে। ইহার দ্বারা এই মেনে নেওয়া হয় যে, অন্য উপায় না থাকাতে অর্থাৎ কোনরূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন না হওয়ার দরুণই ভারতবর্ষে ধর্মাত্মক ভাবের প্রভাব বর্তমান আছে। দ্বিতীয় স্বীকারোক্তি হচ্ছে—ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নিতান্ত ঠুন্‌কো। ইহা নিজের কর্তব্যে নিজেই বিশ্বাস করেনা। কিন্তু জাতীয় আন্দোলন ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রাম—এই দুই থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে ভারতবাসীরাও ঠিক অন্যান্য জাতির মত জীবন যাপন সম্বন্ধে সচেতন।

রাজনৈতিক স্বাধীনতাই ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য জাতির দুশো বৎসরের সভ্যতা ও উন্নতির সঙ্গে সমান স্তরে উঠতে সমর্থ করবে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এই ঐতিহাসিক তাৎপর্যই তার প্রচলিত আদর্শকে অগ্রাহ্য করে।

যদি বিশ্বাস করা যায় যে, ভারতবাসী অন্য দেশের লোকের চেয়ে আত্মোন্নত, এবং এই উচ্চতা ভারতের অন্তর্জাত, তাহলে ভারতবাসীর পক্ষে জীবনের অন্যান্য উপাদান সম্বন্ধে এত উদ্বিগ্ন হওয়া অত্যন্ত করুণ এবং আশ্চর্যের বিষয় নয় কি ? যদি আন্তর্জাতিই হয় তাহলে সেই আধ্যাত্মিক প্রতিভা বিনষ্ট হওয়া উচিত নয় বা ইহলৌকিক জীবনের ভাগ্য বিপর্যয়েও নষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত নয়। সুতরাং ভারতের জাতীয়তাবাদের আদর্শই ভ্রান্ত; রাজনৈতিক স্বাধীনতার ইচ্ছা অধ্যাত্মভাব থেকে স্খলিত। রাজনৈতিক দাসত্ব এবং বিপর্যয় থেকে মুক্তির সংগ্রামই আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ হওয়া উচিত। তা' না হলে শুধু বোঝায় যে, ভারতের জাতীয়তাবাদ ভুয়ো ও এই জাতীয়তাবাদ এক বিরাট ধোঁকা।

তাছাড়া ইতিহাসের প্রাচীন যুগে, অর্থাৎ রূপ কথার যুগে, ফিরে যাওয়া দুমুখো অস্ত্রের কাজ করে। ইহা দুই দিকেই ব্যবহার করা চলে। পাশ্চাত্য দেশও তার 'জনক' প্রভৃতি নিয়ে গর্ব করতে পারে এবং সেখানে এখনও এই রকম বড় বড় লোক আছে যাঁরা বস্তুবাদী সভ্যতায় আধ্যাত্মিক রূপ দান করেছেন। ভাল কাজে ব্যয় করবার জন্য যদি অর্থ সঞ্চয় সমর্থন করা যায়, তাহলে রকফেলারকে আমরা বস্তুবাদী বলে কি করে অপবাদ দিতে পারি? এঁরাও কি হাজার হাজার অসভ্য ও বিধর্মীদের রক্ষা করা ইত্যাদি ধর্মার্থিক কাজে বহু অর্থ ব্যয় করেন না ? কার্ণেগীর মত লোকেরা কি পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য বিরাট অংশ গ্রহণ করেন নি? এই ভাবে দেখলে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সমস্ত ধনীদেরই অধ্যাত্মবাদের দলভুক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু এঁদেরই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতীক হিসাবে ঘৃণা করা হয়।

এই সব ঘটনাবলীর প্রতি অপক্ষপাত দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, স্থান কাল পাত্র নির্বিশেষে সব জাতির মধ্যেই এক মূলগত সাদৃশ্য আছে। উপর উপর যেটুকু বিসদৃশ দেখা যায় তা শুধু বাহিরের প্রকাশে। ভারতের জনসাধারণের বেশির ভাগই জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পার্থিব বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট এবং এই পার্থিব বস্তুর আকাঙ্খা অর্ন্তজাত— নিজেদের বেঁচে থাকবার প্রয়োজনে—আমোদ প্রমোদের জন্য নয়। শুধু আজকের ব্যাপার নয় চিরকাল ধরেই ইহা চলে আসছে এবং প্রত্যেক জাতিরই সংস্কৃতি তার বেশিরভাগ জনসাধারণের জীবন যাপনের দিক থেকে বিচার করতে হবে। বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কয়েকজন বড় বড় কথা ও উপদেশ থেকে সাধারণ লোকের সংস্কৃতি বোঝা যায় না। এই সব প্রতিভাশালী লোকেরাও ব্যবহারিক জীবনে তাঁদের আদর্শের ভুয়ো কাল্পনিক অবস্থা থেকে

নেমে আসেন। ভারতীয় বুদ্ধিজীবিদের বেশির ভাগই ভারতের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব খুব বেশি বিশ্বাস করেন। তাঁরা 'আর্য' জীবনের আবেগময় সমর্থক। এঁরা যুক্তিতর্কের কতকগুলি বিচিত্র ও সন্দেহজনক প্রণালীতে মুগ্ধ হন এবং মনে করেন যে, ত্যাগ, আন্তরিকতা, মানসিক পবিত্রতা প্রভৃতি মহৎগুণ গুলি ভারতেরই একচেটিয়া। পৃথিবীর সমস্ত নিপীড়িত জনতাকে বস্তুবাদের পাপ থেকে ভারত রক্ষা করবে এবং তাঁরা এই ব্রতে ব্রতী হবেন, এই দিবাস্বপ্নেই তাঁরা মোহিত। এই সব শুনতে এত ভাল লাগে যে, জোর গলায় নিশ্চিতের সুরে বললে খুবই চমকপ্রদ হয়ে ওঠে। কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা যে আদর্শের প্রতি ধাবিত হচ্ছেন, তার প্রকৃত রূপ কি? প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য শিক্ষা না করে শিক্ষিত সাজবার জন্য—শুধু বাজার দরের জন্য এবং পার্থিব সুখসুবিধা লাভের আশায় ছাপ নেওয়াই উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী যুব সম্প্রদায় কি অন্য কোন আদর্শের পিছনে ধাবিত হয়?

যদি জীবন ধারণের পার্থিব উপাদান গুলির প্রতি আগ্রহই বস্তুবাদ হয় তাহলে এই জীবধর্ম পালন করার জন্য পাশ্চাত্য দেশবাসীদের ভারতবাসীদের অপেক্ষা অধিক দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। কোন বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন লোকই একথা অস্বীকার করতে পারেন না যে, প্রত্যেক জীবেরই মৌলিক বৃত্তি হচ্ছে বেঁচে থাকা এবং নতুন জীবের সৃষ্টি করা। মানুষ সাধারণতই এগুলি সবথেকে সুবিধা জনক অবস্থার মধ্যে সম্পন্ন করতে চায়। মানুষের সঙ্গে অন্যান্য জীবের এইখানেই প্রভেদ যে, মানুষ সেই সব অবস্থাকে নিজেদের সুবিধামত এবং উন্নত করতে পারে যা অন্য জীব জন্তুরা পারে না। জীবের প্রকৃতিই হচ্ছে আরাম খোঁজা। একথা যে অস্বীকার করবে সে এই অসম্ভব প্রমাণ করতে উদ্যত হবে যে আদর্শ মানুষ হচ্ছে গুহাবাসী।

কিন্তু আসলে বস্তুবাদের বিরোধীরা অধ্যাত্মবাদকে এতটা অসম্ভব পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে চান না, যদিও যুক্তি দিয়ে বিচার করে করে দেখলে তাই হয়। কারণ এর কোন সীমারেখা কেউ ধার্য করতে পারেনি। যখন একবার জীবের বেঁচে থাকবার আবশ্যকতা মেনে নেওয়া হয় তখন আর সেই প্রয়োজনের কোন সীমা থাকতে পারে না। কিন্তু এত বুজরুকি সত্বেও আমাদের শাস্ত্রেই পাওয়া যায় যে, বেঁচে থাকার, সৃষ্টি করার, এবং পার্থিব বস্তুর আশা আকাঙ্খা নিয়ে যে বস্তুবাদ, তা ভারতীয় সংস্কৃতির ও আদর্শের বিপরীত হয়। ভারতীয় শাস্ত্রানুযায়ী মানব জীবনের উদ্দেশ্য চতুর্মুখী ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। যদিও ধর্ম এবং মোক্ষের

পবিত্রতার মধ্যে অর্থ ও কামের প্রকৃত উদ্দেশ্য লোপ পায় না। একথা অবশ্যই সত্য যে আমাদের শাস্ত্রেই (পুরাণ গ্রন্থে) শুধু অর্থ ও পদার্থিক সুখ সুবিধার সংগ্রহই নয়—এমন কি তা'র উপভোগও অনুমোদিত আছে। ধর্ম ও মোক্ষের মতই এদেরও জীবনের উদ্দেশ্য হিসাবে মর্যাদা করা হয়। সকল প্রকার আমোদ উপভোগই কামের বিস্তৃত ব্যাখ্যার মধ্যেই সকলে ব্যাখ্যা করেছেন।

মহাভারতেই ধর্ম সম্বন্ধে সব থেকে ব্যাপক ও উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা আছে। এই মহাকাব্যেরই শেষ পংক্তি হচ্ছে ঃ- ধর্ম থেকেই অর্থ ও কামের উৎপত্তি। এবং এই সঙ্কেতপূর্ণ উক্তি মহামুনি ব্যাসের মুখ থেকেই প্রকাশ হয়েছে। প্রাচীন ভারতের এই পূণ্য স্মৃতিকারের ভগবৎ অনুপ্রেরণাই ছিল মহাভারতের ধর্মাত্মক রীতিনীতির অনুমোদন। সেখানে এই বিধান দেওয়া হয়েছে যে, ধর্মপ্রবণ হও তাহলেই তুমি পৃথিবীর সর্বপ্রকার সুখ ও আনন্দ ভোগ করতে পারবে। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের মধ্যেও এখানে বস্তুবাদের মৌলিক ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পায়। সব থেকে লক্ষ্যনীয় বস্তু হচ্ছে এই যে, এই মহান উক্তির সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত হতাশার সুরও রয়েছে; তা' এই যে, "কিন্তু কেউ আমার কথা শুনছে না।" ভারতের ইতিহাসের সমৃদ্ধির যুগেও অর্থ এবং কাম, ধর্ম দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল না। মনে হয়, তৎকালীন 'বস্তুতন্ত্র' এই পবিত্রমনা স্মৃতিকারকে অত্যন্ত উত্যক্ত করে তুলেছিল।

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তাদের যৌন বোধ এবং যৌনভাব। কিন্তু এক্ষেত্রেও বর্তমান আচার ব্যবহার বা অতীতের তত্ত্ব থেকে ভারতের পবিত্রতা প্রমাণ করা যায় না। প্রকৃত পক্ষে, কোন দেশেরই প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় সাহিত্য ভারতের মত এত কামভাবে পূর্ণ নয়। মধ্যযুগের বৈষ্ণব ধর্ম এবং পুরা কালের ভগবৎ ধর্ম ছাড়াও, ব্রাহ্মণ সূত্রেও পাওয়া যায় যে, "যৌনভাব শৈশব কালেই জন্মায় এবং পূর্ণ বয়সে তার পূর্ণ প্রকাশ হয়। সুতরাং.............."। বাকিটা পূরণ করাও বিশেষ শক্ত হবে না। ইহা নিশ্চয়ই এই যে, যৌনবোধ অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং প্রকৃতিজাত; উপভোগ করবার জন্যেই ইহার সৃষ্টি এবং ধর্মও তাহা অনুমোদন করে। ভাগবৎ গীতাতে ও আছে যে, ভগবান সর্বজীবে বৈধ কামরূপে প্রভাব বিস্তার করেন। বৈধ অর্থে ধর্মের অনুমোদন বুঝাইতেছে। কিন্তু এইরূপ অত্যুত্তম ও অকপট ব্যাখ্যা সত্ত্বেও ভারতের ইতিহাসের সেই স্বর্ণ যুগেও জীবনের অন্যান্য আদর্শ ধর্মকে ছাপিয়ে গিয়েছিল।

মহাভারতের শেষ অধ্যায়ে ব্যাস প্রকাশ করেন যে, ধর্মকে একেবারে অবজ্ঞা করা হয়। ধর্ম বলতে সামাজিক রীতিনীতি বুঝায় এবং মানব বিকাশের অনুন্নত

অবস্থায় এই রীতি নীতিই ধর্ম রূপে প্রচলিত হয়। দৈব ও ভগবৎ অনুমোদনের উপরই তা প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেকেরই যৌন উত্তেজনা সন্তুষ্ট করা, বাস্তব জীবনের আনন্দ উপভোগ করা এবং পার্থিব সামগ্রীর প্রয়োজন; কিন্তু এ সবই প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার নিয়ম কানুন মেনে করতে হবে।

প্রশ্ন হচ্ছে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদীয় জীবন কি ওই আদর্শ অপেক্ষা হীন? এ বিষয়ে অজ্ঞ, বদ্ধ পাগল ছাড়া কেউ একথা স্বীকার করবে না। চুরি ডাকাতি করে অন্ন উপার্জন করা এবং গুহা বাসীদের মত সঙ্গীকে জয় করার প্রথা আজ ভারতেও যেমন প্রচলিত নেই পাশ্চাত্য দেশেও তেমনি তার আর প্রচলন নেই। আজ ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীরাও ভারতবাসীদের মতই ধর্মভাবেই অর্থ ও কাম উপভোগ করে থাকে। এবং তাদের এই উপভোগের ন্যায্য সীমার মধ্যেও মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। হিন্দু সংহিতা রূপেই হোক বা সাধারণের মেনে নেওয়া নৈতিক বা সামাজিক রীতিনীতি রূপেই হোক, এইসমস্ত নির্দেশই মূসার রচিত দশ উপদেশের মধ্যে প্রকাশ পেতে পারে।

চতুর্থ বিষয় অর্থাৎ মোক্ষ। এক্ষেত্রেও ইউরোপ ও আমেরিকার লোকেরা খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী এবং ভারতবাসীদের মতই তারাও তাদের ধর্ম বিশ্বাসে পবিত্র। ইহা বলা অত্যন্ত অসঙ্গত যে, সাধারণ পাশ্চাত্য দেশবাসী তার ধর্ম বিশ্বাসে ভন্ড এবং ভারতবাসী খাঁটি। এই অদ্ভুত কথায় কোন সত্যতা না থাকলেও ইহা প্রায়ই খোলাখুলি ভাবে বলা হয়। আত্মার মুক্তি খ্রিষ্ট ধর্মের ও মূল কথা। ইউরোপ ও আমেরিকার লোকেরা তাদের অধিকতর শিক্ষার ফলে সাধারণ ভারতবাসীর চেয়ে বুদ্ধি ও বিবেচনার সহিত নিজেদের ধর্ম মেনে চলতে পারে। সাধারণ ভারতবাসীর কাছে ধর্ম কেবল কতকগুলি কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের সমষ্টি। ভারতবাসীর কাছে ধর্ম থেকে আজ মোক্ষ লোপ পেয়েছে। আজ তাদের শুধু বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতেই জীবন কেটে যায় আর তার মধ্যে কেবল কাম তার অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে মাঝে মাঝে দেখা দেয়। প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থার শৃঙ্খলস্বরূপ জাতিভেদ এবং তার সঙ্গে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের আইন কানুন ধর্মের স্থান অধিকার করেছে। এবং মানব জীবনের দুটি মূল উদ্দেশ্যর পথ বন্ধ করেছে।

আধ্যাত্মবাদের অধিকতর যুক্তিসঙ্গত পান্ডারা এসবের এই উত্তর দেন 'স্বীকার করা গেল যে উপরোক্ত বর্ণনাই বাস্তবতার প্রকৃতপ্রতিচ্ছবি, কিন্তু তাতে শুধু এই প্রমাণ হয় যে আমাদের সংস্কৃতির কিছুটা অধঃপতন হয়েছে; আমাদের জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই অধোগতিকে রোধ করে—আমাদের

আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিকে পৃথিবীতে আদর্শ করে তোলা। আজকের সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না তাই ভারতীয় সংস্কৃতির উচ্চতর আধ্যাত্মিকতার প্রমাণ সেই অতীতে খুঁজে বেড়াতে হচ্ছে—যখন ধর্ম পাশ্চাত্য বস্তুবাদের প্রভাবে অধঃপতিত হয় নি, মোক্ষই যখন জীবনের চরম লক্ষ্য ছিল এবং অর্থ ও কাম হিন্দুদের জীবনে খুব নিম্ন স্থান অধিকার করেছিল। ইহাই হচ্ছে তর্কের বিষয়। ইতিহাস বিচার করলে অবশ্যই দেখা যায় যে, ইহা সত্য নয়। এমন কি যে সব গল্পকথাকে ইতিহাস বলে পরিচয় দেওয়া হয় তার দ্বারাও ইহার প্রমাণ হয় না। ভারতের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য হচ্ছে গো-মাংস ভোজী সোমরসপায়ী ব্রাহ্মণদের বৈদিক যুগ। পুরাণাদিতে আমরা সব রাজ প্রাসাদের বিবরণ পাই যে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে জাঁকজমক, আমোদ প্রমোদ ও বৃথা গর্বের প্রতিযোগীতা করছে। তা থেকে এই প্রমাণ হয় যে, যখন ধর্ম ছিল নিষ্কলঙ্ক এবং মোক্ষ ছিল জীবনের লক্ষ্য তখনও অর্থ ও কাম অবজ্ঞা হত না। তাদের উপভোগ করা তো হতই বরং পূজাও করা হত। এবং পূজার প্রকৃত অর্থই এই যে, আমরা যা উপভোগ করি তাই পূজা করি। ভারতের সেই স্বর্ণযুগের ধর্মের উচ্চতম রূপ মহাভারতের শান্তি পর্বে পাওয়া যায়। সেখানেই দেখা যায় যে, তখনকার ব্রাহ্মণদের পার্থিব সামগ্রী সঞ্চয়ে কত বেশি আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল।

আর যদি কতকগুলি লোকের কথাই সমস্ত জাতির লক্ষ্য হিসাবে ধরা হয় তাহলে ইউরোপ এবং বিশেষ করে আমেরিকারই আধ্যাত্মিকতায় শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করা উচিত, কারণ তাদের পুরোহিত সেনা আজ বহু দেশেই উচ্চস্বরে খ্রিষ্টধর্মের গুণাবলী প্রচার করছে। আর্য আদর্শের চেয়ে খ্রিষ্ট রীতিনীতি কোন অংশেই হীন নয়। একথা বলা অত্যন্ত ভুল যে, ভগবান, আত্মা, এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক উপাদানগুলির উপলব্ধি ভারতীয় ভাষায় এবং ভারতীয় শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হলেই তার আত্মসংশোধক উপাদানগুলি মহত্তর হয়ে ওঠে। আধ্যাত্মবাদের পক্ষে ইহা প্রমাণ করা আরও ক্ষতিকর এবং অযৌক্তিক হবে যে, খ্রিষ্ট ধর্ম বস্তুবাদ দ্বারা দূষিত হয়েছে আর এত অধঃপতন সত্ত্বেও ভারতবর্ষের ভাবৎধারণাগুলি বিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়ে আছে। যদি আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবলীর প্রচলিত অর্থ সত্য হয়, তাহলে সর্বত্র সব অবস্থার মধ্যেই তার অবিনশ্বর থাকা উচিত। কিন্তু দেখা যায় যে, বিশেষ অবস্থার মধ্যে বা বিভিন্ন স্থানে এগুলি শক্তিহীন হয়ে পড়ে; তাতে করে ইহার নিত্যতাই অপ্রমাণিত হয় এবং এই প্রমাণ হয় যে, বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তারা বিশেষ ভাবেই প্রকাশ পায়।

খ্রিষ্টিয় জগতে এই মহান আধ্যাত্মিক তত্ব প্রত্যহ বিবৃত করা হয় যে, — "যদি কোন লোক তার আত্মাই নষ্ট করে ফেলে তাহলে সমস্ত পৃথিবী লাভ করলেও তার প্রকৃত কোন লাভ হয় না"। বস্তুত খ্রিষ্ট ধর্মের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির আধ্যাত্মিকতার যত কিছু বিশ্বাসের উপাদান, যতকিছু কল্পনা-প্রসূত দর্শন ও নৈতিক আদর্শ—সব কিছুরই প্রমাণ পাওয়া যায়। যিশুখ্রিষ্ট বলেছেনঃ "তোমাদের অন্তরেই ঈশ্বর বিরাজ করেন"। ইহার অর্থ এই যে, আত্মার উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই মানুষের মুক্তির একমাত্র উপায়। হিন্দুর আত্মদর্শনের আদর্শের সঙ্গে ইহার কোন পার্থক্য নাই। সন্ত পল তাঁর শ্রোতৃমন্ডলীকে বলেছিলেন "তোমরা কি এতই মুর্খ ? অন্তরাত্মায় সৃষ্টি হয়ে তোমরা অস্থিতে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হতে চাও।" খ্রিষ্টিয় চার্চের পান্ডাদের মধ্যেও দেখা যায় নিসিয়া অধিবাসী গ্রেগারি প্রচার করেন "মানুষের আত্মাই হচ্ছে ঈশ্বর"। এবং শ্রেষ্ঠতম খ্রিষ্ট ধর্মজ্ঞ টমাস্ একুইনাস্ও বলেন "আমাদের অন্তরের মধ্যে যে প্রতিভা বিরাজমান, অজানা আলোকের মত চিরন্তন যুক্তি তর্কের সঙ্গে তার বহু সাদৃশ্য আছে"।

খ্রিষ্ট ধর্মের ভগবৎভাব সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হওয়ার বা সে সম্বন্ধে কুৎসা রটানর কোন অর্থ হয় না। এ বিষয়ে ভারতবাসীর সম্বন্ধেও ঠিক এই সব কথা বলা চলে। আর্য সংস্কৃতির প্রবর্তক ব্রাহ্মণদেরও ভগবৎভাব খুব সন্দেহ জনক। আধুনিক স্বামীজিরা খ্রিষ্ট ধর্মজ্ঞদের চেয়ে কোন অংশেই শ্রেয় নন। একমাত্র অন্ধ কুসংস্কার এবং দুর্বল ও উৎকৃষ্ট দেশপ্রেমই ইউরোপ ও আমেরিকার খ্রিষ্টিয় সমাজকে ভারতের জনসাধারণ অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতার নিকৃষ্ট পর্যায়ভুক্ত করতে পারে। কিন্তু ওদের তবু একটা মত ও বিশ্বাস আছে—ভারতবাসীরা শুধু কুসংস্কারে পূর্ণ। বেদান্তের দুর্জ্ঞেয় সূত্রগুলি বা গীতা পাঠ করলেই তার ধর্মভাব নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে যাবে, আর খ্রিষ্টিয় যাজকেরা যিশুখ্রিষ্টের ধর্মবানী পাঠ করলে তার আন্তরিকতা সন্দেহ জনক হবে—এর কোন মানে হয় না।

অনেকে আবার বস্তুবাদ ও ধনতন্ত্রকে একই ভাবেন। তাদের কিন্তু বস্তুবাদকে পাশ্চাত্য বলে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। কারণ, ধনতন্ত্র আজ হঠাৎ দেখা দেয়নি; এবং স্বর্গ থেকেও নেমে আসেনি বা নরক থেকেও উঠে আসেনি। যুগ যুগ ধরে অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে এর সৃষ্টি হয়েছে। যদিও অনেক কারণে ইহা প্রথমে ইউরোপেই সমৃদ্ধিশালী হয় তবুও বহু যুগ ধরেই প্রত্যেক সভ্য দেশেই এর বীজ দেখা দিয়েছিল। আমাদের জাতীয় ঐতিহাসিকেরাই বলেন যে, আমাদের দেশে (কুটির) শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার তখন হয়েছে, "যখন ইউরোপের লোকেরা

অসভ্য বর্বর ছিল।" এতে করে এই প্রমাণ হয় যে, ইউরোপীয়েরা যখন অনুন্নত ও মূর্খ ছিল ভারতবর্ষ তখন বস্তুবাদের পথে এগিয়ে যায়। কুটির শিল্পের বৃদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যের প্রসার ধনতন্ত্রের অগ্রদূত। প্রাগৈতিহাসিক এবং প্রাচীন যুগের মতদ্বৈত ঘটনাবলী বাদ দিলেও ইহা সঠিক প্রমাণ করা যায় যে, ইউরোপীয়দের পূর্বেও ভারতবর্ষে কুটির শিল্পের উৎপাদন প্রণালী অনেক উন্নত ছিল। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, ভারতবর্ষ যখন আধুনিক ধনতন্ত্রের দ্বারে পৌঁছেছিল এবং প্রায় বস্তুবাদের আলিঙ্গনাবদ্ধে দূষিত হচ্ছিল তখন ইউরোপ মধ্যযুগের প্রকট অধ্যাত্মবাদের অজ্ঞানতায় নিমগ্ন ছিল। এর থেকে দুটি বিষয় প্রমাণ হয়; প্রথমত এই যে, ধনতন্ত্রের যা বৈশিষ্ট্য, ধন দৌলতের মোহ তা পাশ্চাত্য সভ্যতারই বিশেষ নিদর্শন নয়, এবং দ্বিতীয়, সেই পাপপূর্ণ মোহ ইউরোপের আগে ভারতবর্ষেই প্রকাশ পায়।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা এই পাপাত্মক ভালবাসায় লজ্জিত নয়। তাঁরা কেবল পুঁজি এবং শ্রমের মধ্যে মিলন ও শান্তি স্থাপনা করে তাকে পবিত্র এবং নিয়মাবদ্ধ করতে চান, যাতে পাশ্চাত্য বস্তুবাদের কাছে ইহা প্রত্যক্ষ শিক্ষার বস্তু হয়ে ওঠে। ইহার উদ্দেশ্য ধনতন্ত্রকে আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে আনা। ধনতন্ত্র সম্বন্ধে এতটুকু ধারণা থাকলেই এর অসম্ভবতা দেখতে পাওয়া যায়। ধনতন্ত্রের মূল কথাই হচ্ছে বেতনভুক্ত শ্রমিকের শ্রমশক্তিকে শোষণ করে কলকারখানার মালিকদের কি ভাবে অর্থ সঞ্চয় হতে পারে। যদি এই সামাজিক প্রেরণার কোনরকম নৈতিক প্রতিশব্দ থাকে তাহলে সেই প্রতিশব্দ হচ্ছে 'লোভ'।

ধনতন্ত্রের নৈতিক আদর্শের কল্পনা নতুন নয়। ইহা বহু যুগ থেকেই আছে। সাধারণ লোককে গান্ধীজি এই আদর্শে আকৃষ্ট করবার বহু পূর্বেই ইহা বস্তুবাদী পাশ্চাত্যে বর্তমান ছিল। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যাঁরা পাশ্চাত্য সভ্যতার বিপক্ষে নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁরা একেবারেই অজ্ঞ। ইউরোপের সামাজিক বিবর্তনের সামান্য জ্ঞান থাকলেই জানা যায় যে, ধনতন্ত্রের প্রাচীনতম জন্মস্থান ইংল্যান্ডের এই 'অহেতুক সামাজিক পাপাচারের' নৈতিক সংস্কারের বহু কাল্পনিক তত্ত্ব সৃষ্টি হয়।

চার্লস কিঙ্স্লি ও তাঁর সম্প্রদায়ের খ্রিষ্টিয় সাম্যবাদ গত অর্দ্ধশতাব্দী ধরে 'গান্ধীবাদেরই' আগমন প্রত্যাশা করেছিল। চার্টিষ্ট আন্দোলনের 'নৈতিক শক্তির' দলপতি যদি আজ এখানে থাকতেন তাহলে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অভ্যন্তরিক দলের, বা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সভ্য হিসাবে গণ্য

হতেন। খ্রিষ্টিয় সাম্যবাদীরা বলেন যে আধ্যাত্মিকতার প্রতি অবজ্ঞা বশতঃ শ্রমিকরা মালিকদের প্রতি তিক্ত হয়ে ওঠে। সেই অবস্থাকে তাঁরা আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে প্রশমিত করতে চান যাতে সকলের মধ্যে সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। লুব্ধ ধনতন্ত্রে নৃশংসভাবে শোষিত শ্রমিকরা যখনই তাদের সেই দুর্বহ অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বিদ্রোহ করেছে তখনই শাসনতন্ত্র তাদের জোর করে দমিয়ে দিয়েছে। সেই রকম অবস্থায় তাদের প্রতি কিঙ্‌স্‌লি এই ধর্মবাক্য প্রচার করেন "তোমরা স্বাধীনতা পাবার জন্য নিজেদের উপযুক্ত কর তাহলে স্বয়ং ভগবান তোমাদের স্বাধীনতা দেবেন.....গুণ না থাকলে প্রকৃত স্বাধীনতা পাওয়া যায় না, ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান হতে পারে না, ভগবানে ভয় এবং স্বদেশবাসীর প্রতি ভালবাসা না থাকলে যন্ত্রশিল্পের সমৃদ্ধি হয় না"। সন্ত ম্যাথুর বিকৃত খ্রিষ্টধর্ম্মের প্রচারই কিঙ্‌স্‌লির 'স্বাধীনতার আধ্যাত্মিকতার' অনুপ্রেরণা। সন্ত লিউকের পূর্বতন ধর্মবাদ ছিল বিদ্রোহের সুদৃঢ় বাণী। খ্রিষ্টধর্ম্ম বিদ্রোহী দাসেদের আদর্শ হিসাবে উদ্ভব হয়। তাই প্রথম প্রথম ইহা অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা উন্নত ছিল। ধনতন্ত্রের নৃশংস অত্যাচারে নিপীড়িত জনসাধারণের প্রতি এবং ধনীদের বিরুদ্ধে কিঙ্‌স্‌লি যে বাণী প্রচার করেন ভগবৎ ভাবে তা বেশ সজীব হয়ে উঠেছিল। সেই আসন্ন বিদ্রোহের বিপদ থেকে বুভুক্ষিত জনতাকে শান্ত করতে ন্যায় এবং ঔদার্যের আদর্শে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা হয়। কিঙ্‌স্‌লি, মরিস্‌, ষ্টিফেন্স এবং অন্যান্য সংস্কারকে খ্রিষ্টিয় সাম্যবাদের প্রচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ধনতন্ত্রের লোভে শোষিত জনতার মনকে জীবনের দুঃখ দারিদ্র্য থেকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের মরীচিকায় পরিণত করা। কিঙ্‌স্‌লির এক প্রসিদ্ধ নভেলের নায়ক এ্যান্টন লক্‌ হচ্ছে একজন পূর্বতন চার্ট সম্প্রদায় ভুক্ত শ্রমিক। তার মুখ থেকেই ভ্রান্ত দর্শনের কথা প্রকাশ পায় ঃ "আমি কি মূর্খই ছিলাম। আমার সংস্কারের প্রয়োজন বাহিরে নয়, অন্তরে। আমার নিজের মনে হয় যে, আজ আমি এই শিক্ষাই লাভ করেছি যে, ভাল মন্দ কোন এক ব্যবস্থাই আমাদের জগতে সুশৃঙ্খলতা আনতে পারবেনা, তার জন্য শুধু প্রয়োজন অধিকতর ভগবৎ শক্তি ও প্রেরণা"।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠাতা ডিস্‌রেলি খ্রিষ্টিয় সাম্যবাদের কল্যান কর ভাবে প্রভাবান্বিত হন। তিনি হুইগ বুর্জোয়াদের স্ব স্ব প্রচেষ্টায় ব্যবসাদির পদ্ধতিকে সামাজিক দুর্দশার কারণ বলে রূঢ় সমালোচনা করে তাঁর বিখ্যাত 'পুস্তক সিবিলে খুব নিপুনতার সঙ্গে এঁকেছেন এবং শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি

খুব উদারতাবশত সমাজ সংস্কারের কথা বলেছেন। গান্ধীবাদী ধনতন্ত্র বিরোধী দয়াপ্রবণ ব্যক্তিরা কি এর চেয়ে অধিকতর আধ্যাত্মিক কিছু প্রস্তাব করেন ?

উনবিংশ শতাব্দীর আরও একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতা স্যার রবার্ট পীল বলেন "আমার কথা শোন, ভগবান বা পরজন্মে যে বিশ্বাস করেনা সে রকম লোককে বিশ্বাস করাও উচিত নয়"। বস্তুত বিকৃত বস্তুবাদের চরম যুগ, উনবিংশ শতাব্দীতে প্রত্যেকটি বড় বড় লোকের মধ্যেই ধর্মপ্রবণতা এবং ভগবৎভীতি প্রবল ভাবে দেখা দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি মহাপন্ডিতদের দার্শনিক বস্তুবাদ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল হয়ে ওঠে। তাই শোষক শ্রেণীকে ভগবানের আওতায় আশ্রয় নিতে হয় এবং তাদের দয়াপ্রবন রাজনীতিজ্ঞেরা শুধু সেই প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা—যার ভিত্তিই হচ্ছে মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ, তাকে আরও উদার, ন্যায় ও দয়াভাবাপন্ন করবার জন্য আন্দোলন করেন।

আমেরিকাই সব থেকে প্রধান এবং প্রবল পাপী বলে গণ্য। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের 'জাতীয় উন্নতির পরিকল্পনা' জেনারেল হিউ, এস জনসন্ এই ভাবে বর্ণনা করেন, 'ইহা এই চায় যে মালিকদেরও যেন লাভ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকরাও যেন সেই লাভের উপযুক্ত অংশ পায়"। কে বলতে পারেন যে ভারতীয় জাতিয়তাবাদীরা পাশ্চাত্যের বস্তবাদী ধনতন্ত্র অপেক্ষা উন্নত যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চান ইহাই সেই জনহিতকর এবং ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি নয়? এই মহান উদ্দেশ্যের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের তত্ত্ব এই যে, যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ে তাকে মারা ঠিক নয়। এত লোভী হওয়া ঠিক নয় যে, যে ডালে বসে আছো, সেই ডালটাও কেটে ফেলা। সমস্ত দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অবস্থা বিচার করে, এবং অন্যান্য দেশে ভারতবর্ষের আদর্শ সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচারিত আছে তা জেনে, তবে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের আদর্শ পরিস্ফুট করে তুলতে হবে।

রুজভেল্টের আমলের আমেরিকার একজন সহকারী রাষ্ট্র সচিব বলেছেন "অর্থকেই নিজের দেবতা করে তুলো না; অর্থকে নিজের ভগবান করে না তুলে দাস করে রাখবে। প্রাচুর্য ও দৈন্যের অসামঞ্জস্যে দুঃখ করো না, তাহলে তুমি মহাপাপী হবে"।

এই মহান ধর্মোপদেশ যে কোন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীও উপযুক্ত ভাবে প্রচার

করতে পারেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য, কোথাও ইহা কার্যে পরিণত করা হয় না। এই কপট উপদেশ কয়েকজন সৌভাগ্যবানের স্বার্থরক্ষার্থে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়। দারিদ্র্যের প্রতি দয়ার ভাব আধ্যাত্মিকতা থেকে উদ্ভব হয়নি, এ হয়েছে বিপ্লবের ভয়ে। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী দেশগুলির শাসকমন্ডলীর উদ্দেশ্য আর গান্ধীর ধনতন্ত্রের আদর্শের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। গান্ধীজিও ধনতন্ত্রকে নিন্দা করেন কিন্তু ইহার উচ্ছেদ করতে চান না। এঁর অহিংসবাদের মধ্যে এরকম কোন বৈপ্লবিক অভিপ্রায় নেই। তাঁর প্রকাশ্য ইচ্ছা এই যে, পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য স্থাপনা করা, এবং পুঁজিপতিদের শ্রমিকদের দয়াবান অভিভাবক করে তোলা। ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে নাগপুরের এক জনসভায় মহাত্মা বলেন ঃ "শ্রমিকদের উপযুক্ত বেতন লাভের জন্য এবং পুঁজিপতিদের শ্রমিকদের মনিব না করে তাদের রক্ষক করে তোলার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি"। এর পূর্বে এবং পরে বহু উপলক্ষ্যে তিনি এর পুনরুক্তি করেছেন। এই উক্তির পর মহাত্মাকে ডিস্‌রেলী অপেক্ষা ধনতন্ত্রের বড় শত্রু বলা যায় না। দুজনেই এই তিক্ত বড়িতে (ধনতন্ত্রের শোষণ) শুধু একটু চিনির প্রলেপ দেওয়ার কথা বলেছেন।

কিঙ্‌স্‌লি ও অন্যান্য সকলের খ্রিষ্টিয় সাম্যবাদ ধনতন্ত্রের সংস্কার করতে গিয়ে তার সহায়তাই করেছে। এ্যান্টন লকের নৈরাশ্যবাদ স্বাধীনতার প্রথম মহাসংগ্রামে বিধ্বস্ত শ্রমিকদের অবনমিত শক্তিকে আকৃষ্ট করে। তাতে করে পুঁজিপতিরা দয়াপরবশ হয়ে তাঁদের প্রচুর লাভ থেকে অত্যন্ত সামান্য কিছু কিছু দিয়ে শ্রমিকদের সাধারণ জীবনকে কৃতদাসত্বে পরিণত করতে সমর্থ হয়; জনসাধারণকে ধর্মের প্রভাবে আনা হয় এবং ধীরে ধীরে প্রচলিত ন্যায় ও আইনের বশীভূত করা হয়। ইহাতে ইংল্যান্ডের সাধারণ শ্রমিকেরা শুধু নিয়মতান্ত্রিকতারই সমর্থক হয়ে ওঠে না, ধর্মভাবাপন্নও হয়ে ওঠে।

কোন দেশের কোন সভ্য জাতই ইংরাজ শ্রমিকদের মত ধর্মভাবাপন্ন নয়। অধ্যাত্মবাদের এই অদ্ভুত ফল লাভে ইংরাজ পুঁজিপতিরাও ধর্মভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন এবং নিজেদের পূর্বপুরুষদের বস্তুবাদী এবং ন্যায় সঙ্গত ঐতিহ্য ভুলে যান। বেকন, হোবস, লকের দেশে জীর্ণ সঙ্কীর্ণচিত্ততা প্রাধান্য লাভ করে। ধনতন্ত্রের প্রত্যক্ষ বিকাশ এবং ঔপনিবেশিক বিস্তারের যুগ ভিক্টোরিয়ার আমলে অত্যন্ত ধর্মভাবাপন্ন ছিল। পুঁজি এবং শ্রমের ভ্রান্ত সমন্বয়ের উপর গ্ল্যাডষ্টোনীয় উদারনৈতিকতার প্রসার হয়।

কোন যুক্তিসঙ্গত লোকই একথা বলতে পারেন না যে, গান্ধীবাদের যাদুদণ্ডে ধনতন্ত্র কোনরূপেই আধ্যাত্মিকতার আদর্শে অন্য কোন রীতিতে পরিণত হবে। ধনতন্ত্রের ধ্বংস ভারতের আধ্যাত্মিক প্রতিভার বৈশিষ্ট্য নয়। একমাত্র উদ্দেশ্য সেই ব্যবস্থাকে ন্যায় সঙ্গত ও মঙ্গলজনক করা। আধ্যাত্মিকতার গৈরিক আবরণে বস্তুবাদের নিকৃষ্টতম রূপই প্রকাশ পায়। যাঁরা আধ্যাত্মবাদ অর্থাৎ ধর্মাত্মক চিন্তাধারা মানেন না তারা বস্তুবাদের বিকৃত রূপকেও অবজ্ঞা করেন। দার্শনিক বস্তুবাদের অন্যতম খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠাতা এপিকিউরাস এর ভাষায় এদের নৈতিক আদর্শ প্রকাশ করা যায়। তিনি ভগবৎ বিশ্বাস ও ধর্মের বন্ধন একেবারে উচ্ছেদ করেছিলেন— 'খাও, দাও, নৃত্য কর' এই উদ্দেশ্য নয়; গুণী ও মহান হওয়ার মধ্যে যে সার্থকতা আছে তার জন্য। খ্রিষ্টিয় পন্ডিতেরা হিংসাপরায়ণ হয়ে প্রাচীন গ্রিসের পন্ডিতদের বস্তুবাদী দর্শনের এই বিকৃত বর্বর রূপ দেন। যাঁরা উচ্চ আদর্শের বড় বড় বুলি আওড়ান এবং খ্রিষ্টধর্মের গুণাবলী আন্তরিকতার সহিত প্রচার করেন, সেই শাসক শ্রেণীও আজ এই আদর্শই গ্রহণ করেছেন। এই বিকৃত বস্তুবাদ যে শুধু পাশ্চাত্যেই আবদ্ধ তা নয়, ভারতে পূর্বেও ইহার প্রচলন ছিল এবং এখনও আছে। ভারতের মহাকাব্যগুলিতে এবং অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যে ইহার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্তমানে আমেদাবাদের কাপড়ের মিলমালিকেরা বোম্বাই এর পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন পার্শি মিলমালিকদের অপেক্ষা অধিক পরহিতকর জীবন যাপন করেন না। এই সব ব্যবসায়ীরা, যাঁরা প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করে কয়েকঘন্টা ধরে পূজাদি করেন অর্থের ব্যাপারে তাঁরা সাইলককেও হার মানিয়ে দেন। শাসকশ্রেণী কর্তৃক বিকৃত বস্তুবাদের জন্য পাশ্চাত্য জগৎকে ঘৃণা করা যেমন ভুল, প্রচলিত ব্যবস্থার কয়েকজনের প্রতিক্রিয়াশীল গোঁড়ামীর উপর ভিত্তি করে ভারতীয় সংস্কৃতিকে স্বভাবজাত আধ্যাত্মিক বলে প্রচার করাও তেমনি ভুল। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে বেশির ভাগ লোকই জীবধর্ম পালন করেতেই ব্যস্ত। যারা কোনক্রমে দিনাতিপাত করে তাদের পক্ষে ভালভাবে জীবন যাপন করার যে স্বাভাবিক আকাঙ্খা; ঐহিক ও আধ্যাত্মিক সভ্যতা ও মুক্তির পক্ষে তা অত্যন্ত সহায়ক। আধ্যাত্মবাদ এই ন্যায় সঙ্গত আকাঙ্খার পথে দাঁড়িয়ে পদার্থিক উন্নতির পথে এবং মানুষের প্রকৃত আধ্যাত্মিক মুক্তির পথে বাধা দেয়।

আধ্যাত্মবাদের বিপরীত আদর্শ দার্শনিক বস্তুবাদ। তার সঙ্গে, 'খাও, দাও, নৃত্য কর' এই বিকৃত আদর্শের কোন সম্বন্ধ নেই। দার্শনিক বস্তুবাদ ধনতন্ত্রের আদর্শ নয়। বরঞ্চ ধনতন্ত্রের প্রধান ও ভীতিজনক শত্রু। ধনতন্ত্র অপেক্ষা উচ্চতর

সভ্যতার বার্তাবহ এই বৈপ্লবিক দর্শনকে বিধস্ত করবার জন্যই ধনতান্ত্রিক সমাজের সমস্ত বুদ্ধি শক্তি আজ নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং বস্তুবাদকে অবজ্ঞা করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা ধনতান্ত্রিক সভ্যতাকে পরিত্যাগ করেন না, তার সঙ্গে এক অসাধু চুক্তিতে আবদ্ধ হন। বস্তুবাদ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাবশত তাঁরা এই অবস্থায় এসে পৌছেছেন। কিন্তু এ থেকে এই বুঝায়না যে, শত্রুর সহিত অধিক ঘনিষ্ঠতার ফলে তাঁরা ইহা মেনে নেবেন। সেক্ষেত্রে এঁরা অন্তত বুদ্ধির সঙ্গে এবং চিন্তাশীল ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করতে পারবেন। এই সঙ্গে এদের বিভিন্ন শ্রেণীতে একটা পার্থক্যও দেখা যাবে। কুসংস্কারবর্জিত উন্নতিশীল ব্যক্তিরা তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করবার জন্য দার্শনিক বস্তুবাদকে এক শক্তিশালী উপাদান হিসাবে নিতে পারবেন অন্তত ঃ তাঁরা ধর্মাত্মক গোঁড়ামি থেকে নিশ্চয়ই মুক্ত হতে পারবেন।

পাশ্চাত্য জগতে আজ বুর্জোয়া শ্রেণী বিপ্লবী বস্তুবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে সংগ্রাম করছেন। কিন্তু এঁদেরই পূর্বপুরুষেরা ধনতান্ত্রিক পূর্বাবস্থার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি বিনষ্ট করবার জন্য মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও ধর্মভাবের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করেছিলেন তা ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁদের সেই সংগ্রামের আদর্শ ছিল দার্শনিক বস্তুবাদ। প্রাচীন যুগের মহান চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যে বিপ্লবী অস্ত্র তৈরি করেছিলেন উদীয়মান বুর্জোয়া সম্প্রদায় তা প্রকৃষ্ট ভাবে গ্রহণ করেন এবং তাকে আরো শক্তিশালী করে তোলেন।

ভারতের অভ্যুদয়েও আজ বস্তুবাদী দর্শনের প্রয়োজন। যতদিন উন্নতিশীল প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা প্রাচীন ধর্মভাবে আসক্ত হয়ে থাকবেন এবং উপর উপর যুক্তিবাদের ভন্ডামিতে সজ্জিত থাকবেন, যা অধিকতর ক্ষতিকর; ততদিন তাঁরা শুধু নিজেদের আদর্শকেই ব্যর্থ করবেন। দূষিত অবস্থায় ভারতের সমাজের উন্নতির সব পথ বন্ধ হয়ে আছে, ভারতের সেই জীর্ণ সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলে তার পুনরুত্থানের পথ উন্মুক্ত করবার জন্য বিজ্ঞান যে শক্তি মুক্ত করেছে আজ সেই শক্তি ও প্রেরণার প্রয়োজন।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দুর্বলতা তার আদর্শে। কতকগুলি প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধতা করছে। আন্দোলনের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলিকে ভ্রান্ত আদর্শে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে । যদি আমাদের উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে হয় তাহলে আজ আমাদের অতীতকে ছেড়ে চলে আসতে হবে। যতদিন আমরা এই অতীতের গুণকীর্তন নিয়ে পড়ে থাকবো—আজকের যা গুণাবলী তো নয়ই, বরং বাস্তবিকপক্ষে কালের গতিতে অধর্মে পরিণত হয়েছে—

ততদিন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ থেকে আমরা দূরে থাকবো। যে সব জাতীয়তাবাদীরা আজ সভ্যতা ও উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে চান তাঁদের এই দার্শনিক বস্তুবাদ থেকে অনুপ্রেরণা নিতে হবে; এবং একমাত্র দার্শনিক বস্তুবাদই অতীতের সভ্যতার প্রকৃত মূল্যবধারণ করে তার মধ্যে ভবিষ্যতের উচ্চতর কৃষ্টির পথ নিদ্ধারণ করতে পারে। অতীতের গৌরবের সেইটুকুই আমাদের প্রয়োজনে লাগে যা ভবিষ্যতের বৃহত্তর সভ্যতার পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। অতীতের আর সবই শুধু বন্ধন; যাঁরা প্রকৃত মুক্তি পেতে চান এবং সামনে এগিয়ে যেতে চান তাঁরা তা বর্জন করবেন। তাই দার্শনিক বস্তুবাদ সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণাই আজ আমদের সব থেকে প্রয়োজন। উন্নতিশীল শক্তিকে ইহা আরও শক্তিশালী করে তুলবে এবং ভারতের বিলম্বিত অভ্যুদয়কে সত্বর সাধন করবে। অপরপক্ষে বস্তুবাদ মানুষের উন্নতির পক্ষে যে সব শত্রু—প্রতিক্রিয়া শক্তি, কৃতদাসত্ব, অধঃপতন ও লাঞ্ছনা, এই সবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দার্শনিক বিজ্ঞান সহায়তা করবে যাতে এই সংগ্রামের মধ্যেও কিছু কিছু মানসিক আনন্দ লাভ করা যায়।

এইসব থেকে প্রকৃত অবস্থা নির্ধারণ করবার জন্য নিরর্থক প্রচলিত বুলি ও ভ্রান্ত সঙ্কেতবাক্য পরিত্যাগ করতে হবে। আধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক। যাঁদের এর বাদবিষয় বা বিভিন্ন অভিভুক্ত দল সম্বন্ধে সঠিক ধারণা নেই তাঁরা এর বিচার ঠিক ভাবে করতে পারবেন না। চিন্তাশক্তির মৌলিক উপাদান এবং মানব সভ্যতার মূল আধার জনিত দ্বন্দ্ব দার্শনিক পরিস্থিতির মধ্যেই পরিচালিত হওয়া উচিত। এবং এই তর্কবিতর্কে স্পষ্ট সংজ্ঞা, রীতিসঙ্গত যুক্তি এবং নির্ভুল পদ্ধতির প্রয়োজন। মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমগ্র ইতিহাস থেকে এর উপাদান সঞ্চয় করতে হবে।

মানুষের আশা, ব্যবহার ও কার্যকলাপই তার জীবন যাত্রার মৌলিক ধর্ম—অজ্ঞানতাবশত যাকে বস্তুবাদ বলে ঘৃণা করা হয়। এই জীবধর্মই প্রাণী জগৎকে জড় জগৎ থেকে পৃথক করে রেখেছে। এই সারবান তথ্য, যা অর্থহীন বাক্যালাপ এবং চমকপ্রদ সঙ্কেত ধ্বনিতে বিভ্রান্ত হয়েছে তা দেখিয়ে দেবার পর যুগ, যুগান্তর ধরে বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মবাদে, জ্ঞান ও অন্ধ বিশ্বাসে, ধর্ম এবং বিজ্ঞানে যে সংগ্রাম চলেছে কেবল তার প্রকৃত রূপ নির্দ্ধারণ করা বাকি থাকে। যদি জীবধর্মকে পাপ পলে মানুষের আধ্যাত্মিকতার হানিকর বলে অবজ্ঞা করা হয় তাহলে অতীতের বা বর্তমানের ভারত পাশ্চাত্যের এই গুরুতর অপরাধ থেকে বাদ পড়বে না। পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক সমাজ বস্তুবাদকে ভারতীয় কৃষ্টীর রক্ষকদের চেয়ে কম

আন্তরিকতার সহিত ঘৃণা করে না বা কম সংকল্প নিয়ে প্রতিরোধ করছেনা। একমাত্র প্রভেদ এই যে, পাশ্চাত্য জাতিরা বুদ্ধি বিবেচনার সহিত এবং শত্রুর ক্ষমতা এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে পুরো জ্ঞান নিয়ে তা'করে কিন্তু অজ্ঞানতাবশত ভারতবাসীরা শত্রু মিত্র ভেদ ভুলে যায় এবং নিজেরাই অত্যন্ত করুণ ভাবে আদর্শচ্যুত হয়।

যদিও আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার পূর্বপুরুষেরাই দার্শনিক বস্তুবাদ প্ররোচনা করেন তবুও ইহা এখন আর এঁদের আদর্শ নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা এখন দার্শনিক বস্তুবাদকে পরিত্যাগ করেছে এবং সর্বপ্রকারে তার প্রতিরোধ করেছে। দার্শনিক বস্তুবাদ স্বাধীনতার বাণী। আধ্যাত্মবাদ অর্থাৎ সর্বপ্রকার ধর্মাত্মভাব এবং কল্পনাপ্রসূত দর্শন নির্যাতিত সামাজিক শ্রেণীর আদর্শ; নিজেদের সুখসুবিধা বজায় রাখবার জন্য শাসক শ্রেণীর ইহা একটি মহান অস্ত্র। পাশ্চাত্যের শাসক শ্রেণীর দর্শনও মূলত ঃ আধ্যাত্মিক; ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ প্রতিভার সঙ্গে এর নিবিড় সম্বন্ধ। ইহা বুঝতে পারলে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি যে গুপ্ত বিরুদ্ধতা চলেছে তার অসম্ভবতা প্রকাশ হয়। ভারতের আধ্যাত্মিকতার সাধু প্রবর্তকেরা শাসক শ্রেণীর আদর্শের রক্ষক হিসাবে এবং স্বাধীনতার দর্শনের প্রকাশ্য শত্রু হিসাবে নিজেদের প্রকাশ করেন।

বস্তুবাদী দর্শনের মূল সূত্রগুলি এবং ইহার বিবর্তনের ইতিহাস অধ্যয়ন করলেই এই দুই বিপরীত দর্শনের প্রভেদ স্পষ্ট প্রকাশ পাবে, এবং তাতে করে দর্শনের বাদবিষয়ও স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। পরিস্ফুট সংজ্ঞা দ্বারা ভারতের প্রচলিত ভ্রান্ত বস্তুবাদের ধারণা দূর হবে এবং পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক সভ্যতার দার্শনিক আদর্শের প্রকৃত রূপ বিচার করতে সাহায্য করবে। পূর্ব কল্পিত ধারণার উপর ভিত্তি না করে যথাযথভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আদর্শ ভারতীয় সংস্কৃতির মতই অবস্তুবাদী। কিন্তু ইহাও সত্য যে, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের মধ্যেও বস্তুবাদের বীজ পাওয়া যায়। এবং ভারতীয় অভ্যুদয়ের আদর্শবাদীদের প্রধান কাজ এই অবাস্তবতার ধোঁয়ার মধ্যে থেকে বাস্তবের রূপ প্রকাশ করা। পাশ্চাত্য সভ্যতার কৃষ্টির এই নিঁখুত উপলব্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ঐতিহ্যের সঠিক ধারণা দ্বারা মানব সভ্যতাকে সূক্ষ্ম মাপকাঠিতে বিচার করবার অভ্যাস দূর হবে। এই ভাবে সমালোচনা করলে তবেই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে যে কাল্পনিক প্রভেদ তা' বিনষ্ট হবে। এতে করে এই দুই মানবজাতির প্রত্যক্ষ প্রভেদ শুধু সময়ের পার্থক্যে পরিণত হবে। গুণাত্মক পার্থক্য সংখ্যাসূচক পার্থক্য পরিণত

হবে। এবং ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, প্রাচ্যের এবং পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা বিভিন্ন নিয়মাভুক্ত বিভিন্ন আদর্শপন্থী দুই বিভিন্ন জগতে বাস করেনা; তারা সামাজিক বিবর্তনের দুই বিশেষ স্তরের অন্তর্ভুক্ত; তাদের পার্থক্য শুধু মানব সভ্যতার দুই বিভিন্ন ঐতিহাসিক অধ্যায়ের।

পাশ্চাত্য জগতে আজ বুর্জোয়া শ্রেণী বিপ্লবী বস্তুবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে সংগ্রাম করছেন। কিন্তু এঁদেরই পূর্বপুরুষেরা ধনতান্ত্রিক সমাজের পূর্বাবস্থার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি বিনষ্ট করবার জন্য মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও ধর্মভাবের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করেছিলেন তা ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁদের সেই সংগ্রামের আদর্শ ছিল দার্শনিক বস্তুবাদ। প্রাচীন যুগের মহান চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যে বিপ্লবী অস্ত্র তৈরি করেছিলেন উদীয়মান বুর্জোয়া সম্প্রদায় তা প্রকৃষ্ট ভাবে গ্রহণ করেন এবং তাকে আরো শক্তিশালী করে তোলেন।

ভারতের অভ্যুদয়েও আজ বস্তুবাদী দর্শনের প্রয়োজন। যতদিন উন্নতিশীল প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা প্রাচীন ধর্মভাবে আসক্ত হয়ে থাকবেন এবং উপর উপর যুক্তিবাদের ভন্ডামীতে সজ্জিত থাকবেন, যা অধিকতর ক্ষতিকর; ততদিন তাঁরা শুধু নিজেদের আদর্শকেই ব্যর্থ করবেন। দূষিত অবস্থায় ভারতের সমাজের উন্নতির সব পথ বন্ধ হয়ে আছে, ভারতের সেই জীর্ণ সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলে তার পুনরুত্থানের পথ উন্মুক্ত করবার জন্য বিজ্ঞান যে শক্তি মুক্ত করেছে আজ সেই শক্তি ও প্রেরণার প্রয়োজন।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দুর্বলতা তার আদর্শে। কতকগুলি প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধতা করছে। আন্দোলনের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলিকে ভ্রান্ত আদর্শে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। যদি আমাদের উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে হয় তাহলে আজ আমাদের অতীতকে ছেড়ে চলে আসতে হবে। যতদিন আমরা এই অতীতের গুণকীর্তন নিয়ে পড়ে থাকবো—আজকের যা গুণাবলী তো নয়ই, বরং বাস্তবিকপক্ষে কালের গতিতে অধর্মে পরিণত হয়েছে—ততদিন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ থেকে আমরা দূরে থাকবো। যে সব জাতীয়তাবাদীরা আজ সভ্যতা ও উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে চান তাঁদের এই দার্শনিক বস্তুবাদ থেকে অনুপ্রেরণা নিতে হবে; এবং একমাত্র দার্শনিক বস্তুবাদই অতীতের সভ্যতার প্রকৃত মূল্যবধারণ করে তার মধ্যে ভবিষ্যতের উচ্চতর কৃষ্টির পথ নির্দ্ধারণ করতে পারে। অতীতের গৌরবের সেইটুকুই আমাদের প্রয়োজনে লাগে যা ভবিষ্যতের বৃহত্তর সভ্যতার পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। অতীতের আর

সবই শুধু বন্ধন; যাঁরা প্রকৃত মুক্তি পেতে চান এবং সামনে এগিয়ে যেতে চান তাঁরা তা বর্জন করবেন। তাই দার্শনিক বস্তুবাদ সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণাই আজ আমাদের সব থেকে প্রয়োজন। উন্নতিশীল শক্তিকে ইহা আরও শক্তিশালী করে তুলবে এবং ভারতের বিলম্বিত অভ্যুদয়কে সত্বর সাধন করবে। অপরপক্ষে বস্তুবাদ মানুষের উন্নতির পথে যে সব শত্রু—প্রতিক্রিয়া শক্তি, কৃতদাসত্ব, অধঃপতন ও লাঞ্ছনা, এই সবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দার্শনিক বিজ্ঞান সহায়তা করবে যাতে এই সংগ্রামের মধ্যেও কিছু কিছু মানসিক আনন্দ লাভ করা যায়।

এইসব থেকে প্রকৃত অবস্থা নির্ধারণ করবার জন্য নিরর্থক প্রচলিত বুলি ও ভ্রান্ত সঙ্কেতবাক্য পরিত্যাগ করতে হবে। অধ্যাত্তবাদ ও বস্তুবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক। যাঁদের এর বাদ বিষয় সম্বন্ধে বা বিভিন্ন অভিভুক্ত দল সম্বন্ধে সঠিক ধারণা নেই তাঁরা এর বিচার ঠিক ভাবে করতে পারবেন না। চিন্তাশক্তির মৌলিক উপাদান এবং মানব সভ্যতার মূল আধার জনিত দ্বন্দ্ব পরিস্থিতির মধ্যেই পরিচালিত হওয়া উচিত। এবং এই তর্কবিতর্কে স্পষ্ট সংজ্ঞা, রীতিসঙ্গত যুক্তি এবং নির্ভুল পদ্ধতির প্রয়োজন। মানব সভ্যতাও সংস্কৃতির সমগ্র ইতিহাস থেকে এর উপাদান সঞ্চয় করতে হবে।

মানুষের আশা, ব্যবহার ও কার্যকলাপই তার জীবন যাত্রার মৌলিক ধর্ম—অজ্ঞানতাবশত যাকে বস্তুবাদ বলে ঘৃণা করা হয়। এই জীবধর্মই প্রাণী জগৎকে জড় জগৎ থেকে পৃথক করে রেখেছে। এই সারবান তথ্য, যা অর্থহীন বাক্যলাপ এবং চমকপ্রদ সঙ্কেত ধ্বনিতে বিভ্রান্ত হয়েছে তা দেখিয়ে দেবার পর, যুগ যুগান্তর ধরে বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদে, জ্ঞান ও অন্ধ বিশ্বাসে, ধর্ম এবং বিজ্ঞানে যে সংগ্রাম চলেছে কেবল তার প্রকৃত রূপ নির্দ্ধারণ করা বাকি থাকে। যদি জীবধর্মকে পাপ বলে মানুষের আধ্যাত্মিকতার হানিকর বলে অবজ্ঞা করা হয় তাহলে অতীতের বা বর্তমানের ভারত পাশ্চাত্যের এই গুরুতর অপরাধ থেকে বাদ পড়বে না।

বস্তুবাদ ও বাস্তব আদর্শবাদ
(Materialism and Practical Idealism)

বিপ্লবের দর্শন - বস্তুবাদ। মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে বিপ্লবের নিগূঢ় সম্বন্ধ। সেইজন্য সব যুগেই বস্তুবাদের প্রয়োজন। মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ বস্তুবাদের প্রকৃত বৈপ্লবিক রূপ প্রথম প্রকাশ করেন। এই বৈপ্লবিক রূপ বস্তুবাদকে অন্যান্য চিন্তাধারার সঙ্গে পৃথক করে রেখেছে। বস্তুবাদের প্রধান বক্তব্য হচ্ছে- অলস চিন্তার দ্বারা জ্ঞান লাভ হয় না। প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় কর্ম প্রচেষ্টায়। দার্শনিকেরা বহুভাবে বিভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে জগৎকে বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু জগৎকে বিশ্লেষণ করাই দার্শনিকদের প্রধান কাজ নয়, জগৎকে নূতন ছাঁচে ঢেলে কি ভাবে নূতন করে গড়ে তোলা যায় সেই পথের সন্ধান দেওয়াই দার্শনিকদের কাজ। জগৎকে ক্রমাগত নূতন ভাবে গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই মানুষের সামনে প্রকৃত জ্ঞানের ভান্ডার উন্মুক্ত হয়ে যায়। আর এই নূতন করে গড়ে তোলার ফলে জগতে যে নূতন সভ্যতা সৃষ্টি হয় তারই মাপ কাঠিতে সেই যুগের জ্ঞানের মূল্য ধার্য হয়।

হেগেল ঘোষণা করেন- একমাত্র সত্য হচ্ছে পরিবর্তন — "যাহা আছে তাহাই সত্য"। এই ধারণা মানুষের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব চিন্তাধারার ইতিহাসে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেয়। ইতিহাস ক্রমপরিবর্তনশীল। এই ক্রমপরিবর্তনশীল ইতিহাসের প্রত্যেকটি ধাপ সত্য এবং সত্য বলেই প্রত্যেকটি ধাপ অবশ্য প্রয়োজনীয় ও অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আদর্শবাদ প্রচার করা সত্ত্বেও হেগেলের আদর্শই একমাত্র চিরন্তন সত্য হয়ে থাকলো না। হেগেলের দ্বন্দবাদ তার আদর্শবাদকে বিনষ্ট করে দিয়ে এনে দিল আর এক নূতন আদর্শ এবং শুধু বাকি থাকলো আদর্শকে পৃথিবীর বাস্তবিক পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া। মার্কস্ যৌবনে হেগেলীয় আদর্শ পন্থী ছিলেন। পরে হেগেলীয় দর্শনের সারাংশ 'যুক্তিতর্কবাদ'কে তার জরাজীর্ণ কল্পনা থেকে উদ্ধার করে তিনি বস্তুবাদের সংস্কার করেন। মার্কস্ই প্রকৃতপক্ষে হেগেলীয় দর্শনের সঠিক রূপ দেন।

"যুক্তিতর্কবাদ, জার্মানিতে দুর্বোধ ভাবে প্রচলিত থাকলেও-বেশ প্রাধান্য লাভ করেছিল। কারণ একমাত্র যুক্তিতর্কবাদের সাহায্যেই তখনকার অবস্থা পরিস্কার ভাবে বোঝা যেত। যদিও যুক্তিবাদ হিসাবে তা' অত্যন্ত নিচু দরের ছিল; এবং বুর্জোয়া শ্রেণী ও তার নীতিবিদ মুখপাত্রদের কাছে ঘৃণিত হোত, কারণ যুক্তিবাদ তৎকালীন অবস্থাকে পরিস্কার ভাবে বোঝাতে সক্ষম হলেও সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপরীত রূপকেও বোধগম্য করে তোলে এবং প্রচলিত ব্যবস্থার ধ্বংসের অনিবার্য কারণগুলি নির্দেশ করে দেয়। বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে এই মতবাদ ঘৃণ্য হবার কারণ ইহা বৈপ্লবিক এবং সমাজ ব্যবস্থার প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক রূপকেই পরিবর্তনশীল বলিয়া বলিয়া মনে করে"। (মার্কস্)

যা আছে তা নিয়েই বস্তুবাদ সন্তুষ্ট নয়। প্রচলিত অবস্থার পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যেই এর ধ্বংসের কারণ এবং ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবার সম্ভাবনাও বস্তুবাদ অনুসন্ধান করে। বস্তুবাদ কখনও অজ্ঞানতাকে মেনে নেয় না। কারণ, অজ্ঞানতার লজ্জাজনক নীতি আমাদের জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চায়। এই নীতি ভুয়ো বিজ্ঞানের রূপে বিজ্ঞান ও মানুষের প্রকৃত আধ্যাত্মিক মুক্তির পথে যে সব বাধা আছে ঈশ্বরবাদ, অন্ধবিশ্বাস, ধর্মবাদ, কল্পনাপ্রসূত অলস চিন্তাধারা, দুর্জ্ঞেয়বাদ, রহস্যবাদ ইত্যাদি- এদের পোষণ করে, কিন্তু বস্তুবাদে উপরোক্ত মতবাদগুলির কোন স্থান নেই। আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিস্কার ও মানবজাতির আজন্ম বিচার ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই বস্তুতান্ত্রিক জ্ঞানবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত। অজ্ঞানতার নীতিকে সমূলে বিনষ্ট করে বস্তুবাদ মানুষের আত্মাকে সমস্ত কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে দেয় এবং প্রমাণ করে যে মানুষের অগোচর কিছু নেই। বস্তুতঃ শাসক সম্প্রদায় নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখবার জন্যই অতীন্দ্রিয়তা ও আজগুবি মতবাদগুলি সৃষ্টি করেছে। অপরিবর্তণীয়, চিরস্থায়ী ও আধ্যাত্মিক মনোভাব থেকে মুক্তিই প্রচলিত ব্যবস্থার ভয় ভাবনা ও চিরন্তন বন্ধন থেকে মানুষকে স্বাধীন করে। এ জগতে চিরস্থায়ী, চিরপবিত্র বা অনন্ত কিছুই নেই। পরিবর্তনশীলতাই হচ্ছে একমাত্র সত্য ও চিরস্থায়ী। হেরাক্লাইটস্ বহুদিন আগে আমাদের এই শিখিয়েছেন। বস্তুবাদী দর্শন মানুষের মনে এনে দেয় জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলবার অনুপ্রেরণা।

বস্তুবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে অন্যান্য দার্শনিক মতবাদগুলির মত ইহা কতকগুলি উপদেশাবলীর সমষ্টি মাত্র নয়; ইতিহাস, সমাজ ও পারিপার্শ্বিক

অবস্থার বিশ্লেষণ এবং মানুষের বৈচিত্র বিচারের ইহা একটি প্রকৃষ্ট প্রণালী। বস্তুত বস্তুবাদ দর্শনশাস্ত্রকে তার সঙ্কীর্ণতা ও অনর্থক কল্পনা থেকে মুক্ত করেছে, এই মতবাদ প্রচার করে যে মানুষের জ্ঞানার্জনের কোন নির্দিষ্ট উপায়ও নেই এবং তা সীমাবদ্ধও নয়। দর্শনশাস্ত্র যে শাসক শ্রেণীর আশ্রয়ধীন দু'একজনের বুদ্ধিজাত শাস্ত্র, বা কোন বিশেষ স্থানের অধিবাসীদের সম্পত্তি নয় এই ধারণা নষ্ট হয়ে যায় বস্তুবাদের অকাট্য যুক্তিদ্বারা। উন্নতি ও জ্ঞানলাভের জন্য এই মতবাদ সমগ্র মানবজাতির মানসিক প্রচেষ্টা জাত এক প্রণালী। তাই মানবজাতির উদ্দেশ্য ও দর্শনের উদ্দেশ্য একই।

বস্তুবাদ - বিপ্লবের দর্শন। সেজন্য স্বভাবতই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশের শাসক শ্রেণীর নিকটই এ মতবাদ গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না। কারণ বুর্জোয়া, জমিদার ও পুরোহিত শ্রেণী) সকলেরই সুখ, সুবিধা ও স্বার্থ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে নিগূঢ় ভাবে জড়িত। সেইজন্যই দেখতে পাই, ভারতের পতনোম্মুখ সভ্যতার দুঁদে পান্ডাদের চেয়ে পাশ্চাত্যের বর্তমান সামাজিক প্রথার সমর্থনকারীরা বস্তুবাদকে কম ঘৃণা করেন না।

পাশ্চাত্য সভ্যতাকে যারা বস্তুতান্ত্রিক বলে নাসিকা কুঞ্চন করেন-তারা শুধু বস্তুবাদ সম্বন্ধেই অজ্ঞ নন— যে সভ্যতাকে তারা অবজ্ঞা করেন তার প্রধান চিন্তাধারা সম্বন্ধেও তাদের ধারণা স্পষ্ট বলে মনে হয় না। প্লেটোর সময় থেকেই পাশ্চাত্য দর্শন তত্ত্বজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, দুর্বোধ ভাব, কল্পনা, অদ্বৈতভাব ও ধর্মভাবে পূর্ণ ছিল অর্থাৎ বস্তবাদের যা কিছু বিপরীত সবই তাতে ছিল। তৎপরবর্তীকালের দর্শন-যাকে 'অনিয়ন্ত্রিত বস্তুবাদ' বলা হয়-তাও প্রধানত কল্পনা প্রসূত। ইহার অন্তর্হিত ধর্ম প্রচারের বীজকে বিজ্ঞান সম্মত বলে চালাবার জন্য নানারকম ভ্রান্তি জনক নাম ও হেতুবাদের যুক্তি দিয়ে ঢেকে রাখা হয়।

ভারতীয় পন্ডিতেরা যাঁরা বস্তুবাদকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন এবং আদর্শবাদ প্রচার করেন তারা এই দুই বিষয়েই অজ্ঞ। বস্তুবাদকে যেমন অজ্ঞানতার 'খাও দাও নৃত্য কর' জাতীয় কুদর্শনে পরিণত করা হয়েছে—আদর্শবাদকেও কিন্তু দার্শনিক মতবাদ হিসাবে গণ্য করা হয় না। সাধারণত আদর্শবাদ মানে জীবনকে কোন এক আদর্শে পরিচালনা করা বুঝায়। আদর্শবাদী দর্শন কিন্তু আদর্শবাদের প্রচলিত ধারণা থেকে অনেক পৃথক। সাধারণ অর্থ ছাড়া দু'টো শব্দের মধ্যেও অনেক পার্থক্য আছে। প্রথমটির উৎপত্তি আদর্শ থেকে এবং দ্বিতীয়টি কল্পনা থেকে। বাস্তব আদর্শবাদ ব'লে যা প্রচলিত - তার সঙ্গে আদর্শবাদী দর্শনের কোন সম্বন্ধ

নেই। সেইজন্য বস্তুবাদীর কাছে বাস্তব আদর্শ একটা স্বাভাবিক জিনিস) একে কষ্ট করে তৈরি করতে হয় না। আদর্শহীন জীবন এদের কাছে একেবারে অর্থহীন। আদর্শহীনতা বস্তুবাদীর কাছে মৃত্যুর তুল্য। আদর্শের উপর ভিত্তি করেই বস্তুবাদীর জীবন গড়ে ওঠে—এবং সেই আদর্শকে নিয়েই এরা বেঁচে থাকে এবং এই আদর্শের জন্যই এরা মহান ও সাধু। আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করাতেই এদের সুখ ও আনন্দ।

একমাত্র রাশিয়াতেই আজ বস্তুবাদ রাষ্ট্রীয় দর্শন। বস্তুবাদ সম্বন্ধে আধ্যাত্মবাদীদের প্রচলিত ধারণাগুলি যদি এতটুকু সত্য হত তা হ'লে রাশিয়াতে আজ নৈতিক অধঃপতন ও লাম্পট্য চূড়ান্ত হয়ে দেখা দিত। কিন্তু সেখানকার প্রকৃত নৈতিক অবস্থা কি? প্রত্যেক সত্যবাদী আধ্যাত্মবাদী স্বীকার করবেন যে সাম্যবাদ ঈশ্বরকে স্বীকার না করলেও উহা হিংসার ভাব উদ্রেক করে না, বরং দেখা যায় — যে প্রকৃত সাম্যবাদীরা তাদের আদর্শের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না। এরা অনেক কষ্ট স্বীকার করে নিজেদের কাজ করে, অনেক বিপদ সঙ্কুল কাজে ব্রতী হয়, প্রয়োজন বোধে মৃত্যুকে পর্যন্ত অবহেলা করে, ঘন্টার পর ঘন্টা সামান্য বেতনে খেটে যায়—এই কাজেই তাদের গৌরব—এই ত্যাগের মধ্যেই এদের আনন্দ। মানব সমাজকে ন্যায় ও সত্যের আদর্শে গড়ে তোলার জন্য সাহায্য করাতেই এদের গৌরব। এই কাজকে এরা নিজেদের অধিকার বলে মনে করে।

আধ্যাত্মবাদীর কিন্তু ঠিক বিপরীত। কতকগুলি কল্পনা প্রসূত আদর্শকে নিজস্ব বলে মনে করে এইসব আধ্যাত্মবাদীরা জীবনকে এক কাল্পনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন এবং নিজেদের আদর্শবাদী বলে প্রচার করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মবাদীদের এই আদর্শের উপর মানব শক্তির স্পষ্ট ছাপ থাকে। যারা বাস্তবের প্রভাবকে অস্বীকার করেন এবং আধ্যাত্মিক ক্ষমতাতে বেশি আস্থাবান তারা কিন্তু একথা স্বীকার করেন না যে মানুষ নিজে থেকেই সত্যানুবর্তী হতে পারে বা মহৎ আদর্শে মানুষের জীবন যাপন করা উচিত। মানব শক্তিকে অস্বীকার করে বা বাস্তবকে মেনে না নিয়ে আধ্যাত্মবাদীরা নিজেদের ভগবানকেই আদর্শচ্যুত করেন এবং দর্শনশাস্ত্রকে জটিল করে রাখেন। তাঁদের সম্বন্ধে এ ধারণা বা বিচার শুধু অপরের নয়—এ তাঁরা নিজেরাও স্বীকার করেন। এ বিষয়ে দুইটি উদাহরণ উল্লেখ যোগ্য— একটি প্রাচ্যের, অপরটি পাশ্চাত্যের। ম্যাজিনীর লেখা 'মানুষের কর্তব্য' বাস্তব আদর্শের একখানি প্রাথমিক পুস্তক। এই পুস্তকখানি ভারতীয়

জাতীয়তাবাদীদের কাছে পাশ্চাত্য জ্ঞান ভান্ডারের একখানি শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে গণ্য হয়। মার্কস্ যদিও তাঁর সময়ে জাতীয় মুক্তির এক প্রধান পান্ডা ছিলেন তবুও মার্ক্সের বস্তুবাদকে ম্যাজিনী সাহেব একেবারে অগ্রাহ্য করেছেন। এদের দু'জনের চিন্তাধারায় এক গভীর প্রভেদ ছিল। এই প্রভেদ ছিল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রচারক ম্যাজিনীর মতে মানুষের শুধু কর্তব্যই আছে; মানুষের যে কোন অধিকারও থাকতে পারে একথা তিনি মানতে রাজী ছিলেন না। মনে হয় এই জাতীয়তাবাদী দার্শনিক ফরাসী বিপ্লবের 'মানুষের অধিকার ঘোষণা' বা টমাস পেইনের লেখা ঐতিহাসিক পুস্তকগুলি পড়েন নাই। যদিও এই সব পুস্তকের লেখাগুলি বুর্জোয়া শ্রেণীকেই সমর্থন করেছে—কারণ সে সময়ে বুর্জোয়াশ্রেণীই বৈপ্লবিক শ্রেণীরূপে দেখা দিয়েছিল এবং তারা বস্তুবাদী দর্শনের সমর্থক ছিল। তৎকালীন বিপ্লবী হিসাবে বুর্জোয়া শ্রেণী তখন মানুষের অধিকারের জন্য সংগ্রাম চালিয়েছিল। তারপর একশো বৎসরের মধ্যেই ম্যাজিনীর দার্শনিক মতবাদ মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকারকে উপেক্ষা করে মানুষের সামনে উপস্থিত হ'ল শুধু কর্তব্যের দাবী নিয়ে। আধ্যাত্মবাদ বলে প্রচলিত ভুয়োদর্শনের এ একটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। প্রকৃতপেক্ষ ম্যাজিনীর দার্শনিক মতবাদ মানুষের দাসত্বকেই প্রতিষ্ঠা করেছে। অধিকার বিহীন কর্তব্য দাসত্বের লক্ষণ। আধ্যাত্মবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল ম্যাজিনীর দর্শন। তিনি লিখেছেন "সৃষ্টির অদ্বৈত ভাব বিনষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ ও রীতি— যে প্রত্যেক মানুষেরই কোন না কোন কর্তব্য আছে— তারও বিনাশ হয়ে যায়"। ইহা বস্তুবাদের উপর আক্রমণ ছাড়া আর কিছু নয়; সুতরাং দেখা যায় যে, আধ্যাত্মবাদ স্বাধীনতার ছদ্মবেশে মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখবার একটা সুকৌশল মাত্র। দার্শনিক মতবাদ হিসাবে ম্যাজিনীই ফ্যাসিবাদের ভিত্তি স্থাপনা করেন।

"ভারতীয় আধ্যাত্মিক 'সমাজতন্ত্রীরা' ম্যাজিনীর মতবাদকে ভারতীয় মতবাদ বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হ'ন না। আধ্যাত্মবাদকে বিচার করতে শুধু অনুমানের উপর ভিত্তি করার প্রয়োজন নেই—আধুনিক যুগের হিন্দু দর্শনের একজন প্রধান সমর্থকের মত হচ্ছে "আমাদের নৈতিক অভিজ্ঞতাই শ্রেষ্ঠ নয়। ধর্মের অভিজ্ঞতা নৈতিক অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেক বড়। নৈতিক জীবনের প্রাথমিক ভিত্তি—অনন্ত জগৎ, অসীম ভগবান, শঙ্কাজনক সংগ্রাম। কিন্তু ধর্মের আশ্বাস ব্যতিরেকে মানুষের নৈতিক আদর্শের যতকিছু তাৎপর্য ও ন্যায্যতা এবং নৈতিক সংগ্রামের

যত কিছু প্রেরণা সব বিনষ্ট হয়ে যায়। নীতিই ধর্মের পথ নির্দেশ করে এবং ধর্মের দ্বারাই আমরা জগতের একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভাব উপলব্ধি করি এবং পরমপিতা ঈশ্বরের মধ্যেই সব কিছুর দর্শন পাই। একমাত্র ধর্মের উপর আস্থা রাখলেই আমরা জগতের মঙ্গল সাধনে জয়ী হতে পারি*। এ কথার অর্থ এই যে একমাত্র ধর্মের দ্বারাই বাস্তব আদর্শ সফল হ'তে পারে। মানুষ নিজের বুদ্ধি, বিবেক বা যুক্তি দ্বারা সৎ হতে পারে না। একমাত্র ঈশ্বরের বিধানই মানুষকে সৎভাবে জীবন যাপন করতে অনুপ্রেরিত করে; নচেৎ কিরকম নৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তা আমরা ভারতের শোষিত, বুভুক্ষু জনসাধারণের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা থেকে বুঝতে পারি।

আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে এক নূতন শক্তির উদ্ভব হয়। বণিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সেই সময়ে মধ্যযুগের সামন্ত প্রথা থেকে নিজেদের মুক্ত করবার চেষ্টা করে। ধর্ম ও ঈশ্বর-বাদের গোঁড়ামিকে সমূলে ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান মধ্যযুগের সামন্ত প্রথার আদর্শকেও সমূলে বিনষ্ট করে দেয়। কিন্তু জনসাধারণের উপর নির্মম অত্যাচার করবার পিছনে কোন যুক্তি বা ন্যায্যতা না থাকায় অত্যাচারী সামন্তদের স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ছিল। এই সময়ে বুর্জোয়া সম্প্রদায় 'বিপ্লবের অগ্নিবাণী' প্রচার করে ক্রমে ক্রমে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টি করেন ও নিজেরাই দেশের শাসনভার দখল করেন। অবস্থার এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ও নূতন শ্রেণী সংঘর্ষে বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের সুবিধা জনক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর দৃষ্টি ভঙ্গি তেও এক পরিবর্তন দেখা দেয়। বিপ্লবের পূর্বে এঁরাই শোষিত সম্প্রদায় হিসাবে রাজনীতি ও আদর্শের ক্ষেত্রে বিপ্লবের বাণী প্রচার করেছিলেন—কিন্তু শাসকশ্রেণীভুক্ত হয়ে এঁরাও ক্রমশ সঙ্কীর্ণ চিত্ত হয়ে ওঠেন।

সমাজের উপর প্রভুত্ব করবার জন্য প্রয়োজন — শাসন ক্ষমতার অধিকার; অধিকার না থাকলে কোন বিশেষ শ্রেণী সমগ্র সমাজের উপর প্রভুত্ব করতে পারে না এবং সেই প্রভুত্ব করার অধিকার কোন অলৌকিক বা আন্তরীক্ষ ক্ষমতার সাহায্য ছাড়া প্রতিষ্ঠা করা সহজে সম্ভব হয় না। সেই জন্যই শাসক শ্রেণী নিজেদের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা করতে ধর্ম ও অন্ধ বিশ্বাসের আশ্রয় নেয়। বুর্জোয়াশ্রেণী এই উপায় অবলম্বন করেই নিজেদের প্রভুত্বের অধিকার বজায় রাখবার চেষ্টা করে। তাঁরা শাসন ক্ষমতা দখল করবার পর সমাজের অশিক্ষিত নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার সেই প্রাচীন ও আস্থাবিহীন আধ্যাত্ম বা ঈশ্বরবাদকে

তার জীর্ণ উপকরণের উপর প্রতিষ্ঠা করেন। বিজ্ঞান অন্ধবিশ্বাসের মূল শিথিল করে দেওয়ার ফলে মানুষের মানসিক উৎকর্ষতা সহজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মবাদের সঙ্গে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারেনি। তাই ধর্মের ধরণটা একটু বদলে দিয়ে সমাজ ধর্মকেই আদর্শবাদ হিসাবে নূতনভাবে গ্রহণ করে নেয়। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বাদের অপ্রচলিত নীতির জায়গায় চমকপ্রদ কল্পনা প্রসূত 'পরমোৎকৃষ্ট ভাবে'র স্থাপনা হোল।

খ্রিষ্টিয় চার্চের কঠোর সমালোচক সুচতুর ভলটেয়ারও এই নূতন চকমপ্রদ আদর্শের বার্তাবহরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অন্যান্য দার্শনিক মতবাদের নাস্তিকতা খন্ডন করবার জন্য তিনি যুক্তি দিলেন-''যদি ভগবান বলে কিছু নাও থাকে তবে আমাদের ভগবান সৃষ্টি করতে হবে। আজ যদি বেলকে (ইনি ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর সবচেয়ে স্পষ্টবাদী ও চিরস্থায়ী নাস্তিক) পাঁচশ কৃষকের শাসনের ভার দেওয়া হয় তা হলে তিনিও তখন ধর্মের প্রয়োজন বোধ করবেন''। ধর্মের বিরুদ্ধেই উপরোক্ত কথাগুলি সবচেয়ে প্রবল যুক্তি এবং এই যুক্তি ধর্মের পৃষ্ঠপোষকদেরই একজন প্রকাশ করেছেন। ধর্মের সপক্ষে এই যুক্তি স্বীকার করলে 'ভগবান ও ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ কি তা' বোঝা যায়।

যদি দার্শনিক বিপ্লব বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে ঘা দেয় এবং সেই স্বার্থ মানব সভ্যতার বিকাশের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় তা' হলে সেই বিকাশের পরিপূর্ণতার জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। তাই বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের ফলে যে সব দূরদর্শী নীতির সৃষ্টি হয় তাকে পুরোপুরি গ্রহণ করবার এবং ব্যাপক দার্শনিক মতবাদ হিসাবে গড়ে তোলবার ঐতিহাসিক প্রচেষ্টাকে বাধা দেওয়া অসম্ভব ছিল। আধুনিক দর্শন ছুটে চলেছে এক প্রচন্ড উন্মত্ততার ভাব নিয়ে। হেগেলীয় আদর্শবাদের মোহ আধুনিক দর্শনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সে সৃষ্টির বস্তুতান্ত্রিক ভাবকে অস্বীকার করে হেগেলীয় আদর্শবাদের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চায়। দর্শনের প্রকৃত মূল তত্ত্ব বস্তুর সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করবার জন্য হেগেল আধুনিক উচ্চ দর্শন বিনষ্ট করেন। সৃষ্টির দ্বৈতভাব ছাড়া আদর্শবাদ টিঁকতে পারে না। অদ্বৈতবাদ হয় বস্তুবাদে পরিণত হয় আর না হয় আত্মবাদ বা ধ্বংসবাদের শূন্যতায় পথ হারা হয়ে যায়; সৃষ্টির মৌলিক তত্ত্বকে আধ্যাত্মিক ভাবে ব্যাখ্যা করলে—এই বাস্তব জগৎ মায়া মরীচিকায় পরিণত হয়। কারণ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ছাড়া অন্য কাহারও পক্ষে অসীম শূন্যতা থেকে বস্তুর সৃষ্টি করা সম্ভব নয় অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বরই হন বস্তুর সৃষ্টি কর্তা। এই ভাবধারা ধর্মকে নিয়ে যায় শাসকের

পর্যায়ে এবং শাসকশ্রেণী আধ্যাত্মবাদকে নিজেদের খুসিমত কাজে লাগান।

সৃষ্টির সীমার বাহিরে আত্মা বিরাজ করতে পারে না। বিজ্ঞান ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের যুগে মানুষ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে সৃষ্টির এই অপূর্ব ক্রমবিকাশ এক অলীক স্বপ্ন বা মরীচিকা। সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্বকে বোধগম্য করতে পারে একমাত্র বস্তবাদী দর্শন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মানুষের চিন্তা ধারাকে এক অবনত অবস্থা থেকে উদ্ধার করে বাস্তব আদর্শবাদীগণ উন্নতির দিকে নিয়ে যান। তারা জগতের সমস্যাগুলিকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবার চেষ্টা করেন। শাসকশ্রেণীর দ্বারা শোষিত হয়ে ভূমিহীন শ্রমিক শ্রেণী বুঝতে পারে আধ্যাত্মবাদ কত ভুয়ো ও অবাস্তব। ভূমিহীন শ্রমিক শ্রেণী শুধু নিজেদের মুক্তির জন্যই আধ্যাত্মবাদকে অস্বীকার করেনি। বস্তুত এই শ্রেণী নিজেদের শাসক সম্প্রদায়ের শোষণ থেকে মুক্ত করে পৃথিবীকে স্বাধীনচেতা, শিক্ষিত ও সুখী মানবজাতির অনন্ত সভ্যতার ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তোলে; এর চেয়ে উচ্চ আদর্শ আর কি হতে পারে?

প্রকৃত বস্তুবাদীর জীবনে এমন কিছুই নাই যা মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, তাকে উন্নত করবার জন্য সে বিসর্জন দিতে পারে না। একজন বৈজ্ঞানিক—যে কোন কঠিন রোগের ওষুধ আবিষ্কার করবার জন্য তার সর্বস্ব — এমনকি অনেক সময় নিজের জীবন পর্যন্ত হাসিমুখে বিসর্জন দিতে পারে আর একজন সন্তুষ্টচিত্ত ধর্মভীরু যাজক যে সর্বদা নিজের পবিত্রতা রক্ষার জন্য ব্যস্ত এবং নিজের সত্ত্বার মধ্যেই বিরাজ করে ধর্মের মহানন্দে পরিতৃপ্ত—এদের দু'জনের মধ্যে কে প্রকৃত আদর্শবাদী? কে তার আদর্শকে বেশি শ্রদ্ধা করে—যে বিপ্লবী কর্মী মানুষের স্বাধীনতার জন্য অশেষ অনাচার, অত্যাচার সহ্য করে, অভুক্ত থেকে দিন যাপন করে— এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে কুণ্ঠিত হয় না— সে, না যে আয়েসি ধনী) উচ্চ ও মহৎ আদর্শের বুলি আওড়ায় এবং দাসত্ব, দারিদ্র, অজ্ঞানতা ও নৈতিক অধঃপতনের মূল যে সামাজিক ব্যবস্থা তাকে বজায় রাখতে প্রবৃত্ত—সে? নীতিবিদ ও মহাত্মারাই সাধারণভাবে জীবন যাপন করা ও সেই সঙ্গে উচ্চআদর্শবাদী হওয়ার কথা প্রচার করেন। এই প্রচার কার্যের ফলে ধনীদের প্ররোচিত বস্তুবাদের বিকৃত রূপকেই ভণ্ডামির সহিত সমর্থন করা হয়, কিন্তু এইসব লোকেরাই এইসব পবিত্র প্রচার কার্য সত্ত্বেও নিজেরা বেশ আমোদ প্রমোদের সহিত জীবন যাপন করেন এবং নিজেদের চিন্তাধারাকে কুপথে চালিত করেন। যদি কেউ বলে যে এই সব লোক ইচ্ছা পূর্বক ওসব করেন না (যদিও

সাধারণত তাই হয়ে থাকে) তবু ইহা সত্য যে তাঁদের উচ্চ ও পবিত্র আদর্শের ইহাই বাস্তব রূপ। আদর্শ বাদ একমাত্র বস্তুবাদের সংযোগেই প্রকৃত আদর্শবাদ হতে পারে।

বস্তুবাদীরা বাস্তব আদর্শবাদকে বাতিল করেন না। বরং তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে আদর্শবাদকে নিবিড় ও চিরন্তন ভাবে মানিয়ে চলেন। কিন্তু আধ্যাত্মবাদী—কি প্রাচ্যের কি পাশ্চাত্যের ধার্মিক ও দার্শনিক—সকলেই নিজেদের অত্যন্ত সঙ্কীর্ণচিত্ত করে রাখেন। বস্তুবাদীর এক মাত্র জীবনশক্তি হচ্ছে জীবনের আদর্শ। তাদের জীবনের সঙ্গে তাদের আদর্শের কোন পার্থক্য নেই। তাদের আদর্শ তাদের জীবন যাত্রার মধ্য থেকেই আপনা আপনি সৃষ্টি হয়। সেই আদর্শই তাদের সত্ত্বার একটি বিশেষ অংশ। বাস্তব আদর্শ তাই বস্তুবাদের সঙ্গে নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট এবং সেইজন্য তারা তাদের দার্শনিক মতবাদ ত্যাগ না করা পর্যন্ত তাদের আদর্শকেও ত্যাগ করতে পারে না।

শোষণ ও শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সমগ্রভাবে শাসক শ্রেণীর শোষণ ও তাদের কল্পনা প্রকৃত দার্শনিক ও নৈতিক আদর্শ "অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস" থেকে মুক্ত হবে। সুতরাং বিজ্ঞানের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি যা সমগ্র প্রাগ-জ্ঞান জনিত অধিকারকে অগ্রাহ্য করে—তা' একমাত্র শোষিত জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই সম্পূর্ণভাবে এবং সহজ ভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

যুক্তিবাদ জগতের সমস্যা গুলিকে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ ভাবে মানুষের বোধগম্য করে। বিপ্লবের নবীন নেতারা জগতের শেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শবাদী দার্শনিকের মতবাদের আশ্রয় নিয়েছেন। জগৎ পরিবর্তনশীল—এই চিন্তাধারা পরিবর্তনশীলতার উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। এই নূতন মতবাদ আধ্যাত্মবাদীদের সাধারণ যুক্তি তর্কবাদকে একেবারে অস্বীকার করে। বস্তুর পরিবর্তনশীলতা এবং পুরাতনের মধ্যে চিরন্তন নূতনের উদ্ভব—এই পরিবর্তনশীল বৈপ্লবিক যুক্তিবাদ সমস্ত প্রকার শোষণ থেকে সমাজকে মুক্ত করে এবং আধ্যাত্মবাদ বা ধর্মের আশ্রয় নিয়ে যে শাসক সম্প্রদায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল তাদের অধিকার চ্যুত করে। শোষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে এই বৈপ্লবিক যুক্তিবাদের চেয়ে আর কোন বড় অস্ত্র নেই।

হেগেলীয় চিরস্থির আদর্শবাদের ধ্বংসস্তুপ থেকে ফয়েরবাক্ পুরাতন দর্শনের প্রত্যক্ষজ্ঞান উদ্ধার করে ভবিষ্যৎ দর্শনের ভিত্তি স্থাপনা করেন।

কার্লমার্কস্ ও এঙ্গেলস্ তাঁদের জ্ঞানের বিশ্বকোষের সাহায্যে দু'শ বৎসরের বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতার উপর সৃষ্টির নূতন দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তৃত ভাবে প্রচার করেন। বস্তুবাদের সুস্পষ্ট দৃষ্টিতে প্রকৃতি, মানুষ ও মনুষ্য সমাজ এবং ইতিহাসের যতকিছু দুর্বোধ্য ধারণা তা সবই সহজ বোধগম্য হয়ে যায়; মানুষ নিজের শক্তিতে নিজের ভাগ্য বিধান করবার গৌরব অর্জন করে। আধ্যাত্মবাদের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে মানুষই হয় তার নিজের ভাগ্য বিধাতা।

বিজ্ঞান, দর্শন ও রাজনীতি
(Science, Philosophy and Politics)

সাধারণত একটা ধারণা আছে যে, বিজ্ঞান ল্যাবরেটারীতে চর্চা করা হয় এবং দর্শন হিমালয়ের উচ্চচূড়ায় বসে চিন্তা করা হয়, সুতরাং রাজনীতির মত নিম্নস্তরের বিষয়ের সহিত তাদের কী সম্বন্ধ? তাই প্রথমত দর্শন ও বিজ্ঞানের সঙ্গে রাজনীতির কী সম্বন্ধ তা' আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রচলিত ধারণা এই যে, যাদের কোন কাজ নেই এবং জীবনের কোন দিকেই কোন কিছু করতে পারেনি, সেই সব অকর্মণ্য, বেকার লোকদের কাজই হচ্ছে রাজনীতি করা এবং তাই এটা অত্যন্ত নোংরা কাজ। কাজে কাজেই সকলেরই ধারণা রাজনৈতিক ব্যাপারে যত কিছু খারাপ কাজই হয়ে থাকে, এবং এ ধারণা শুধু আমাদের দেশেই যে বিদ্যমান তা' নয় অন্যান্য দেশ সম্বন্ধেও ইহা অনেকাংশে সত্য। তার একটা কারণ এই যে, রাজনীতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা এতই মন্দ যে, তা নিয়ে কারবার কখনই পবিত্র, উন্নত বা আদর্শস্থানীয় হতে পারে না। সুতরাং রাজনীতি সম্বন্ধে স্বভাবতই লোকের ধারণা খুব বিকৃত। রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যেও অনেকের ধারণা নেই যে, রাজনীতি একটা বিজ্ঞান। যদিও ইহা একটা স্বাধীন বিজ্ঞান নয় তাহলেও রাজনীতি সমাজ বিজ্ঞান। অন্যান্য বিজ্ঞানের সাধারণত স্থির সংজ্ঞা আছে কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের কারবার হলো মানুষ নিয়ে যা সৃষ্টিজগতের মধ্যে সবচেয়ে অস্থির এবং পরিবর্তনশীল। অধুনা বিজ্ঞানের একটা মৌলিক সিদ্ধান্ত এই যে, অঙ্কের ভাষায় না প্রকাশ করতে পারলে কোনো মতবাদকেই বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া যাবে না। যদিও অঙ্কশাস্ত্র অজানা জিনিস নিয়ে গবেষণা করে তবুও কয়েকটি পরিচিত সংজ্ঞা ছাড়া গণিতশাস্ত্রের কোন সিদ্ধান্তই সম্ভব নয়। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান আজ পর্যন্ত সামাজিক জীবনে মানুষের আচার ব্যবহারের কোন পরিচিত সংজ্ঞা ঠিক করতে পারেনি। সামাজিক সমস্যা অঙ্কের আকারে

প্রকাশ করা যায় না, তাই রাজনীতিকেও বিজ্ঞান বলা যেতে পারে না।

প্রচলিত ধারণা হলেও ইহাই একমাত্র সত্য নয়। অনেকের মতে সমাজেরও বিজ্ঞান সম্ভব; মানুষের আচার ব্যবহারের কিছু কিছু নির্দিষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া যায়, যা থেকে সামাজিক সমস্যা, মানুষের সামাজিক জীবনের ব্যবহার ইত্যাদির সমস্যা প্রায় অঙ্কের মতই বিচার করা যাবে। মানুষের সামাজিক জীবনের আচার ব্যবহারের নিয়মাদি যে বিজ্ঞান ধার্য করে তাই হচ্ছে রাজনীতি। কিছু নির্দিষ্ট সংজ্ঞা বা মানুষের ব্যবহারের কোন মাপকাঠি না থাকলে সামাজিক জীবনের কোন সূত্র রচনা করাই সম্ভব নয়। যতদিন রাজনীতিকে বিজ্ঞান থেকে পৃথক ভাবে দেখা হবে, ততদিন রাজনীতির মধ্যে যৌক্তিকতা থাকবে না বা তার কোন মূল সিদ্ধান্ত বা সংজ্ঞাও পাওয়া যাবে না। কিন্তু রাজনীতি আর বিজ্ঞানের মধ্যে সেই পার্থক্য আজ আর নেই। এখন আর মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে অপ্রাকৃতিক ভাবে বিজ্ঞানের চর্চা সম্ভব নয়, তাছাড়া এখন দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যেও যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে এবং রাষ্ট্রদর্শনের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। তবে এখনও এমন অনেকে আছেন যাঁরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে মেনে নেন না।

সাধারণত এই ধারণা প্রচলিত আছে যে, দর্শন ও বিজ্ঞান দুইটি ভিন্ন শাস্ত্র এবং ইহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নেই। বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হলো জড় জগত আর দর্শনের বিষয়বস্তু পরমার্থিক জগত, সুতরাং এদের মধ্যে কোন যোগাযোগ বা সম্বন্ধ থাকা শক্ত; যদি এই দুই শাস্ত্রের মধ্যে কোন সম্বন্ধ না থাকে) তাহলে আমরা একথা বলতে পারি না যে, রাষ্ট্র বিজ্ঞান রাষ্ট্রদর্শন দ্বারাই ধার্য হয়।

আবার অনেকের মতে রাষ্ট্রীয় সমাজে মানুষের আচার ব্যবহারের মোটামুটি ভাবে কয়েকটি সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা' কোন কাজে লাগে না; যেমন গণতন্ত্র। গণতন্ত্রের মতো আজ আর কোন আদর্শই এত হেয় নয়। প্রায় একশো বৎসর ধরে গণতন্ত্রই ছিল রাষ্ট্রদর্শনের মৌলিক আদর্শ; আর আজ তা সর্বত্রই অশ্রদ্ধেয়। এই থেকে মানুষের ধারণা জন্মেছে যে, গণতন্ত্র মাত্রই কাল্পনিক আদর্শ; কোনদিনই তা বাস্তবে পরিণত হতে পারে না। অবশ্য ইহা খুবই যুক্তিসঙ্গত যে সামাজিক জীবনের নিয়ম-কানুন রচনায় প্রত্যেকের অধিকার থাকা উচিত কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সেই অধিকার অলৌকিক কল্পনাই থেকে যায়। বস্তুত দেখা যায় যে, সমষ্টিগত জীবনে মানুষ মেষের মত ব্যবহার

করে এবং গড্ডালিকার মতই একাধিপত্য শাসনের বশীভূত।

মানুষের সামাজিক জীবন থেকে এই যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে-তাতে করে মনে হয় যে, রাষ্ট্রদর্শনের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ নেই। আদর্শ সমাজের কতকগুলি সুন্দর সুন্দর নিয়ম কানুন রচনা করা যায় কিন্তু তা সবই অবাস্তব, অপ্রাকৃতিক - বর্তমান সমাজে তার প্রয়োগের কোন উপায় নেই। মানুষের স্বভাব অপরিবর্তনীয়, অবিনশ্বর, এবং সেইজন্যই মানুষের সমাজও এই ভাবে চিরকাল থাকবে কোন পরিবর্তন হবে না - ইহাই সাধারণ মত। কাজে কাজেই সেই সব সিদ্ধান্তগুলি কখনও বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় না এবং ধরে নেওয়া হয় যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তিতে সামাজিক জীবন গড়ে তোলা বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্ভবপর নয়।

এই ধারণা দূর করবার জন্য আমাদের বিজ্ঞান ও দর্শনের সম্বন্ধ কী, এই মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং জানতে হবে যে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে অবাস্তব জীবনের আদর্শের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রগতির ইতিহাস এখনকার প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই সুবিদিত। এটা প্রায় সকলেই বিশ্বাস করে যে বিজ্ঞানের উন্নতির দ্বারা এমন পরিস্থিতির সূচনা হবে যাতে করে সাধারণের জীবনধারণের সুখ সুবিধা অনেক বেড়ে যাবে; কিন্তু জীবনের যে অন্যান্য সমস্যা (সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য ইত্যাদি) যা থেকে দর্শনের উদ্ভব হয়েছে তা, বিজ্ঞান সমাধান করতে পারেনা। সুতরাং বিজ্ঞান সৃষ্টির মূল সমস্যা গুলিকে মাত্র ওপর ওপর স্পর্শ করে, তার সমাধান করতে অক্ষম।

তাই প্রথমেই আমাদের এই ভ্রান্তিটি দূর করবার জন্য দেখাতে হবে যে, যেমন সিদ্ধান্ত ও কার্যসূচীর মধ্যে মৌলিক কোন প্রভেদ নেই তেমনি বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যেও কোন প্রভেদ নেই। দর্শন যদি অপ্রাকৃতিক স্তর থেকে বাস্তবে নেমে এসে জীবনের সমস্যার সম্মুখীন না হয় তাহলে মানুষের দর্শনের কোন প্রয়োজন নেই। যদি ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও কার্যকলাপের সমস্যাগুলির সঙ্গে দর্শনের কোন যুক্তিযুক্ত সম্বন্ধ না থাকে তাহলে মানুষের কাছে দর্শন শুধু ভুয়ো কল্পনা এবং তা মানুষের কোন কাজে আসে না।

সাধারণত একটা ভুল ধারণা আছে যে, বিজ্ঞান তো সেদিনের জিনিস। কিন্তু আসলে বিজ্ঞান সৃষ্টির গোড়া থেকেই আছে; এবং ইহা দর্শন অপেক্ষা প্রাচীনও

নয় বা নূতনও নয়। দর্শনের শুরুই বিজ্ঞানের শুরু। বরঞ্চ দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকলে ইহাই দেখা যায় যে, বিজ্ঞান দর্শন অপেক্ষাও প্রাচীন। অন্তত বিজ্ঞানের যে প্রচেষ্টা, পদার্থিক ঘটনাবলীর কারণ জানবার জন্য যে উৎসুক্য (যার থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের সৃষ্টি) সেই উৎসুক্য দর্শনের চেয়েও আদিম। এই উৎসুক্য থেকেই দর্শনের সৃষ্টি নয় কি?

মানুষ শুধু জড়জগত নিয়েই ব্যাপৃত থাকে না, সাধারনত ইহাই ধরে নেওয়া হয় যে, অপ্রাকৃতিক নৈস্বর্গিক প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করাই মনুষ্য-জন্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রাচীন ইতিহাস পুরাতন পুঁথি ও ঘটনাবলীর থেকে এবং এখনও যে সব অসভ্য, অনুন্নত সমাজ আছে তার সঙ্গে আধুনিক কালের সভ্য ও উন্নত সমাজের তুলনা করলে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাই যে, আদিম মানুষের মনে তার অস্তিত্বের বাইরে যে কোন অলৌকিক শক্তি আছে এই ধারণা কোনদিন আসেনি। ঈশ্বর এবং আত্মার ধারণা আদিম মানুষের চিন্তাশক্তি এবং কল্পনার বাইরে। তাই সে আদিম মানুষ। এই আদিম মানুষই আমাদের পূর্বপুরুষ। যদি ঐশ্বরিক শক্তির উপলব্ধির ইচ্ছাই মনুষ্য জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় এবং এই ইচ্ছা যদি আমাদের মধ্যে অমর আত্মা হিসাবে বিরাজ করে তাহলে তার প্রকাশ আদিম মানুষের মধ্যেও পাওয়া যাবে। তা যখন যায় না, তখন ধরে নিতে হবে যে ঈশ্বর জিজ্ঞাসার উৎসুক্য বা প্রচেষ্টা সামাজিক বিবর্তনের কোন এক সন্ধিক্ষণে মানুষের মনে প্রবেশ করে।

সেক্ষেত্রে আমরা কি করে প্রমান করতে পারি যে, আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও দর্শনের আদি এবং মূল সমস্যা - কেন এবং কি করে এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি হয়েছে? ভারতবর্ষ, মিশর, গ্রিস এবং চিন দেশে, অর্থাৎ যে সমস্ত দেশ শিক্ষা ও জ্ঞানে অন্যান্য সব দেশ অপেক্ষা অগ্রদূত এবং উন্নত ছিল সে সব দেশের প্রাচীন ইতিহাস থেকেও আমরা এই পাই যে, সেখানকার বুদ্ধিজীবিরাও এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। তারাও এই জীবনের পরে কি আছে সে সম্বন্ধে চিন্তা করতো। এসব থেকে এই ধরে নেওয়া হয় যে, মানুষ প্রথম থেকেই অলৌকিক, পরমার্থিক এবং অপ্রাকৃতিক ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসু। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, ভারতীয় সমাজ যেমন কনদ ও কপিল থেকে শুরু নয়, গ্রিক সমাজও তেমনি থেলস, ডেমোক্রাইটস বা প্লেটো, সক্রেটিসকে নিয়েই শুরু হয়নি। ভারতীয় সমাজে যেমন আদিম অধিবাসীরা ঋগ্‌বেদের ঋষির চেয়ে

প্রাচীন-গ্রিসেও সেই রকম ওইসব মহা ব্যক্তিদের আগেও মনুষ্যসমাজ ছিল। তাদের চিন্তা ধারা এবং তাদের আধ্যাত্মিক প্রতিভা সম্বন্ধে গবেষণা করলে দেখতে পাই দর্শনের মূল সমস্যা বলে যে সব জিনিস অধুনা প্রচলিত তা' সৃষ্টির শুরু থেকেই ছিল না।

দুর্ভাগ্যবশত, লিখিত পুঁথিপত্র শেষ পর্যন্ত না থাকায়, আমরা সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসের গোড়ার ব্যাপার জানতে পারিনা। বৈদিক যুগের পূর্বে ভারতবর্ষের অধিবাসীরা কি ভাবে বাস করতো, কি চিন্তা করতো এবং কিই বা তাদের আচার ব্যবহার ছিল সে সম্বন্ধে কোন লিখিত ইতিহাস নেই। সেই রকম অন্যান্য দেশেরও এই এক অবস্থা। সুতরাং আদিম মানুষের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে গবেষণা করতে হলে তার দুটি উপায় ঃ প্রথমত আমরা ইতিহাস থেকেই পাই যে, দর্শনের প্রবর্তকেরা অপ্রাকৃতিক ব্যাপার সম্বন্ধেই চিন্তিত ছিল। কতকগুলি পদার্থিক ঘটনাই মানুষের চিন্তাশক্তিকে সজাগ করে তোলে; সেই সব পদার্থিক ব্যাপারের কারণ জানবার জন্য মানুষ উৎসুক হয়ে ওঠে এবং এই উৎসুক্য থেকেই দর্শনের মৌলিক সমস্যার উদ্ভব হয়।

আজকের সভ্য জগতে বাস করে আমরা ভাবতেই পারিনা যে, মানুষের জীবনের সঙ্গে রৌদ্র, বৃষ্টি, বন্যা, ঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনার কি নিগূঢ় সম্বন্ধ। কিন্তু বর্তমান যুগেও যদি আমরা শহরের বাইরে বনে জঙ্গলে বা পাহাড়-পর্বতে যাই তাহলে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের কি নিবিড় সম্বন্ধ তা' বুঝতে পারবো। সেখানে প্রাকৃতিক ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষা পাবার কিছুই নেই। আগুনের দরকার হলে হয়তো দিয়াশলাই নাও থাকতে পারে তখন পাথরে পাথরে ঘষে আমাদের আগুন জ্বালাতে হবে; এবং এই রকম আরো সব প্রাকৃতিক ঘটনার ভীষণ রূপের সম্মুখীন হতে হবে। আজ আমাদের আগুনের দরকার হলে আমরা দিয়াশলাই, গ্যাস বা ইলেকট্রিক থেকে পেতে পারি। আজ আমাদের বনভোজনে গিয়ে পাথরে পাথরে ঘষে আগুন জ্বালাতে আমোদ লাগে, কিন্তু আদিম মানুষের কাছে এটা মজার ব্যাপার ছিল না, এটা তাদের কাছে জীবন-মৃত্যুর মত ব্যাপার। আদিম মানুষ পাথরে পাথরে ঠুকে আগুন জ্বালতে বই পড়ে শেখেনি। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাকে এটা বার করতে হয়েছিল। যখনই দরকার তখনই আগুন জ্বালাবার সমস্যা তাকে আগুনের স্থায়ী উপায় বার করতে প্রবৃত্ত করে। এই থেকে আগুনের কারণ সম্বন্ধে নানান অনুমানের শুরু হয় এবং এই রকম

প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক ব্যাপারই আদিম মানুষের অনুসন্ধিৎসু ঐশ্বরিক কল্পনায় শেষ হয় আর তার থেকেই অগ্নি বায়ু প্রভৃতি প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ হিসাবে এক একটি ভগবানের সৃষ্টি হয়।

এই ভাবে গবেষণা এবং অনুসন্ধানের শুরু হয়। এই গবেষণা শুধু মূল সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য বা শুধু জ্ঞান পিপাসার জন্য আরম্ভ হয়নি) মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্যই প্রধানত ইহার শুরু। এবং এই প্রয়োজন পদার্থিক পরিবেশের মধ্যেই নিহিত।

অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতেও ইহার গবেষণা সম্ভব। জীবতত্ত্বের ঐতিহাসিক গবেষণার দ্বারা আমরা জীবের সৃষ্টির গোড়ার কথা জানতে পারি। বিভিন্ন জীবের মধ্যে পার্থক্য মোটামুটি দুই রকম ঃ দৈহিক আকৃতির পরিবর্তন এবং ব্যবহারের মধ্যে পরিবর্তন। কি ভাবে আকৃতি পরিবর্তন হচ্ছে এবং সেই পরিবর্তন পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির উপর কি ভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে? জীবনের প্রথম সঙ্কেত পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সহিত সংঘাত। জড়বস্তুর সংগে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত প্রতিঘাত হয় না, একমাত্র জীবজগতেই তা' হয়। তাই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত ঘাত প্রতিঘাতই জীবনের প্রথম নমুনা।

মানুষ জীবেরই প্রগতির বিকাশ এবং এই নূতন জীব নূতন ভাবে পরিবেশের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই নূতন ভাব বুদ্ধি-জ্ঞাত। অনুন্নত জীবের মধ্যেও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বুদ্ধি বা মনই সবথেকে প্রধান। মানুষের বেলায় এই ঘাত প্রতিঘাত যান্ত্রিক ভাবে ঘটে না; মূলত যান্ত্রিক হলেও, জানবার ইচ্ছা থেকেই সৃষ্টি। জানবার প্রাথমিক প্রচেষ্টাই বিজ্ঞানের শুরু। বিজ্ঞান কথাটার মানেই হলো) জানবার ইচ্ছা বা জ্ঞান। পদার্থিক ঘটনাবলীর কারণ জানবার ঔৎসুক্যই বিজ্ঞানের প্রেরণা, এই বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা ক্রমশ অপ্রাকৃতিকতায় এসে পৌঁছায়। অন্য কোনরকম প্রাকৃতিক, বৈজ্ঞানিক, সোজা কারণ না পেয়ে, আদিম মানুষকে পদার্থিক ঘটনার অলৌকিক ঐশ্বরিক কারণই নির্দেশ করতে হয়। এইসব অনুমানও বৈজ্ঞানিক গবেষণার অবিচ্ছিন্ন অংশ। অনুমান ছাড়া কোন গবেষণার শুরু হয় না। ক্রমশ অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে হয় অনুমানটি ভুল প্রমাণিত হয়ে তাহার প্রকৃত কারণ পাওয়া যায়, আর না হয় অনুমানটির স্বপক্ষে বৈজ্ঞানিক কারণ ও যুক্তি পাওয়া যায়। যতদিন যান্ত্রিক বিজ্ঞান এবং মানুষের বুদ্ধি অনুন্নত অবস্থায় থাকে, ততদিন অলৌকিক এবং

অপ্রাকৃতিক অনুমান অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এগুলিকে অনুমান অপেক্ষা বেশি কিছু বলা যায় না।

পদার্থিক ঘটনার আনুমানিক অলৌকিক কারণ নির্ধারণ করার আদিম মানুষের এই প্রচেষ্টা বৈজ্ঞানিক ঔৎসুক্যের পরিচয়। ইহার ভিত্তি হলো এই যে, প্রত্যেক ঘটনারই কোন না কোন কারণ আছে, শূন্য থেকে কিছুই ঘটতে পারে না।

মানুষের সমস্ত অস্তিত্বই তার পারিপার্শ্বিক পদার্থিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। মানুষ ক্রমশ অনুভব করে যে, ইহাদের উপর অধিকার এবং প্রভাব বিস্তারই মানুষের জীবনের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপায়। কিন্তু অধিকারের জন্য ক্ষমতা চাই এবং ক্ষমতা নির্ভর করে জ্ঞানের উপর। যেমন ধরা যেতে পারে বৃষ্টি। বৃষ্টি জমির উর্বরতা আনে এবং তবেই মানুষ তার খাদ্য শস্য জন্মায়। এই জন্য সময়মত বৃষ্টির প্রয়োজন, এবং বৃষ্টি না হলে শস্য শুকিয়ে যায়। মানুষ যদি জানতে পারে যে, কি জন্য বৃষ্টি হয় এবং কোন সময়ে হয়, তাহলে ঠিক সেই সময় সে তার জমি চাষ করতে পারে এবং তাহলে শস্য শুকিয়ে যাবার আর ভয় থাকে না এবং তাহলে আর সে বৃষ্টির অনুগত হয়ে, অসহায় হয়ে পড়বে না। কি জন্য বৃষ্টি হয় তা' যদি মানুষ জানে তাহলে কখন বৃষ্টি হবে তাও সে জানতে পারবে। এই রকম অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধেও একথা খাটে।

বিবর্তনের প্রথম যুগে, মানুষের জ্ঞান ছিল সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ। তখন প্রাকৃতিক ঘটনার কোন রকম পার্থিব কারণ নির্দ্ধারণ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু দেখা গেল, প্রত্যেক বৎসরই একই সময়ে বৃষ্টি পড়ে, নদী সবসময়েই নীচের দিকে বয়ে যায়, ঠিক সময়ে রাত্রি আসে, প্রতিদিনই ঠিক সময়ে সূর্য ওঠে। মানুষ তার নিজের কার্যকলাপের মধ্যেও এক অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখতে পায়। প্রতিদিন সকালে সে ওঠে, রাত্রে শুতে যায়, কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর তার ক্ষিদে পায়) কিন্তু এসব তাকে জীবতত্ত্বের বিজ্ঞান দিয়ে জানতে হয় না, সহজাত ইচ্ছার সাহায্যেই সে এসব জানতে পারে এবং সেই ইচ্ছার জন্যই সে এসব করে। এই ঘটনাবলীর পিছনেও এক ইচ্ছা-শক্তি আছে। পৃথিবীতে সমস্ত ঘটনাই নিয়মাধীন। মানুষ এই সব ঘটনার কর্তা নয় এবং হতে পারে না। শক্তিশালী কেউ নিশ্চয়ই এর মূলে আছে, এই ভেবে আদিম মানুষ তার নিজের অনুপাতে ভগবানের সৃষ্টি করে। এইভাবে বৃষ্টির ভগবান, সূর্য দেবতা, বায়ু দেবতা ইত্যাদি এক একটি ভগবানের

সৃষ্টি হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পদার্থিক ঘটনাবলীর কারণ জানবার ইচ্ছা থেকেই অলৌকিকতা এবং ঈশ্বর-অনুমানের সৃষ্টি। ভাল ভাবে বেঁচে থাকবার ইচ্ছা থেকেই এই জানবার প্রচেষ্টার শুরু। সুতরাং দর্শন আমাদের জীবন যাত্রা এবং জীবনের সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন বা বিজ্ঞান থেকে একেবারে পৃথক কোন শাস্ত্র নয়। দর্শনও বিজ্ঞান এবং দর্শন কথাটার মানেই হলো জ্ঞানের ইচ্ছা। যাঁরা শিক্ষা করে পড়া শুনো করে পৃথিবীর সমস্ত জিনিস জানতে উৎসুক, এবং এই নিয়েই ব্যপৃত থাকেন তাঁদেরই প্রথম দার্শনিক আখ্যা দেওয়া হয়। তাঁরাই বিজ্ঞানের স্রষ্টা।

আমরা সংস্কৃত পাঁজিপুঁথি থেকে জানতে পারি যে, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য জড়জগত সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা এবং দর্শনের উদ্দেশ্য আত্ম বা আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান অর্জন করা। কিন্তু এইসব অনুমান নিস্প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞানের অর্থ উচ্চতর জ্ঞান, অর্থাৎ ভুয়ো দার্শনিক বা কল্পনামূলক চিন্তাধারা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ, সত্য জ্ঞানই হলো বিজ্ঞান। অপর অর্থে বিজ্ঞান বলতে কোন বিশেষ বিষয়ে জ্ঞান এবং তাই প্রচলিত অর্থে দার্শনিক জ্ঞান অপেক্ষা নিকৃষ্ট স্তরে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের প্রবর্তক কনদ ও কপিল, তাঁদের দর্শন কল্পনার উপর ভিত্তি করেন নি, জড়জগতের বিশ্লেষণের উপর গড়ে তুলেছিলেন। জড় জগতকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করে তাঁরা তাঁদের বিশ্লেষণ শুরু করেন। জড় জগতের জ্ঞান থেকেই তাঁরা পার্থিব ঘটনার যত কিছু কারণের অনুসন্ধান করেন। এতে করে বিজ্ঞানকে তাঁরা দর্শনের উচ্চে স্থান দেন; এবং দর্শনকে তাঁরা বিজ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে তোলেন।

দর্শন ও বিজ্ঞানের এই সম্বন্ধ পাশচাত্য ইতিহাসে আরও স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। গ্রিক দর্শনের স্রষ্টা থেলস জড় জগতের কারণ অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, পদার্থিক ঘটনার কারণ পদার্থিকই হবে। তিনি জলকেই মূল বা আদি বস্তু হিসাবে ধরেন এবং তাঁর মতে সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিই জল থেকে। তাঁর সমসাময়িক হেরাক্লিটাস্ সব কিছুর আদি হিসাবে ধরেন অগ্নি। প্রাচীন ভারতের তত্বজ্ঞানী দার্শনিকেরা এবং আদিম বৈজ্ঞানিকেরা কিছু পার্থিব ব্যাপারকে "পঞ্চভূতের" সৃষ্টি বলিয়া ধরেন। পদার্থিক জগতের সম্বন্ধে তৎকালীন

অনুসন্ধান ও গবেষণার লিপি হিসাবেই উপনিষদের বৈশিষ্ট্য। অনেকের মতে অগ্নিই হচ্ছে সব কিছুর মূল; অনেকের মতে জল, আবার অনেকে ব্যোম, অনেকে আকাশ ইত্যাদিকে মূল বলে ধরেন। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই শুরুতে পদার্থিক ব্যাপারের কারণ পদার্থিক বলেই কল্পনা করা হয়, এবং পদার্থিক ঘটনাবলীকে এক মৌল পদার্থিকতায় পরিণত করবার চেষ্টা করা হয়।

কিন্তু জ্ঞান অর্জন করার সম্ভাবনা নির্ভর করে তৎকালীন অর্জিত জ্ঞানের উপর। সেই প্রাচীন কালে মানুষের জ্ঞান এত কম ছিল যে, সেই সব আদিম গবেষণার দ্বারা নূতন জ্ঞান অর্জন করা কষ্টসাধ্য ছিল। কিন্তু এই জ্ঞানার্জনের ঔৎসুক্য মানুষের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাই শত বাধা সত্ত্বেও, মানুষের গবেষণা ও অনুসন্ধান চলে আসে, অজানা রহস্যকে উদ্‌ঘাটন করবার প্রচেষ্টা পুরোদমে চলে ইহাই মানুষের জীবন এবং জীব শক্তি। কোন না কোন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক কারণের প্রয়োজন যাতে করে মানুষ সব কিছু ব্যবস্থা করতে পারে ইহাই আনুমানিক তত্ত্বজ্ঞানজনিত দর্শনের গোড়ার কথা। গোড়াতে অনুমানের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। আদিম যুগে বহু ভগবানের কল্পনা করা হতো; পরে প্রশ্ন ওঠে এইসব দেবতাকে সৃষ্টি করে এবং তাই থেকে একেশ্বরের প্রচলন হয়। এই থেকে আরও অনেক বিতর্কের পর বহু ধর্মের সৃষ্টি হয়। কেন ভগবান এই নির্দিষ্ট ভাবে জগতকে পরিচালনা করেন ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে এক এক ধর্ম বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। দেবতাকে যখন জড়জগতের স্রষ্টা হিসাবে কল্পনা করা হলো তখন মানুষের স্বাভাবিক যুক্তির বশেই সে দেবতার বিষয় জানতে উৎসুক। তাই থেকে ঈশ্বরবাদের সৃষ্টি।

ক্রমশ ধর্মাত্মক দর্শন বা ঐশ্বরিক বিজ্ঞানের সৃষ্টি ও প্রচলন হয় এবং মানুষ আবার বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করে। এই বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ঔৎসুক্য থেকেই মানুষের সামাজিক বা আধ্যাত্মিক জীবনের শুরু। আদিম প্রচেষ্টায় মানুষ বাস্তবিক সংজ্ঞা দিয়ে পদার্থিক ঘটনাবলী সমর্থন না পেয়ে, অনুমানিক কারণের সৃষ্টি করে কিন্তু এই অনুমানও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ঔৎসুক্যের পরিচায়ক। অভিজ্ঞতার সাহায্যে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। মানুষ যেমন করে আগুন জ্বালতে শেখে, সেই ভাবে প্রত্যেক ঘটনার কারণ এবং যে নিয়মের তারা অনুগত তা' জানতে পারে। এবং এই ক্রমোবর্দ্ধিত জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ প্রাকৃতিক ঘটনাবলী পদার্থ-বিজ্ঞান দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারে। সে জানতে পারে কি জন্য

বৃষ্টি হয়, বাতাস কেন বয় ইত্যাদি এবং এর ফলে ঐশ্বরিক কারণ দূরীভূত হয়।

আদিম কালে, অজ্ঞানতা মানুষকে পদার্থিক ঘটনার ঐশ্বরিক কারণ-অনুমান করতে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এক একটি ঘটনার এক একটি দেবতা তৈরি করতে বাধ্য করে। পরে, জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, মানুষ সেই সব ঘটনা সহজ, সরল ভাবে, পদার্থিক নিয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতেও সমর্থ হয় এবং তার আর ভগবান সৃষ্টি করবার প্রয়োজন হয় না। মানুষ নিজেই যেমন ভগবানের স্রষ্টা, মানুষ নিজেই তেমনি তার নিরর্থক অপ্রয়োজনীয় সৃষ্টিকে আবার ধ্বংসও করে ইহাই হলো বিজ্ঞানের সার কথা। আজ যা খুব স্পষ্ট এবং সত্য বলে মনে হচ্ছে, তা শুধু আজকের জন্যই। যদি কাল আমরা দেখতে পাই যে, তা সত্য নয়, তার চেয়ে অধিক জ্ঞান আমরা পাই, তাহলে সেই পুরাতন অনুমানকে অগ্রাহ্য করে, নূতন সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবার ইহাই বিজ্ঞানের সার তথ্য। এক সময়ে নিউটনের কথাই ছিল বিজ্ঞানের শেষ কথা।

বৈজ্ঞানিকদের কাছে তিনি দেব-স্বরূপ ছিলেন। আজ তিনি সেকেলে, অনর্থক হয়ে পড়েছেন। শুধু ইহাই নয়, বিজ্ঞানের বহু প্রাচীন নিয়ম কানুন, যুক্তি-তর্কই আজ নিরর্থক। জ্ঞানের কোন সীমা নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, জ্ঞান কখনও সেকেলে, বা অকেজো হয়ে পড়ে না। পুরাতন জ্ঞানের ভিত্তিতেই নূতন জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার দেহের ব্যবহারিক এবং উপযুক্ত গঠনের মধ্যেই ইহা শুরু হয় এবং সেই থেকে জ্ঞান বাড়তেই থাকে। দর্শন এবং বিজ্ঞান - এ দুয়েরই এই প্রণালীর সহিত সংশ্লিষ্ট। জ্ঞানার্জনের আধার হলো বিজ্ঞান, এবং নূতন জ্ঞানার্জনের জন্য অর্জিত জ্ঞানকে নিয়মাবদ্ধ, শৃঙ্খলা বদ্ধ করার কাজ হলো দর্শনের ।

পার্থিব জীবন থেকে পৃথকভাবে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। সমস্ত জ্ঞানই মানুষের জীবনের এক বিশেষ অংশ। দৈহিক প্রক্রিয়াই হলো জ্ঞানের আধার এবং দৈহিক প্রক্রিয়া যান্ত্রিক ঘাত-প্রতিঘাতের উপরই নির্ভর করে। জ্ঞানার্জনের মধ্যে অলৌকিক, অপ্রাকৃতিক ব্যাপার কিছুই নাই। মস্তিষ্ক দেহের একটি যন্ত্র বিশেষ, আর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিও পদার্থক। ইহার মধ্যে অপ্রাকৃতিক কিছুই নাই, যেমন আয়নায় নিজের চেহারা দেখা।

প্রকৃত জ্ঞানই হলো বিজ্ঞান। যদি জ্ঞান এবং বিজ্ঞানকে পৃথক পৃথক ভাবে

দেখতে হয়, জ্ঞানকে মানসিক বোধ বা বোধশক্তি হিসাবে ধরা যেতে পারে। বোধশক্তি জ্ঞানের চেয়ে বড় কখনই নয়। জ্ঞান অর্জন করা শিক্ষাসাপেক্ষ এবং তা বোধশক্তি অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের। বোধশক্তি তো আদিম জীবের মধ্যেও আছে কিন্তু জ্ঞানার্জনের, সমস্ত ব্যাপারের তথ্য জানার ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই আছে। নিম্নতর জীবেদের মধ্যে বোধশক্তি ও বুদ্ধি বহুস্তরে বিভক্ত। এবং জ্ঞান -এই বোধশক্তি ও বুদ্ধির উচ্চতর, প্রকৃষ্টতর রূপ; বোধশক্তির ব্যাপক রূপ। বোধশক্তি জীবের এবং জৈবিক অস্তিত্বের বিশেষ অঙ্গ। সুতরাং জ্ঞান যদি শুধুমাত্র বোধশক্তি হয়, তাহলে বিজ্ঞানকে আরও উঁচুতে স্থান দিতে হয়।

এইদিক দিয়ে বিচার করলে দর্শনের চেয়ে বিজ্ঞান বড়। কিন্তু দর্শনকে যদি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমষ্টি হিসাবে ধরা হয়, তাহলে দর্শনকে আরও উঁচুতে স্থান দেওয়া যায়। প্রাচীন বলেই বিজ্ঞানের চেয়ে জ্ঞান বড় নয়; জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে যে জ্ঞানের সৃষ্টি হয়, তার সমষ্টিগত প্রকাশ হিসাবে জ্ঞান বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেয়।

রাজনীতির সঙ্গে এই আলোচনার সম্বন্ধ এই যে, রাজনীতি বা বিপ্লব বলতে সাধারণ লোকে বোঝে মারামারি, কাটাকাটি, অত্যাচার, পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেওয়া। এই সব ভ্রান্ত এবং বীভৎস ধারণা থেকে রাজনীতিকে মুক্ত করতে হবে। তবে রাজনীতি কাজে আসবে।

বিপ্লব বা বিপ্লবী বলতে কী বুঝায়? পৃথিবী যে কোন অলৌকিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত নয় এবং আজ যে অবস্থায় পৃথিবী আছে মানুষ নিজের শক্তিতে তাকে উন্নত এবং নূতন করে গড়ে তুলতে পারে) এই ধারণা যার আছে সেই বিপ্লবী। বিপ্লবী আরও বলে যে, পৃথিবীকে বহুবার নূতন করে গড়া হয়েছে এবং প্রয়োজনের তাগিদেই তা' করা হয়। ভারতবর্ষের যে সব লোক আমাদের দেশকে নূতন করে গড়ে তোলবার প্রয়োজন অনুভব করেছে এবং বিশ্বাস করে যে, ভারতের জনসাধারণের সেই শক্তি আছে, তারাই হলো বিপ্লবী। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যতিরেকে কেউই বিপ্লবী হতে পারে না, প্রকৃত বিপ্লবী হতে হলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। বিপ্লবী হতে হলে এই দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন যে মানুষ শুধু জগতকেই নতুন করে গড়তে পারে তাই নয়, মানুষ ভগবানকেও তৈরি করতে পারে, ধ্বংসও করতে পারে এবং সৃষ্টির শুরু থেকেই

তা' করে আসছে। মানুষের প্রকৃতিই হচ্ছে ভগবান প্রতিষ্ঠা করা, তাকে পুনশ্চ ধ্বংস করা এবং নূতন দেবতার সৃষ্টি করা।

সমাজের বিবর্তনের সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় গঠনে কতকগুলি মূল সিদ্ধান্ত রচনা করা হয়। যদি সেই সিদ্ধান্তগুলিকেই আমরা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় বলে মনে করি তাহলে জগতকে নূতন করে গড়ে তোলবার প্রশ্ন ওঠে না। বিবর্তন-ভীরু লোকেরা বিপ্লবীদের হয় পাগল না হয় কল্পনাবিলাসী মনে করেন। কিন্তু রাজনৈতিক সূত্রগুলি শুধুই কল্পনা-মূলক নয়, মানুষের দৈনন্দিন সামাজিক জীবনের অবস্থার উপরই তার ভিত্তি এবং সেই সামাজিক অবস্থার প্রতীক হলো প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। সুতরাং রাষ্ট্রীয় রীতিনীতির মূলগত ব্যবহারিক সংজ্ঞা আছে। সামাজিক অবস্থার মত রাষ্ট্রীয় রীতিনীতিও মানুষের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট; তাই যখনই প্রচলিত সমাজব্যবস্থা অসহ্য হয়ে ওঠে তখনই আমরা তাদের পরিবর্তন করতে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু আমাদের যদি এই দৃঢ় বিশ্বাস না থাকে যে, আমরা তাদের পরিবর্তন করতে পারি) তাহলে আমরা এর প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করতে পারি না। আমরা যদি গোড়াতেই ধরে নিই যে, সমস্ত কিছুই পূর্বকল্পিতভাবে এবং ঐশ্বরিক ইচ্ছা অনুযায়ী ঘটে তাহলে আমরা সেই সামাজিক ব্যবস্থা বা প্রচলিত রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তগুলি পরিবর্তনের কোন প্রয়াস পাই না। ভগবদ্ ভয়ে ভীত লোক কখনও ভগবানের সৃষ্টিকে পরিবর্তন করার উৎসাহী হতে পারে না। পরিবর্তন করার ইচ্ছা আমাদের তখনই আসতে পারে যখন আমরা জানতে পারি যে, ভগবান আমাদেরই সৃষ্টি এবং আমরা ইচ্ছানুযায়ী যে কোন দেবতাকেই তার উচ্চাসন থেকে নামাতে পারি। যখনই আমরা উপলব্ধি করি যে, আজকের জগত যা হওয়া উচিত তা নয়, এর আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন, তখনই, আমরা তার স্রষ্টা ঈশ্বরকেও অকর্মণ্য, অনুপযুক্ত বলে সরিয়ে দিতে পারি। যখনই আমরা জানতে পারবো যে, ভগবান আমাদেরই সৃষ্টি, তখনই আর আমাদের সেই কালাপাহাড়ি শক্তির প্রতি কোন ভীতি থাকবে না। এবং এই মানসিক শক্তি আমরা জ্ঞান থেকে লাভ করি, যার দ্বারা আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, দর্শন বিজ্ঞান থেকে পৃথক, উচ্চতর কোন শাস্ত্র নয়।

অনেকের ধারণা বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণার দার্শনিক ফলাফলকে বিচার করলেই দেখা যাবে যে, দর্শন ও বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিনষ্ট হয়ে গেছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শুধু ঊনবিংশ শতাব্দী এবং তার পূর্বেকার বিজ্ঞান নিয়েই আলোচনা করেছি, কারণ আধুনিক বিজ্ঞানের দার্শনিকভাব পর্যালোচনা এবং উপলব্ধি করতে হলে - এই আলোচনার প্রয়োজন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানই আধুনিক বিজ্ঞানের বনেদ।

সাধারণত, বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে যে, ইহা মনেরই কল্পনা; বিজ্ঞান আমাদের বাস্তব জীবনের প্রকৃত জ্ঞান অর্জনে কোন সাহায্য করে না। তাই ধরে নেওয়া হয় যে, আধুনিক বিজ্ঞানও আমাদের সেই প্রাচীন দর্শনের জায়গায় এনেছে - যে দর্শনে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য এই জগতের মিথ্যা প্রবঞ্চনা থেকে উদ্ধার করে একমাত্র সত্য - ঈশ্বরে জীবনকে বিলীন করা।

আদিম মানুষের বাস্তব জগত সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার শেষ পর্যায় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত পরমাণুর কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত - অর্থাৎ সমস্ত পদার্থিক ব্যাপারের মূলই হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর কণা - পরমাণু। এই পরমাণু সিদ্ধান্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল নয়, ইহা বিজ্ঞানের প্রথম যুগ থেকেই বিদ্যমান। গ্রিসে ডেমোক্রাইটস্ এবং ভারতবর্ষে কনদ প্রায় একই সময়ে এই সিদ্ধান্ত গঠন করেন। পরবর্তী অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগন এই মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন; অবশেষে নিউটন এবং ড্যালটন আধুনিক বিজ্ঞানের রূপে এই সিদ্ধান্তকে প্রকাশ করেন। এর ফলে পদার্থ বিজ্ঞান দ্রুত উন্নত হতে থাকে এবং একে একে প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ নির্ধারন করতে সক্ষম হয়। প্রকৃতির বহু রহস্যই এতে করে উদ্‌ঘাটিত হয়, এবং গত দুশো বৎসরের উন্নতি ও প্রগতি বোধহয় তার পূর্বেকার যুগ যুগান্তরের ইতিহাস অপেক্ষা বেশি।

সাম্প্রতিক আরও গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, পরমাণু অচ্ছেদ্য নয়। আরও ক্ষুদ্রতর বস্তুর সমন্বয়েই পরমাণুর সৃষ্টি। যে ক্ষুদ্র বস্তুর সমন্বয়ে পরমাণুর সৃষ্টি তার নাম' ইলেকট্রন এবং ইলেকট্রন হচ্ছে এক প্রকার বৈদ্যুতিক ঢেউ। এই ঢেউ নিয়ে এক নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়, কারণ এর গতি ও আকৃতি আবার একই সময়ে সঠিক নির্ধারণ করা যায় না। এবং এই রহস্যময় গবেষণাই প্রাকৃতিক কারণ নির্ধারণের মূল। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও অনেক বড় বড় লোকের মনে এই থেকে প্রাকৃতিক ঘটনার প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় অশ্রদ্ধা

জন্মায় এবং তাঁরাই এক নূতন মতের প্রবর্তক হন। তাঁদের মতে আমাদের জ্ঞানের বেশির ভাগই আমাদের মনের সৃষ্টি এবং তার সঙ্গে বাইরের বাস্তবের কোন সম্বন্ধ নেই; সুতরাং বিজ্ঞান যে বহির্জগতের বাস্তবতা প্রমান করেছে ইহা ভ্রান্ত। তাঁরা বলেন ঃ 'এই যে গাছ, এ লোকের মনের ধারণা, সত্য সত্যই গাছটা আছে কিনা কেউ বলতে পারে না। কারণ গাছ সম্বন্ধে যে ধারণা তা আমাদের মস্তিষ্কে গাছের যে ছবি চোখের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয় তার উপর, কিন্তু এই যে ছবি মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয় তার সঙ্গে দূরে যে গাছটা আছে তার সঙ্গে প্রকৃত কি সম্বন্ধ তা নির্ধারণ করবার কোন উপায় নেই। তাই এটা যে শুধু মানসিক ধারণার প্রতিচ্ছবি নয় তাতো ঠিক করে বলা যায় না। গাছটাই মূল না তার মানসিক ধারণাটা মূল তা কি করে জানা যাবে।' বস্তুত ইহাই জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল সমস্যা। গোড়া থেকেই কি করে জ্ঞান অর্জন হয় এই সমস্যাতেই দর্শন ব্যাপৃত ছিল। প্রথমত, জ্ঞান বিজ্ঞানই দর্শন নয় এবং এইটেই না বুঝতে পারাতে দর্শন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সম্বন্ধ নিয়ে যত সমস্যার সৃষ্টি। দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক দর্শনে ব্যক্তিগত ভাব ও মনের গুরুত্ব কম নয় এবং ইহা মনকে অস্বীকারও করে না। বাস্তব ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে কোন কিছু নেই। জ্ঞানার্জনের তিনটি উপাদান; বহির্বস্তু, ব্যক্তি এবং মন অর্থাৎ জানবার যন্ত্র। মনের সাহায্য ব্যাতিরেকে জ্ঞান সম্ভব নয়, ইহার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই। আধুনিক রহস্যবাদী বৈজ্ঞানিকেরাও তাই বলেন যদিও, ইহা সকলেই জানে এবং ইহাকেই তাঁরা আধুনিক বিজ্ঞানের দার্শনিক উপসংহার বলে ব্যক্ত করেন এবং ধরে নেন যে, দর্শন বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেয়। এই সব যুক্তি দেখিয়ে বলা হয় যে আধুনিক বিজ্ঞান বস্তুবাদের বনেদ ভেঙে দিয়েছে। এই মতের শেষ কথা হলো এই যে, পৃথিবী বাস্তব নয় এবং প্রাকৃতিক ও পদার্থিক নিয়মাদির দ্বারাও পরিচালিত নয় কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক এতটা স্বীকার করবেনা যদিও ইহাই হলো পূর্বোক্ত মতের যৌক্তিক পরিণাম। তাছাড়া যদি এই পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটনের এবং পদার্থিক নিয়মাদি ও প্রগতির কারণ জানবার ক্ষমতা মানুষের না থাকে, বা যদি এরকম কোন নিয়মই না থাকে, তাহলে মানুষ যে জগতকে এবং সমাজ ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করতে পারে) এই বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দিতে হয়।

জগত চিরপরিবর্তনশীল এবং মানুষই সেই পরিবর্তনে সর্ব প্রধান অংশগ্রহন করে এই দৃঢ় ধারণাই একমাত্র ঐ সব ভ্রান্ত অবাস্তব ধারণা দূর করতে পারে।

কারণ ঐ ধারণা অনুযায়ী রাজনীতির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকে না - সমাজ-বিজ্ঞানের অস্তিত্ব লোপ পায় এবং বিপ্লব বলে কোন কিছু থাকে না। সুতরাং আমাদের দেখতে হবে যে, আধুনিক বিজ্ঞানের দার্শনিক মতানুযায়ী সমাজ-বিজ্ঞান অসম্ভব হয়ে ওঠে কিনা এবং রাজনীতি একমাত্র বদমায়েসি ও পাগলের উপজীবিকা হয়ে দাঁড়ায় কি না। কিন্তু ইহার স্পষ্ট উত্তর 'না'। কারণ, আধুনিক বিজ্ঞান মাত্র ইহাই বলে যে. জানবার জন্য মনের প্রয়োজন। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে সাধারণত, লোকের মনে কতকগুলি ধারণা জন্মে যায় যে, মন বস্তুর থেকে পৃথক, মন ছাড়া জ্ঞান অর্জনের কোন উপায় নেই, সুতরাং জ্ঞান মনেরই সৃষ্টি এবং বাস্তব জগত আমাদের মনের কাল্পনিক প্রতিরূপ, মনের বাহিরে কিছুরই অস্তিত্ব নেই। সুতরাং যার অস্তিত্ব নেই সে সম্বন্ধে চিন্তা করবার প্রয়োজন নেই, এবং করবারও কিছু নেই, সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। কিন্তু এই সরল আদর্শবাদের মধ্যে কতকগুলি প্রশ্ন রয়ে গেছে। যদি কিছুরই অস্তিত্ব না থাকে এবং সবই মনের কল্পনা হয়, তাহলে আর সকলের মনও আমার মনেরই কল্পনা হয়ে দাঁড়ায়, সুতরাং আমার মন ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই - কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই - এবং জগতের কল্পনা করবারও কেউ নেই - কিন্তু আধুনিক আদর্শবাদী বা অধ্যাত্মবাদীরা এতদূর পর্যন্ত যেতে রাজী নন যদিও তাঁরা বিজ্ঞানকে অবাস্তব প্রমাণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু যদি তাঁরা এতদূর না গিয়ে এইটুকু বলতে চান যে শুধু মনেরই অস্তিত্ব আছে এবং প্রত্যেকের মনেরই অস্তিত্ব আছে - তাতেও বিশেষ সুবিধা হবে না। সত্তার নিজস্ব কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না; আত্মানুভূতির মূলই হলো অপর কোন সত্তার অস্তিত্ব এবং এই অন্যের অস্তিত্বের উপরই আত্মসত্তা নির্ভর করে। সুতরাং হিন্দুধর্মের নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ রহস্যময় ঈশ্বরের অস্তিত্বের অনুভবের জন্যই বাস্তব জগতের সৃষ্টির ও অনুভবের বিশেষ প্রয়োজন। এবং যদি স্রষ্টার অস্তিত্ব সত্য ও বাস্তব হয় তাহলে সৃষ্টি ও বাস্তবও প্রত্যক্ষ হবে। পৃথিবী যদি বৈজ্ঞানিকদের মানসিক কল্পনা হয় তাহলে বৈজ্ঞানিকদের মনের মতই পৃথিবীও বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ। ছায়া যদি সত্য হয় তবে তার কায়াও সত্য।

ধরে নেওয়া হোল সমস্তই মনের সৃষ্টি, সংকীর্ণ-শক্তি বিজ্ঞান, মন কি, তা বলতে পারে না। কিন্তু মন যাই হোক, ইহা মস্তিকের সাহায্যেই কাজ করে এবং মস্তিষ্ক যে বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ ইহা কেউই অস্বীকার করবে না। এখানে আবার

সেই পুরানো সমস্যার সম্ভব হয় ঃ কী ভাবে মস্তিষ্ক পরিচালিত হয়? চিরাচরিত দর্শন ইহার উত্তর দিতে অপারক। একমাত্র আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যেই আমরা ইহার উত্তর দিতে পারি; আধুনিক বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান দিয়েছে এবং হয়তো আরও অনেক কিছু অজানা আছে। কিন্তু যা কিছুই আমরা ঠিক জানি না, তাই যে রহস্যপূর্ণ ইহা অত্যন্ত ভুল ধারণা। পূর্বে এক সময় আমরা বিদ্যুত কি তাও জানতান না। তখন ইহা অত্যন্ত রহস্যময় ঘটনা ছিল এবং হিন্দুরা বিদ্যুৎকে ইন্দ্রদেবের বজ্রের ঝলকানো আলো বলে অভিহিত করত। কিন্তু আজ আমরা জানি যে, ইহা সত্য নয়। আমাদের জ্ঞান এখনও সীমাবদ্ধ এবং বহু জিনিস আছে যে সম্বন্ধে আমাদের এখনও কোন জ্ঞান নেই, কিন্তু সে জন্য ইহা বলা অত্যন্ত ভুল ও অনুচিত হবে যে, আমাদের বর্তমান জ্ঞানও ভ্রান্তিপূর্ণ। এই যে নব-রহস্যবাদ, অজ্ঞানতাকে এই যে দুর্বলের পূজা করা, মানুষের জানবার ক্ষমতাকে অস্বীকার করা আর তথাকথিত গণিতিকদের এই যে গণিতবিদ ঈশ্বর কল্পনা এই সবের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে এসেছে।

হয়তো এখনও আমাদের জ্ঞান খুবই কম - হয়তো পদার্থ জগত সম্বন্ধে আমরা এখনও সবিশেষ জানি না, কিন্তু তাতে করে আমাদের জানবার উৎসাহ ও প্রচেষ্টা আরো বাড়া উচিত এবং এই প্রচেষ্টাই হলো জীব-শক্তি - জীবনের সার। যে দিন থেকে মস্তিষ্কের সৃষ্টি হয়েছে সেই দিন থেকেই জানবার প্রচেষ্টাও শুরু হয়েছে। এর কোন শেষ নাই, জ্ঞান ক্রমাগতই বাড়তে থাকবে, হয়তো জ্ঞানের গন্ডি এখনও খুবই সীমাবদ্ধ - কিন্তু অজানাকে জানবার যে বিস্তৃত ভূমি পড়ে আছে - তাই হলো প্রকৃত অসীমের পরিপ্রেক্ষিত - এই অসীম হলো মানবের প্রকৃত অধ্যাত্ম। যেহেতু জানবার প্রক্রিয়া বাস্তব মস্তিষ্কের সহিত সংশ্লিষ্ট, সুতরাং মন অজানা অবাস্তব, রহস্যময় কিছু হতে পারে না এবং অবাস্তব জগতের কল্পনাতে প্রতিষ্ঠিতও হতে পারে না।

যদি আধুনিক বিজ্ঞান শতাব্দীর বিজ্ঞানের সবজান্তা মনোভাবকে বিনষ্ট করে থাকে তো ভালই করেছে। আর জানবার নেই, সব জানা হয়ে গেছে - এই মনোভাবই মানুষের জীব-শক্তিকে ধ্বংস করে - কারণ, এই মনোভাব থেকে মানুষের কাজ করবার ইচ্ছা নষ্ট হয় এবং কর্মক্ষমতাই হলো জীবনের অভিব্যক্তি। আধুনিক বিজ্ঞান মানব-সমাজের আত্মহত্যার আধার নয়, ইহা

মানুষকে নিঃশেষ করতে চায় না।

পরমাণুই ক্ষুদ্রতম বস্তুকণা নয় ইহা সত্য। পরমাণু ইলেকট্রন নিয়েই গঠিত ইলেকট্রনও স্থায়ী নয় কিন্তু সাধারণ বস্তু সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচলিত আছে সে হিসাবে না হলেও ইলেকট্রনও বস্তু; এবং তা না হলে ইহাকে পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণা বস্তু করা যেত না। পদার্থ বিজ্ঞানের কাজই হলো রূপ নিরুপন করা এবং এর মাপকাঠি সবক্ষেত্রেই বাস্তব এবং পদার্থিক সংজ্ঞা বিশিষ্ট। গণিতশাস্ত্রের অজানা অঙ্ক যখন কিছুকে ব্যক্ত করে তখনও তাহা দ্বারা বাস্তব সংজ্ঞাই বোঝায় - পদার্থ বিজ্ঞান যা কিছু নিরূপন করে বা অঙ্কের দ্বারা ব্যক্ত করে সবই বাস্তব এবং পদার্থিক সংজ্ঞা এবং ইলেকট্রনও সেই রকম একটি বাস্তব সংজ্ঞা।

পার্থিব জগতের বনেদের গঠন সম্বন্ধে আমাদের ধারণার পরিবর্তন হয়েছে; কিন্তু তাতে করে তার বাস্তবতা লোপ পায় নি। এই নূতন বনেদকেও আমরা আমাদের পদার্থিক মাপকাঠি দিয়ে নিরূপন করতে পারি, এই নূতন সংজ্ঞা অসম্ভব নয় এইটেই সব থেকে দরকারি কথা।

তাছাড়া কোন বৈজ্ঞানিকই একথা বলবে না যে, এই জগতের ঘটনাবলী কোন নিয়মকানুনের বশীভূত নয়। আগে কয়েকটি নিয়ম বা সিদ্ধান্তকে আমরা চূড়ান্ত বলে ধরে নিতাম এখন দেখা যাচ্ছে যে, এই সব নিয়ম বা সিদ্ধান্তও অন্য নিয়মদ্বারা চালিত। বিজ্ঞান জগতকে নিয়মানুবর্তী (নিয়ম-তান্ত্রিক) হিসাবেই গণ্য করে, শূন্য থেকে ইহার উদ্ভব ইহা বিজ্ঞান মানে না। আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণা করে এই জানতে পেরেছে যে, ইহা জড় বস্তুর দ্বারা গঠিত নয়, ক্রিয়াশীল, পরিবর্তনীয় ঘটনা নিয়েই এই জগত সংগঠিত। জগত স্থির নয়, ইহা পরিবর্তনের প্রতীক।

মানুষের জ্ঞান ক্রমবর্দ্ধমান। এই ক্রমবর্দ্ধমান জ্ঞান, সময়ের সাথে সাথে এবং প্রয়োজনের তাগিদে অনেক নিয়ম, সিদ্ধান্ত যা ভ্রান্ত প্রমাণ হয়েছে তাকে বাতিল করে। এই ভাবে যেমন এক একটি সিদ্ধান্ত বাতিল হয়েছে, তেমনি নূতন নূতন যুক্তিযুক্ত নিয়ম ও সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইহাই হলো বস্তুবাদের ভিত্তি। সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনারই বাস্তব ভিত্তি আছে এবং তা' যে নিরূপনযোগ্য এই স্বীকৃতিই হলো বিজ্ঞানের ভিত্তি ও গোড়ার কথা; ইহা ব্যতিরেকে কোন বিজ্ঞান হতে পারে

না এবং জ্ঞানার্জনের উপায়ও অসম্ভব হয়ে যায়। আধুনিক বিজ্ঞান বিজ্ঞানের এই বনেদ ভেঙ্গে দেয়নি; আধুনিক বিজ্ঞান শুধু বিজ্ঞান ও দর্শনের পার্থক্য লোপ করে দিয়েছে। একমাত্র দর্শনের যে সব চিরাচরিত সমস্যা - কাল, স্থান, বস্তু এবং কারণকার্য এসবই এখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার অন্তর্ভূক্ত এবং বিজ্ঞান এই সব সমস্যার সমাধানও করেছে এখন আর এসব সমস্যা নিয়ে কোন কল্পনার প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞান এই অবস্থায় উন্নীত হলে' পর, হয়ে দাঁড়ায় সর্ববিধ জ্ঞানের সমন্বয় এবং মানুষের জ্ঞানভান্ডারের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দর্শন নিজেকেও পরিবর্তিত করতে থাকে। আমাদের দেশে যা দর্শন বলে চির-প্রচলিত তার সঙ্গে অবশ্য এই বৈজ্ঞানিক দর্শনের অনেক পার্থক্য। জগতের রহস্যময় অলৌকিক ধারণাকে এখন আর দর্শন বলে অভিহিত করা যায় না।

যা আমরা জানিনা তারই একটা রহস্যময় অলৌকিক কারণ অনুমান করা অজ্ঞানতারই লক্ষণ। উনবিংশ শতাব্দীর একজন বৈজ্ঞানিক রেমন্ড বো এই নব অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে বলেন যে, আমরা কিছুই জানিনা এবং জানতে সক্ষম নই - এই হলো দর্শনের সার কথা। এবং যে সব আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, বিজ্ঞান আমাদের এই অবস্থায় নিয়ে এসেছে, তাঁরা তাঁদের দুর্বলতাকেই সমর্থন করেন এবং তাতেই আনন্দ পান। কিন্তু, বিজ্ঞান ইহা সমর্থন করে না এবং যাঁরা জ্ঞানকেই একমাত্র শক্তি বলে কল্পনা করেন এবং সেই জ্ঞানের সাহায্যে জগতকে নূতন করে গড়ে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তারা একথা মানতে রাজী নন। বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মীদের দর্শন রহস্যবাদ নয়; বৈপ্লবিক রাজনীতির দর্শন হলো বৈজ্ঞানিক দর্শন। একমাত্র এই বৈজ্ঞানিক দর্শনে অনুপ্রেরিত হলে, তবেই রাজনীতি ক্ষমতা লোভী, শঠ, প্রবঞ্চকদের হাত থেকে উদ্ধার পাবে। রাজনীতির সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের অনেক পার্থক্য।

আধুনিক রহস্যবাদী এবং তাদের ছাত্রদের রাজনীতিকে এই ভুয়ো দার্শনিক ভাবে ব্যক্ত করার মধ্যে একটি গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য হলো এই প্রমাণ করান যে, সামাজিক ব্যবহার কোন নিয়মানুবর্ত্তী নয়, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গুলিকে মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই এবং সর্বোপরি, মধ্যে মধ্যে সামাজিক ব্যবস্থায় বিপ্লবের কোন প্রয়োজন নেই। এই সবেরই মূল হলো এই যে, বিজ্ঞানের আর প্রয়োজন নেই; পদার্থ-জগত কোন নিয়মের বশীভূত নয় এবং অসংখ্য অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছে যার কারণ বিজ্ঞান

কখনও অনুমান করতে পারেনি বা পারবেনা। এই বিরাট বিশ্ব-জগতের মধ্যে সমাজেও ঠিক এই রকম ঘটনা ঘটছে যা নিয়মের বাইরে এবং যার মধ্যে কোন কারণ পাওয়া যায় না এবং এখানে প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত। এই যে দার্শনিক মত - ইহাই হলো ফ্যাসিবাদের ভিত্তি।

অর্থাৎ যাঁরা বিজ্ঞানের ডিগবাজী এবং সঙ্গে সঙ্গে রহস্যময় অধ্যাত্মবাদী দর্শনের উত্থান নিয়ে মাতামাতি করছেন - তাঁরা শুধু বিপ্লবের জাগৃতি শক্তির বিরুদ্ধে এক বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করছেন। পৃথিবীতে একটা বিরাট পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে। বিজ্ঞান আজ বহু লোককে এই জ্ঞান ও এই অনুপ্রেরণা দিয়েছে যে মানুষের জগতকে পরিবর্তন করবার ক্ষমতা আছে। সেই অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ পেয়ে, আজ জনসাধারণ, জগতকে নূতন করে গড়ে তোলবার জন্য, মানুষকে ও সমাজকে সুখী ও উন্নত করবার জন্য পৃথিবীতে এক বিরাট দল সৃষ্টি করছে। এই বিপ্লবকে রোধ করবার জন্যে, প্রতিষ্ঠিত মুষ্টিমেয় কয়েকজনের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে, মানুষের বিশ্বাসকে বিনষ্ট করতে, আজকের ভুয়ো দর্শন এই প্রচার করছে যে, মানুষ যন্ত্রবিশেষ, ভাগ্যের দাস, যে অলৌকিক অপ্রাকৃতিক শক্তি মানুষকে ও জগতকে পরিচালিত করছে, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী মানুষকে চলতেই হবে। বিজ্ঞান আজ দর্শনকে এই মিথ্যা প্রবঞ্চনা থেকে উদ্ধার করেছে। বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে দর্শন বহুদিন শাসক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে এসেছে, তার উদ্দেশ্য নষ্ট করে এসেছে; আজ আবার দর্শন তার প্রকৃত স্থান ফিরে পেয়েছে।

আজ বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে সমস্ত পার্থক্য লোপ পেয়েছে। এখন দার্শনিকদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। বিজ্ঞানের জ্ঞানকে সন্নিবদ্ধ করে, মানব-সমাজকে সেই জ্ঞানের সাহায্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই দর্শনের কাজ। রাজনীতি হলো দৈনন্দিন জীবনের, মানুষের আচার ব্যবহারের বিজ্ঞান, এবং সেই জন্যে রাজনীতির সঙ্গে বিজ্ঞান ও দর্শনের নিগূঢ় সংযোগের প্রয়োজন। কিন্তু রাজনীতির এই দিকটাই এখনও লোকে উপলব্ধি করেননি; তাই আজও রাজনীতি পাগল, বদমায়েস বা ভাগ্যান্বেষী লোকদের একচেটিয়া।

অধুনা একদল রাজনীতিজ্ঞের উদ্ভব হচ্ছে যাঁরা রাজনীতিকে দর্শন হিসাবে নিয়েছেন এবং যাঁদের প্লেটোর ভাষায় দার্শনিক সম্রাট বলা যেতে পারে; তবে

আমাদের দার্শনিক সম্রাটের প্রয়োজন নেই, আমরা চাই দার্শনিক সামাজিক মানুষ। গণতান্ত্রিক সমাজ ও সামাজিক জীব গড়ে তুলতে হলে আমাদের বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান থাকার প্রয়োজন এবং বিজ্ঞান, দর্শন ও রাজনীতির মধ্যে যে নিগূঢ় অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ তাও অনুভব করা প্রয়োজন। সুতরাং রাজনৈতিক দর্শনের মূল সিদ্ধান্তগুলি ভুয়ো অবাস্তব হয়ে থাকলে চলবে না, মানুষের অভিজ্ঞতার উপরেই তাকে গড়ে তুলতে হবে। অর্জিত অভিজ্ঞতা যেমন সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে, সেই রকম পুরাতন সিদ্ধান্তগুলিকেও বাতিল করে নূতন সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দর্শন যেমন সর্ববিধ বিজ্ঞানের জ্ঞানকে একত্রে সন্নিবদ্ধ করে, সেই রকম রাজনৈতিক দর্শনকে মানুষের সামাজিক জীবনের সমস্ত অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, পরিবর্তিত করতে হবে। এই কারণেই মার্কস্ বলেছিলেন যে, রাজনীতির ভিত্তি সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক অবস্থা। সমাজতন্ত্রবাদের ভীতি, সাম্রাজ্যবাদের বিভীষিকা বা মার্কসবাদের বীভৎসতা বলে যা প্রচলিত তা আর কিছুই নয় - সমাজ সমস্যা সমাধানের বৈজ্ঞানিক উপায়। এই হলো মার্কসীয় দর্শন - বৈজ্ঞানিক দর্শন - মানুষের জ্ঞানের সমষ্ঠি - যাতে করে রাজনীতি হয়ে ওঠে উদ্দেশ্যময়, পূর্ণ এবং যা পরার্থপর মহৎ নরনারীকে রাজনীতিকে কর্মজীবনের অঙ্গীভূত করে নিতে অনুপ্রেরিত করে। বিজ্ঞান সম্মত, জড় জগতের ন্যায় মনুষ্যজীবনও নিয়মাবদ্ধ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ বাস্তবে পরিণত করতে হলে রাজনৈতিক সমস্যাগুলিকেও বিজ্ঞানের সমস্যার মতই দেখতে হবে। যারা বিশ্বাস করে যে প্রয়োজন মত জগতকে পরিবর্তন করার ও নূতন করে গড়ে তোলার ক্ষমতা মানুষের আছে - মার্কসবাদ তাদের রাজনীতি, এবং বৈপ্লবিক আদর্শ ব্যাতিরেকে এই সব দার্শনিক রাজনীতিজ্ঞের রাজনীতির প্রতি কোন আকর্ষণ নেই।

মার্কসবাদ কি?

(What is Marxism?)

মার্কস্‌বাদ বলতে সাধারণত আমরা বুঝি যে ইহা এক বিশেষ ধরনের রাজনীতি বা অর্থনৈতিক সূত্রাবলী। যদিও অর্থনীতি এবং রাজনীতি মার্কস্‌বাদের অন্তর্ভুক্ত, তবুও ইহারা শুধু মার্কস্‌বাদের অংশবিশেষ। প্রকৃতপক্ষে মার্কস্‌বাদ একটি দর্শন। কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহা সঙ্কীর্ণ, বদ্ধ আদর্শ বা চিন্তাধারা নয়; বা শুধু কতকগুলি সূত্রের সমষ্টি নয়; মার্কস্‌ দর্শন এক বিশেষ প্রণালী। অনেকের মতে, মার্কস্‌বাদ হচ্ছে মানব ইতিহাসের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ও বিবরণ। কিন্তু ইহাও সঠিক নয়। ইতিহাসের অর্থনৈতিক বিবরণ বলতে সাধারণত যে সঙ্কীর্ণতা বুঝায়, মার্কস্‌বাদ ইতিহাসকে সেই সঙ্কীর্ণতা থেকে উদ্ধার করেছে। মার্কস্‌বাদ, প্রকৃতপক্ষে, ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক বিবরণ; কিন্তু বস্তুবাদ মানে "খাও, দাও, নৃত্য কর" এই আদর্শ নয়। অর্থনৈতিক পদ্ধতি, রাজনৈতিক আদর্শ ও কার্যসূচী এসব নিয়েই মার্কস্‌বাদ গঠিত; কারণ, মার্কস্‌বাদ মানব জীবনের দর্শন এবং সেই হিসাবে মানুষের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রই মার্কস্‌বাদের অন্তর্ভুক্ত।

মার্কস্‌ দর্শন বস্তুতান্ত্রিক দর্শন। কিন্তু মার্কসীয় বস্তুবাদ প্রচলিত বস্তুবাদের ধারণা থেকে পৃথক। প্রথমেই একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মার্কস্‌বাদ প্রাগ্‌জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান জনিত আদর্শ নয়, বা শুধু কার্ল মার্কসের মানসিক প্রতিভার বিকাশ নয়। মার্কস্‌বাদের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং বৈশিষ্ট্য এই যে, কার্ল মার্কসের পূর্বে তিন চার শতাব্দীর সমগ্র মানব চিন্তাধারা ও কার্যকলাপের ইহা এক সমষ্টিগত বৈজ্ঞানিক বিবরণ। পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সমাজ যে বিরাট বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়, সেই দার্শনিক এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবই অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিপ্লবের সূচনা করে। এই বিপ্লবেরই প্রত্যক্ষফল মানব সভ্যতার নবজাগরণ।

এর পূর্ব পর্যন্ত মানুষের চিন্তা একই ধারায় বদ্ধ ছিল। তার উন্নতির সব আশাই শেষ হয়ে যায়। সেই চিন্তাধারা মানুষকে রহস্যবাদ এবং ঈশ্বরবাদে মগ্ন করে রাখে। সমাজের উন্নতির জন্য মানুষকে অন্ধবিশ্বাসের মোহ এবং ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করার প্রয়োজন হয়। গ্যালিলিও ও কপারনিকাস প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারের ফলেই তা সম্ভব হয়।

মার্কসবাদকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে দর্শনের সূত্র থেকেই শুরু করা কর্তব্য। দর্শন কী - এ বিষয়ে বহু মতভেদ আছে; এবং কোনও দু'জন দার্শনিকই এ বিষয়ে একমত নন। কিন্তু আমরা যদি দর্শনের ইতিহাস অধ্যয়ন করি তা হলেই একমাত্র বুঝতে পারি যে পরিচিত সংজ্ঞা দিয়ে বিশ্বজগতের বিশ্লেষণই হচ্ছে দর্শন। প্রাচ্যের এবং পাশ্চাত্যের দর্শনমাত্রেরই ভিত্তি হচ্ছে যুক্তিবাদ। মানুষের স্থিতি এবং তার সামাজিক পরিবেশের অর্থ নিরূপণের প্রচেষ্টাতেই দর্শনের শুরু। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যতিরেকে পদার্থিক জগতের পরিবেশ এবং তন্মধ্যস্থিত কার্যকলাপের পদার্থিক সংজ্ঞা দিয়ে কোনও প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, তাই আদিম কালে বিশ্বজগতের বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য হয়।

কিন্তু মানুষ স্বভাবত প্রত্যেক ব্যাপারেরই কোন কারণ নির্দ্ধারণ না করে ক্ষান্ত হতে পারে না। যখন মানুষ কোনও ঘটনার কোন কারণ খুঁজে পায় না তখন সে তার কোনও বিশেষ কারণ নির্দ্ধারণ করে থাকে। মানুষ যে প্রত্যেক ঘটনারই কারণ খুঁজে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত্য সেই জন্যই ধর্মের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় তাতে করেই প্রমাণ হয় যে মানুষ যুক্তিবাদী। অন্তরে অন্তরে মানুষ ইহা বিশ্বাস করে না যে, শূন্য থেকে কিছুর সৃষ্টি হতে পারে। প্রত্যেক ঘটনারই কোন না কোন কারণ আছে এবং কোনও ঘটনার কারণ না জানলে তাকে অবাস্তব অলৌকিক শক্তির বিকাশ বলা হয়। কোনও ঘটনার সঠিক কারণ নির্দ্ধারণ করার অক্ষমতাই ঐশ্বরিক অলৌকিক কারণ নির্দেশের মূল; তাতে করে এই বুঝায় যে আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা ইহা অপেক্ষা যুক্তিযুক্ত কারণ নির্দেশ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই এটা তার একটা কারণ খুঁজে বার করার প্রচেষ্টা। এই সব অলৌকিক অবাস্তব সংজ্ঞা - যাকে আমরা ঈশ্বর বা মূল কারণ বা মূল তত্ত্ব বলে থাকি, সবই বীজগণিতের অজানা অঙ্কের সমতুল। কোনও অজানা সংজ্ঞাকে আমরা বিশেষ এক আখ্যা দি, এবং তারপরে সেই অজানা

সংজ্ঞার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করতে প্রবৃত্ত হই।

যে সব সমস্যা ভারতীয় এবং ইউরোপীয় দর্শনে দু'হাজার বৎসর পূর্বে উত্থাপিত হয়েছিল - ইউরোপীয় সমাজ ষষ্ঠদশ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে তাদের সমাধান করতে প্রবৃত্ত হয়। আধ্যাত্মিক এবং মানসিক উৎকর্ষতার এই নূতন যুগ আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সম্ভব হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ অলৌকিক অনুমান ত্যাগ করতে সক্ষম হয়। যে সব ঘটনার কারণ পূর্বে অলৌকিক, ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাব বলে কল্পনা করা হোত - তার মধ্যে অনেকের সঠিক বাস্তবিক কারণ নির্দ্ধারণ করতে পদার্থ বিজ্ঞান সাহায্য করে। এই নূতন আবিষ্কারের ফলে এক নূতন দর্শনের সৃষ্টি হয় - যার মধ্যে অতীন্দ্রিয় অনুমান এবং গূঢ় রহস্যের কোনও স্থান থাকে না; বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই দর্শন হচ্ছে মার্কস্‌বাদ। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মূল কথাই এই যে কোনও কিছুই বিনা যুক্তিতে বা বিনা বিচারে গ্রাহ্য করা চলে না। যদি কোনও বিষয় অনুসন্ধানের জন্য সূত্রের প্রয়োজন হয় তো তাকে অনুমানের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। মৌলিক গবেষনার দ্বারা কোন অনুমানকে প্রতিষ্ঠা করাই বৈজ্ঞানিকদের কাজ। গত ১০০০ বা ১২০০ বৎসর পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় যে ধর্মাত্মক প্রভাব ছিল আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকেরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা তা বিনষ্ট করেন।

যুক্তিবাদী দর্শন একমাত্র বিজ্ঞানের সাহায্যেই বহির্জগতের বিশদ বিবরণ দিতে সক্ষম। দর্শনকে নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ চিন্তাধারা করতে গিয়ে, যেখানেই কোনও বিষয়ের সমাধান বিজ্ঞানের দ্বারা সম্ভব হয়নি, সেখানেই আধুনিক দার্শনিকগণ অতীন্দ্রিয় অনুমানের সাহায্য নেন। কার্লমার্কস্‌রে পূর্বে পর্যন্ত আধুনিক দর্শন এই বিপাকে পড়েছিল। ইহার কারণ ছিল এই যে পূর্বেকার অলৌকিক সংজ্ঞাগুলি অস্বীকার করে ইহা আবার এক নূতন অলৌকিকতার সৃষ্টি করে। ইহার মধ্যে বিশিষ্ট হচ্ছেন ইমানুয়েল কান্ট।

কান্টীয় দর্শন "সর্ববিধ্বংসী" বলে বিখ্যাত। কান্ট যা কিছু পুরাতন তা সমস্ত ধ্বংস করে তার পরিবর্তেএক নূতন অলৌকিকতার সৃষ্টি করেন। কিন্তু শুধুমাত্র বিজ্ঞানের অপ্রসারতাই ইহার একমাত্র কারণ নয়। প্রকৃত কারণ হচ্ছে জ্ঞানতত্ত্বের মৌলিক সিদ্ধান্তে কতকগুলি ত্রুটি। যা কিছু অপ্রয়োজনীয় তা সমস্তই পরিত্যাগ করতে গিয়ে আধুনিক দর্শনের প্রবর্তকেরা চিন্তাশক্তি এবং মানসিক বিকাশের

প্রভাবকে অত্যন্ত ন্যূন জ্ঞান করেন। এমন কি মনকে মস্তিষ্ক হতে নিঃসৃত এক বস্তু হিসাবে অনেকে বর্ণনা করেন। এতে করে জ্ঞানতত্ত্বের প্রধান সমস্যা - মানুষের জ্ঞানর্জন কি ভাবে হয়, দার্শনিকদের সেই সমাধান করতেই সচেতন করে তোলে। এই সমস্যা একরকম সকলকেই চিন্তাগ্রস্ত করে এবং কোনও রকম বৈজ্ঞানিক উত্তর বা সমাধান না পাওয়ায়, অদ্ভুত অদ্ভুত কাল্পনিক মতের সৃষ্টি হতে থাকে। মার্কস্ শুধু যে এর সমাধান করেই পুরাতন দর্শনকে ধ্বংস করেন তা' নয়; মার্ক্স এ পর্যন্ত বলেন যে, মানুষের ভাব ও বাস্তব সত্য এবং মৌলিক সংজ্ঞা।

ফলে বাদানুবাদ গিয়ে পৌঁছায় এখানে যে, মৌলিক সত্য মন না দেহ, অর্থাৎ বস্তু না আত্মা। পূর্বতন বস্তুবাদীরা মনের অর্থাৎ ভাবের বাস্তবতা অস্বীকার করেন। বাস্তব বলতে যার অস্তিত্ব আছে তাহাই বুঝায়। মানুষের ভাবেরও যে বাহ্য অস্তিত্ত্ব আছে বস্তুবাদীদের মধ্যে প্রথম মার্কস্ই তা স্বীকার করেন। মার্কস্ বলেন যে একবার সৃষ্টি হওয়ার পর, মানুষের ভাবও অন্যান্য জড়বস্তুর মত বাস্তবে পরিণত হয়।

সমস্ত মতদ্বৈধতার মধ্যে ইহা এক নূতন পথ দেখায়। ভাব এবং বস্তুর মধ্যে আর কোন বিরোধবোধ থাকে না। কোনটি প্রথম - ভাব না বস্তু, এ বিষয়ে মার্কস্ কোনও অযৌক্তিক বা কল্পনামূলক উত্তর দেননি। তিনি মানুষের চিন্তাধারার এবং ভাবের ক্রমোন্নতিকে বিশদ এবং বিস্তৃত বিচার করেন। এ বিষয়ে তিনি যে সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা করেন তা নয়। মার্কস্ দর্শনের অগ্রদূত হেগেলই প্রথম এই কার্যে ব্রতী হন। হেগেলই প্রথম দর্শনের একটা সুসংবদ্ধ ইতিহাস লেখেন এবং এই উপসংহারে উপনীত হন যে দর্শনের ইতিহাসই মানব সভ্যতার ইতিহাস। হেগেল বলেন যে, ভাব চিরকালই আছে, এবং ভাবের আত্মানুভূতিই হলো জড় জগৎ। মার্কস্ প্রশ্ন তোলেন যে, ভাবের সৃষ্টি কী ভাবে হয়? প্রাচীন যুগে যখন মানুষের মন ধর্মভাবাপন্ন ছিল, তখন এ প্রশ্ন অবান্তর ছিল। কিন্তু বিজ্ঞান ও যুক্তির যুগে এ প্রশ্ন অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত এবং এর উত্তরের প্রয়োজন আছে। যদি ইহাই সত্য হয় যে দর্শনের ইতিহাসই মানব সভ্যতার ইতিহাস, তাহলে মানব সভ্যতার ইতিহাসের অর্থাৎ সামাজিক বিবর্তনের মূল কারণ হয় ভাবের আদি কারণ। ভাব একবার সৃষ্টি হলে, মানুষের চিন্তাশক্তি এবং সভ্যতার প্রগতি সেই ভাবেরই বশীভূত। কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে ভাবের

সৃষ্টি কী ভাবে হয়? এই প্রশ্নের উত্তরই সামাজিক বিবর্তনের মূল সূত্র বা মূল কারণ নির্দ্ধারণ করতে সক্ষম হবে।

নৃতত্ত্বের এবং প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে সমাজের সৃষ্টির ইতিহাস অনুসন্ধান করে মার্কস্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মানুষের জীবনধারণের উপায়ের উপরই তার চিন্তাধারা নির্ভর করে, এতে করে সমস্ত সমস্যাই খুব সরল হয়ে দাঁড়ায়। হয়ত সকল দার্শনিকই মার্কস্ দর্শনকে পুরোপুরি মানেন না; কিন্তু আজ কোনও খ্যাতনামা দার্শনিকই, বৈজ্ঞানিকের কথা দূরে থাক, একথা অস্বীকার করবেন না যে আমাদের ব্যবহার, আমাদের চিন্তাধারা, আমাদের বিশ্বাস সবই, আমাদের সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে আর কোন দ্বিমত নেই। প্রাচীন যুগের ঐতিহাসিক ঘটনার মতো এ আমাদের কষ্ট করে গবেষণা করে বার করতে হবেনা; পৃথিবীর সমস্ত দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রা থেকেই আমরা ইহা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সম্প্রদায়, ভিন্ন ভিন্ন মত ও সামাজিক নিয়মানুবর্ত্তী। এই সমস্ত পার্থক্যই যে নির্ভর করে তাদের জীবন যাত্রা নির্বাহের প্রণালীর উপর, অভিজ্ঞতার দ্বারাই তা প্রমাণ হয়েছে। মার্কসে্র এই গবেষণার পর জ্ঞানবিজ্ঞানের অর্থাৎ কি ভাবে জ্ঞানার্জন হয়, সৃষ্টিতত্ত্বের এই আদিম সমস্যাটির সমাধান হয়। এর দ্বারা আমরা মানব ইতিহাসের এবং সভ্যতার মূল কারণে উপনীত হই - যাতে করে ইতিহাস এবং প্রগতির প্রত্যেকটি ব্যাপার আমরা জানতে পারি। মার্কসী্য় রাজনীতি বা মার্কসীয় অর্থনীতিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করি তার নামই মার্কসীয় দর্শন। আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সেই সব সমস্যার সমাধান করে থাকি; সেই দৃষ্টিভঙ্গি বা আদর্শই হচ্ছে মার্কস্বাদের মূলতত্ত্ব - বস্তুবাদ।

এই উপসংহারে উপনীত হয়ে মার্কস্ দর্শনের এক নূতন সংজ্ঞা দিলেন যে জগতকে বিশ্লেষণ করাই দর্শনের কাজ নয়, জগতকে নূতন করে গড়ে তোলাই দর্শনের কাজ। এর পূর্ব পর্যন্ত দর্শন কেবল মাত্র কল্পনার আধার ছিল। মানুষ এবং পৃথিবীকে বিশ্লেষণ করাই ছিল ইহার কাজ, প্রচলিত সমাজ এবং পৃথিবীকে মেনে নিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য; কিন্তু একথা দর্শন কখনও তোলেনি যে সমাজ ব্যবস্থা কেন এরকম থাকবে বা কেন এ রকম হয়েছে। বস্তুজগৎ এবং তার নিয়মাদিকেই একমাত্র প্রচলিত ব্যবস্থা বলে ধরে নিয়ে দর্শন

সেই ব্যবস্থাকেই বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু কেন এই ব্যবস্থা প্রচলিত তার কারণ পূর্বেকার দর্শন অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করেনি; এবং যদিও বা কখনও তার কোনও প্রচেষ্টা হয়েছে তাও অলৌকিক কল্পনাতেই পরিণত হয়; আর শেষ পর্যন্ত সমস্ত সমাধানই গিয়ে দাঁড়ায় ঐশ্বরিক শক্তি অথবা ঐশ্বরিক প্রয়োজনে।

এই পুরানো ধারণা অনুযায়ী, দর্শনের সঙ্গে জীবনের কোনও সম্বন্ধ নেই; এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে দার্শনিকদের কোনরূপ চিন্তা করারও প্রয়োজনও নেই। তাঁরা কেবল প্রকৃতি এবং জীবনের বৈচিত্র্য নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। প্রত্যেকেই কোন না কোন অবস্থা থেকে শুরু করেন এবং একবার কোনও বিশেষ অবস্থা থেকে শুরু হলে পরবর্তী সমস্তই যথারীতি ঘটে যায়। দার্শনিক চিন্তাধারার এই মূল প্রতিজ্ঞাটির সত্যতা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম মার্কস্ সন্দেহ প্রকাশ করেন। মার্কসবাদ অনুযায়ী মানুষ জগতের বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করতে পারে তার কারণ জগতের গঠনে মানুষের পুরো দায়িত্ব এবং কারুকার্যতা আছে। আমরা যদি জগতকে নূতন করে গড়ে তুলতে সক্ষম হই, তাহলে ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, আমাদের পূর্বে মানুষই আজকের পৃথিবীকে এইভাবে গড়ে তুলেছে। মানুষ যে নিজের সুবিধামত এবং মনোমত জগতকে পুনর্গঠন করতে পারে এই ধারণা মানুষকে সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক বন্ধন থেকে মুক্ত করে এবং ধর্মাত্মক চিন্তাধারা ও অন্ধ বিশ্বাসের মোহকে সমূলে ধ্বংস করে। তত্ত্বজ্ঞানজনিত দর্শন ধর্মের গোঁড়ামি বিনষ্ট করে তার পরিবর্তে এক নূতন অদৃষ্টবাদ প্রতিষ্ঠা করে। বস্তুতঃ মার্কসের পূর্ববর্তী বস্তুবাদ আসলে অদৃষ্টবাদই ছিল। এই মতানুযায়ী মানুষ তার সামাজিক পরিবেশের অধীন এবং এই পরিবেশ পরিবর্তন করায় মানুষের যদিও কোনও হাত নেই তবু সে যা করে এবং যা ভাবে তা সমস্তই এই পরিবেশের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীটা এক বিরাট কারাগার; এ থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই এবং কারাগার এমন এক অদৃশ্য অপরিমিত শক্তিদ্বারা পরিচালিত যাকে পূর্বে ঈশ্বর আখ্যা দেওয়া হতো এবং এখন বলা হয় বস্তু।

প্রকৃতপক্ষে মার্কসীয় দর্শনে মানুষই ঈশ্বরের স্থান অধিকার করেছে। মার্কস যা বলেছেন তা মোটেই অযৌক্তিক নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করেন যে মানুষের ভাব, আদর্শ, বিশ্বাস এবং ব্যবহার, তার বর্তমান এবং

ভবিষ্যৎ সব কিছুই নির্ভর করে তার সামাজিক পরিবেশের উপর। কিন্তু তারই মধ্যে মানুষ সেই পরিবেশকে তার নিজের সুবিধামতো পরিবর্তন করতে সক্ষম। জীবনযাত্রায় সে যে কেবল মাত্র অভিনেতা এবং তার সঙ্গে সামাজিক পরিবেশের কোনও নিগূঢ় সম্বন্ধ নেই তা নয়, এই জীবনযাত্রার এবং পরিবেশের সে একটি বিশেষ অংশ। কিন্তু তার নিজের আচার ব্যবহার সবই নির্ভর করে তার পরিবেশের উপর। সুতরাং মানুষ যে শুধু তার নিজের পরিবেশ এবং সত্ত্বাকেই পরিবর্তন করতে পারে এবং সেখানেই শুধু যে সে নিজে কর্তা তা নয়, মানুষ ইতিহাসকেও নূতন করে গড়ে তুলতে পারে ইহাই মার্কস্‌বাদের সার কথা।

ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ভাষ্যের দ্বারা মার্কস্ সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস নূতন করে রচনা করেন। এতদিন পর্যন্ত ইতিহাস ছিল শুধু গল্প কথা; কতকগুলি খাপছাড়া ঘটনার সমাবেশ; ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবেও তাদের সত্যতা ছিল অত্যন্ত সন্দেহজনক। কেউ লিখলেন কোনও এক সময়ে কোনও বিশেষ স্থানে এক যুদ্ধ হয়; রচয়িতার এবং ঘটনার সত্যতা আমাদের শুধু নিঃসন্দেহে মেনেই নিতে হতো। কিন্তু সেই যুদ্ধ যে ঠিক সেই সময় বা সেই স্থানে ঘটে ছিল তার কোনও সঠিক প্রমাণ নেই। যতদিন না মার্কস্ ইতিহাসের এই সার তথ্য নির্দ্ধারণ করেন ততদিন ঐতিহাসিক জ্ঞানও প্রকৃত জ্ঞান ছিলনা, কেবল মাত্র, একটা অন্ধ বিশ্বাস ছিল। বইয়েতে কিছু লেখা থাকলেই আমরা পড়তাম এবং তা মেনে নিতাম। কিন্তু মার্কস্ দেখালেন যে ইতিহাসও একটা বিজ্ঞান এবং এ সম্বন্ধেও গবেষণা ও অনুসন্ধান করার প্রয়োজন। প্রাকৃতিক ঘটনাও যেমন বিনা কারণে কিছু ঘটে না, সেই রকম মানব সমাজের ইতিহাসেও বিনা কারণে কিছু ঘটেনা; প্রত্যেকটি ঘটনাই পূর্ববর্তী ঘটনার উপর নির্ভর করে; হঠাৎ বিনা কারণে কিছুই ঘটেনা।

মার্কস্‌ই প্রথম ইতিহাসের এই মূলতত্ত্ব নির্দ্ধারণের সন্ধান দেন। মার্কস্ বলেন যে, মানুষের ভাব শুধু তার সামাজিক পরিবেশের উপরই নির্ভর করে না, তার জীবিকার্জনের উপায়ের উপরও নির্ভর করে। মানসিক সত্ত্বা মানুষের দৈহিক অস্তিত্বের সঙ্গে সংযুক্ত। যে ভাবে মানুষ তার জীবসত্ত্বাকে রক্ষা করে তারই উপর আর সব সত্ত্বা নির্ভর করে। কোন বিশেষ উপায়ে জীবিকার্জন শুরু করলে, তাতেই যে চিরকাল মানুষ ব্যাপৃত থাকবে, তার কোন কারণ নেই।

মানুষ তার জীবিকার্জনের উপায়ও পরিবর্তন করতে পারে। কুম্ভকার চিরকালই কুম্ভকার না থাকতেও পারে। যে শক্তির সাহায্যে আদিম কালে মানুষ হাতুড়ি তৈরি করতে শেখে সেই শক্তির সাহায্যেই পরে সে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়। এই নূতন যন্ত্র উৎপাদন প্রণালীকে পরিবর্তন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমস্ত আধ্যাত্মিক এবং মানসিক ভাবও পরিবর্তিত হয়। এই ভাবে উত্তরোত্তর উন্নততর উৎপাদন প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভাব ও আদর্শ সবই উন্নত হ'তে থাকে। এই সব পরিবর্তনই সামাজিক বিবর্তনের এক একটি ধাপ।

ইতিহাসের এই মৌলিক তথ্য নির্দ্ধারণ করে মার্কস্ তার নিজের সময়কার সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখেন যে সেই সমাজব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক। তিনি প্রমাণ করেন যে এই ব্যবস্থায় কৃষ্টি, কলা, আচার ব্যবহার সবই নির্ভর করে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর উপর। তিনি আরও প্রমাণ করেন যে ইহার পূর্বেকার ঐতিহাসিক যুগের মানুষের সমস্ত উৎকর্ষতা, তার চিন্তাধারা এবং মানবজাতির যতকিছু আধ্যাত্মিক প্রতিভা ও অবদান সবই ছিল সামন্ত প্রথার অর্থাৎ জমিদারি প্রথার উৎপাদন প্রণালী দ্বারা নির্দ্ধারিত। সেই ব্যবস্থা যখন নিঃশেষিত ও অকেজো হয়ে পড়ে তখনই ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়। প্রচলিত সমাজব্যবস্থার মধ্যেই বেড়ে উঠে সেই ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ধনতন্ত্র এক নূতন সমাজ ও সংস্কৃতি এবং নূতন রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর উন্নতি ও সহযোগিতার জন্য এই পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। পরিশেষে মার্কস্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এইসব পরিবর্তন ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ ঘটে আসছে এবং আজ পর্যন্ত বহুবার এইসব পরিবর্তন ঘটেছে। যদি ইতিহাস শেষ পর্যায়ে না পৌঁছে থাকে তবে ঠিক পূর্বেও যেমন মানুষ এই সব পরিবর্তন সাধন করেছে পরেও তেমনি করবে। যেমন পূর্ববর্তী কৃষ্টি, কলা, আচার ব্যবহার ভাব ও দর্শনকে ধনতান্ত্রিক আদর্শে পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় তেমনি ধনতান্ত্রিক সমাজ এবং আদর্শের পরিবর্তে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন সমাজ ও আদর্শ, নূতন উৎপাদন প্রথা, নূতন মানব সভ্যতা, কৃষ্টি ও কলা, ভাব ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হবে।

কার্ল মার্কস্ বলেন যে ইতিহাস ফরমাস দিয়ে তৈরি করা যায় না; প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যেই যে সব উপাদান আছে তা দিয়েই আমাদের সমাজকে নূতন করে গড়তে হবে। প্রতিষ্ঠিত সমাজের জীবাণুই নূতন সমাজ সৃষ্টি করবে। অনেকের

মতে মার্কস্‌বাদী হতে হলে একমাত্র সাম্যবাদী সমাজ ছাড়া অন্য কোনও সমাজ ব্যবস্থার চিন্তা করার বা তার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মার্কস্‌ শুধু এই কথাই বলেছেন যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকেই সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে এবং তাই ধনতন্ত্রের পর সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি বলেছেন যে আমাদের জ্ঞান এবং ইতিহাসের সাহায্যে আমরা যতদূর দেখতে পাই, তাতে আমরা এই জানতে পারি যে, ভবিষ্যৎ সমাজ সাম্যবাদের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সেখানেই সব শেষ হয়ে যাবে। তবে আমাদের বর্তমান জ্ঞানের সাহায্যে আমরা তার পরের ব্যবস্থা কল্পনা করতে পারি না। মার্কস্‌ একথা পরিষ্কার করে বলেন যে ধনতন্ত্রের পর সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে; সুতরাং যদি আমাদের দেশে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে তাহ'লে সমাজতন্ত্র অবশ্যম্ভাবী। তবে যদি আমরা দেখি যে আমরা এখনই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারিনা কারণ যে সব উপাদান সাম্যবাদের জন্য প্রয়োজন তা নেই, তাহ'লে প্রকৃত মার্কসবাদী হিসাবে আমাদের সেই সব উপাদানের সৃষ্টি করতে হবে; সেই ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যা অবশ্য প্রয়োজনীয়। কার্ল মার্কস্‌ নিজে যখন "সাম্যবাদের খসড়া" (Communist manifesto) রচনা করেন তখন যদিও তিনি জানতেন যে ধনতন্ত্রের ধ্বংসের পর সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে তবুও তিনি রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে সামন্তপ্রথার উচ্ছেদ এবং ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেন।

মার্কস্‌বাদ এবং সাম্যবাদ এক ইহা অত্যন্ত ভুল ধারণা। মার্কস্‌বাদের সাহায্যেই সাম্যবাদের রূপ প্রকাশ প্রায় কিন্তু মার্কস্‌বাদ সাম্যবাদ অপেক্ষা অনেক বড়। মার্কস্‌বাদ শুধু সাম্যবাদেরই দর্শন নয়; সমগ্র মানব সভ্যতা, সমাজ বিবর্তন, সবই মার্কস্‌বাদের অন্তর্ভুক্ত।

আজ যদি আমরা এমন এক সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পড়ি যেখানে সমাজ সবে আদিম সাম্যবাদ থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, সে অবস্থায় মার্কস্‌বাদ অনুযায়ী আমাদের কর্তব্য সেই বিবর্তনকে সাহায্য করে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সাহায্য করা। কারণ একবার সেই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হ'লে তখন সেই ব্যবস্থার মধ্যে থেকে তার পরবর্তী বনেদ তৈরি করতে সক্ষম হবো; এবং মার্কস্‌বাদী হিসাবে সুদূর প্রসারিত দৃষ্টি থাকার দরুন এবং পরবর্তী ব্যবস্থা সম্বন্ধে ধারণা থাকায় সেই

প্রক্রিয়াকে সরল নির্দ্দিষ্ট ও প্রয়োজনীয় পথে সচেতনভাবে পরিচালিত করতে পারবো।

মার্কস্‌বাদের ঠিক এই দিকটাই আমাদের দেশে অশ্রদ্ধেয়। যদি আমরা মার্কস্‌বাদ বলতে যুক্তিবাদী, ন্যায়সঙ্গত এবং বস্তুবাদী চিন্তাধারা বুঝি, কতকগুলি স্থির সিদ্ধান্তের সমষ্টি নয়, তা হ'লে আমরা মার্কস্‌বাদী হ'য়েও যে কোন অবস্থাতেই বাস্তববাদীর মত কাজ করতে পারবো। কিন্তু যদি এই সব বাস্তবকে মেনে না নিই তাহলে আমরা প্রকৃত মার্কস্‌বাদী হ'তে পারবো না; কারণ ভবিষ্যত কার্যসূচী সবই ভ্রান্ত আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আমরা ঠিকভাবে বিচার করতে বা পরবর্তী পর্যায়ে দ্রুত পৌঁছাতে সক্ষম হব না।

মার্কস্‌বাদ, শুধু কতকগুলি স্থির নির্দেশের সমষ্টি নয়। মার্কস্‌বাদী কয়েকটি স্থির সূত্রকেই চিরন্তন সত্য বলে মেনে নিতে হয় না। মার্কস্‌বাদ জীবনের দর্শন কিন্তু তাতে শুধু সাম্যবাদীর জীবনই বুঝায় না বুর্জোয়ার জীবনের সঙ্গেও এর সম্বন্ধ আছে। মার্কস্‌বাদ আমাদের সামনে মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসকে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করেছে। মার্কস্‌বাদে বিবর্তনের শেষ কোথাও নেই, তাই আমাদের পক্ষে মার্কস্ যা বলে গেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করারও প্রয়োজন নেই। মার্কস্‌বাদীর পক্ষে আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে মার্কসে্‌র শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি সব কিছুরই পুনরায় বিচার বিশ্লেষণ করে যদি প্রয়োজন হয় তো তা পরিবর্তন করা শুধু যুক্তিসঙ্গতই নয়, একান্ত কর্তব্য এবং তাহাই হচ্ছে প্রকৃত মার্কসী্‌য় রীতি 'ক্যাপিট্যাল' রচিত হওয়ার পরই মানুষের জ্ঞান ও প্রতিভা শেষ হয়ে যায় নি। ইহার পর মানুষের জ্ঞান অনেক বেড়েছে এবং আজ যদি সেই জ্ঞান এবং মার্কসী্‌য় প্রণালীর সাহায্যে আমরা বুঝি যে মার্কস্‌দর্শনের পরিবর্তন প্রয়োজন এবং তখন যদি আমাদের সেই পরিবর্তন করার সাহস না থাকে তাহ'লে বুঝতে হবে আমরা প্রকৃত মার্কস্‌বাদী নই।

আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের জীবন ও চিন্তাধারায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এই সব পরিবর্তন এতই বৈপ্লবিক যে, বহু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরও ধারণা হয়েছে যে বস্তু বাদের ভিত্তি বিনষ্ট হয়ে আবার তত্ত্বজ্ঞানজনিত গনিতবিদ ঈশ্বরের যুগ সুরু হয়েছে। কিন্তু যদি মার্কসে্‌র রচিত বস্তুবাদের যুক্তি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি তাহলে আমরা এই সব নূতন পরমার্থবাদীদের যুক্তি খন্ডন

করতে পারবো না; কারণ মার্কসের সময়ের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি নূতন নূতন আবিস্কারের ফলে আজ ভ্রান্ত প্রমান হয়েছে। মার্কসের সময়ে কতকগুলি অখন্ড ক্ষুদ্র কণার সমষ্টিকে বস্তু বলে কল্পনা করা হোত, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান সেই ধারণা বিনষ্ট করে। সুতরাং যদি আমরা মার্কসের সিদ্ধান্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করি তাহলে হয়তো আমরা গোঁড়া মার্কস্‌বাদী হতে পারি কিন্তু মার্কসের ধারণা অনুযায়ী প্রকৃত মার্কস্‌বাদী হতে পারবো না কারণ বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছাড়া আমরা জড় জগতকে বিশ্লেষণ করতে পারিনা। আজ মার্কস্‌বাদীদের কর্তব্য গোঁড়া বস্তুবাদের মৌলিক সিদ্ধান্তগুলি আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে পরিবর্তিত করা এবং সেই পরিবর্তনের ফলেই বস্তুবাদ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে।

কয়েকটি আধুনিক বাস্তব সমস্যার জন্য মার্কসের চিরাচরিত পন্থা মেনে চলা অসম্ভব। এই মার্কসীয় পথ একশো বৎসর পূর্বেকার ইউরোপীয় পরিস্থিতি এবং ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থার বিশ্লেষণের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতীয় সমাজের বিশ্লেষণ মার্কসের রচনায় আমরা পাইনা। তার কারণ তৎকালীন ইউরোপে ভারত সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিলনা। সুতরাং একথা আমরা বলতে পারি না যে, ইউরোপীয় বিবর্তনের যে ধারা মার্কস্ রচনা করেছিলেন তা ভারতেও প্রযোজ্য: এমনকি ইউরোপের বর্তমান ঘটনাগুলিও মার্কসের পন্থা অনুযায়ী ঘটছেনা। নূতন নূতন অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে যা মার্কস কল্পনা করেননি এবং যা বর্তমান পরিস্থিতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

মার্কস্‌বাদ উপলব্ধি করতে গেলে একমাত্র তৎকালীন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ভিত্তিতেই তা করা যাবে। মার্কস্‌বাদের ভিত্তি হচ্ছে যুক্তিবাদ। ইউরোপের জাগৃতি আন্দোলন থেকেই মার্কস্‌বাদের সৃষ্টি। মধ্যযুগের চিন্তাধারা বর্জন করে ইউরোপীয় সমাজ তিনশো বৎসর অন্ধকারে আলো খুঁজে বেড়িয়েছে; অবশেষে ইউরোপীয় সমাজ মার্কস্‌দর্শন সৃষ্টি করে। সেই তিনশো বৎসরের জ্ঞানের সমষ্টি মার্কস্‌বাদ। সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখলে অবশ্য মার্কস্‌বাদের মধ্যে খুব বেশি কিছু একটা নূতনত্ব পাবো না। মার্কসের পূর্বেকার আরও অনেকের ইতিহাসের বিশ্লেষণে আমরা মার্কস্‌বাদের পরিচয় পাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে গিবনের "রোম সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন"। ইহা মার্কসের বহু পূর্বে লেখা। ষষ্ঠদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যে চিন্তাধারা ও শিক্ষাধারা ইউরোপে চলে আসছিল তারই শেষ পর্যায় মার্কস্‌বাদ।

মার্কস্রে পূর্বে ইউরোপে দার্শনিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক - বড় বড় বিপ্লব ঘটে। এইসব বিপ্লবের ইতিহাস আমাদের পড়তে হবে - শিখতে হবে; এদের সামাজিক প্রতিফল, দার্শনিক আদর্শ এবং ভিত্তি আমাদের বুঝতে হবে। যে চিন্তাধারা এসব বিপ্লবের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভিত্তি ছিল, আমাদের দেশের আমূল পরিবর্তনের জন্যও সেই সবের সৃষ্টি করতে হবে, যাতে করে বহু সংখ্যক জনসাধারণ মার্কস্বাদ মেনে নেয় এবং মার্কস্বাদকে বাস্তবে পরিণত করতে যত্নবান হয়। তাই আমাদের দেশে মার্কস্বাদীকে এই সব বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রবর্তক হিসাবে, জাগৃতি আন্দোলনের নেতা হিসাবে কাজে নামতে হবে। যে দার্শনিক বিপ্লব, সমাজের যে সব পরিবর্তন, মার্কস্রে পূর্বে সাধিত হয় এবং মার্কস্বাদকে মানুষের চিন্তাধারার এক প্রয়োজনীয় রূপ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে - তারই অগ্রদূত হতে হবে আমাদের দেশের মার্কস্বাদের প্রবর্তকদের।

যাদের একটুকু ন্যায় বোধ আছে, তাদের এবং অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকেও অতি সহজে বোঝান যাবে যে, কিভাবে শ্রমিকরা শোষিত হচ্ছে; এবং সেই জন্যেই ধনতন্ত্রের উচ্ছেদের প্রয়োজন। কিন্তু যত দিন সেই যুবকবৃন্দ ধর্মাত্মক এবং আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় মগ্ন থাকবে ততদিন কার্যক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা পাওয়া যাবেনা। যতক্ষন পর্যন্ত না মানুষ মার্কস্বাদের এই মূল দার্শনিক তত্ত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, সে নিজেই তার ভাগ্যবিধাতা, জগৎকে সে ইচ্ছামত গড়ে তুলতে পারে এবং মানুষের শক্তিই জগতের শ্রেষ্ঠ শক্তি, ততক্ষন পর্যন্ত কাউকে সাম্যবাদী তৈরি করা যাবে না। ইহার একমাত্র উপায় যুক্তিবাদ প্রচার করা এবং শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা প্রচলন করা। আমরা আজও বেশ কল্পনা ও তত্ত্বজ্ঞানপ্রিয়। তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে মার্কস্বাদ প্রচার করলে তার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। আজ আমাদের দেশে মার্কস্বাদের একমাত্র মূল নীতিগুলিই প্রসার লাভ করতে পারে; এবং দর্শন হিসাবেও ইহা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, যদিও দার্শনিক ক্ষেত্রেই ইহা সর্বাপেক্ষা বেশি বাধাপ্রাপ্ত হবে। মার্কস্বাদের বিরুদ্ধে এই দার্শনিক যুক্তি গোঁড়া মার্কস্বাদ দ্বারা খন্ডন করা যাবেনা; তা করতে হবে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা দিয়ে। যুক্তিবাদই পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ধর্মের ভিত্তি প্রথম শিথিল করে, ভারতেও তার প্রয়োজন। ধর্মাত্মক ভাব পরিত্যাগ না করতে পারলে মানুষ বুদ্ধি বিবেচনার সঙ্গে জীবনের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারবে না। ইহা কিছুতেই কল্পনা করা যায় না যে, কোনও

লোক যে ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ, সে কার্লমার্কস্‌ের একখানা বই পড়েই মার্কস্‌বাদী হয়ে যাবে। ইহা শুধু অন্ধ বিশ্বাস। শ্রমিক শ্রেণী জীবনের অভিজ্ঞতার ফলেই সাম্যবাদী হয়। বুদ্ধিজীবির পক্ষে মার্কস্‌বাদী হওয়া অনেক বেশি কঠিন। বুদ্ধিজীবির পক্ষে মার্কস্‌বাদ সম্বন্ধে কোন মত গঠন করতে হলে মার্কস্‌বাদের মূল তত্ত্বের সাথে সবিশেষ পরিচিত হতে হবে। মার্কস্‌বাদ সম্বন্ধে এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি আমাদের দেশে কদাচ দেখা যায়। সুতরাং মার্কস্‌বাদ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে হ'লে প্রথমেই, যে দার্শনিক আন্দোলনের ফলে মার্কস্‌বাদের সৃষ্টি হয়, সে সম্বন্ধে শিক্ষা করতে হবে। আমাদের জানতে হবে যে কেন মার্কস্‌বাদ বিপ্লবের এবং মানব সমাজের ভবিষ্যতের দর্শন। মার্কসবাদ হলো বাস্তববাদ এবং ইহাতে প্রত্যেকটি ঘটনা যুক্তি দ্বারা বিচার করা হয় এবং সমস্ত রকম অন্ধবিশ্বাস বর্জন করা হয়। আমরা যদি প্রকৃত মার্কস্‌বাদী হই তাহ'লে মার্কস্‌ যা লিখে গেছেন তাও অক্ষরে অক্ষরে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে বিচার করে দেখবার সাহস থাকা আমাদের প্রয়োজন। যতদিন না মার্কস্‌বাদের এই প্রকৃত ঐতিহ্য আমরা গ্রহন করতে পারবো ততদিন মার্কসবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদি বুলি আওড়ে আমরা উপকার না করে আরো অপকারই করবো।

মার্কসীয় নীতি হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ ও ফয়েরবাকের বিজ্ঞানসম্মত মনুষ্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যুগ যুগান্তরের ধর্মাত্মক, ঐশ্বরিক ও পরমার্থিক রীতিনীতি অগ্রাহ্য করে, ফয়েরবাক্‌ মানুষকে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে স্থান দেন, এবং মানুষের মাপ কাঠিতেই সবকিছুর, এমনকি সামাজিক ও ধর্মাত্মক রীতিনীতির, বিচার ও বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু ফয়েরবাক মানুষকে অবাস্তব রূপে গণ্য করেন; মার্কস্‌ ও এঙ্গেলস্‌ ফয়েরবাকের সেই ধারণাকে বাতিল করে মানুষকে চিরপরিবর্তনশীল সামাজিক জীব হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। সামাজিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর দ্বন্দ্ববাদীয় বিচারের ফলে ফয়েরবাকের মনুষ্যবাদ মার্কস্‌বাদে পরিণত হয়, রূঢ় সমালোচনার দ্বারা ফয়েরবাকের তত্ত্ব নূতন ভাবে প্রতীয়মান হয় এবং পরমার্থিক তথ্যের প্রকৃত মনুষ্য ভাব প্রকাশিত হয়। জীবতত্ত্বের আবিষ্কারের দ্বারা ঈশ্বরবাদের রহস্য ও ধর্মের মূল উদ্‌ঘাটিত হয়, এবং আত্মার অভিব্যক্তিই যে বিশ্বাস তাও প্রকাশ পায়। কিন্তু ফয়েরবাকের দর্শনের প্রধান দুর্বলতা ছিল তার মূল ভিত্তিতেই। ফয়েরবাকের মতে, মানুষের

স্বত্তাই তার বিবেক বুদ্ধি পরিচালনা করে এবং এই স্বত্তা তার নিজস্ব নিয়মাধীন; কিন্তু কী এই নিয়ম বা কী ভাবে তারা চালিত হয়, এ সম্বন্ধে ফয়েরবাক কোন উত্তর দেন নি। মানুষকে দিয়েই সব কিছুর ব্যাখ্যা করা হলো কিন্তু মানুষ নিজেই রইলো অজানা, অপরিবর্তনীয়, চিরস্থির।

মার্কস্ বলেন যে মানুষর বিবেক তার ব্যবহারিক জীবনের উপর নির্ভর করে; কিন্তু এই ব্যবহারিক জীবন আবার সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়; এবং মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং তার চিন্তাধারার বিকাশও এই পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। "মানুষ অবিনশ্বর, অপরিবর্তনীয়" এই ধারনা থেকেই সম্ভবতঃ আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছাই যে, মানুষের চিন্তাধারা সব অবস্থাতেই এবং সব কালেই এক। চিরন্তন সত্য এবং অবিনশ্বর নৈতিক আদর্শ এই অপরিবর্তনীয় ধারনার উপসংহার। মানুষের সত্ত্বা ও বিবেক সম্বন্ধে যত কিছু দ্বৈত ভাব তা, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের এই মতামত দ্বারা দূর হয় যে, "নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে পরিবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজের প্রকৃতিকেও পরিবর্তন করে" (মার্কস্) ।

জীবনের সংগ্রাম মানুষ ব্যক্তিগতভাবে করে না, সমষ্টিগত ভাবে করে। ইতিহাসের শুরু থেকেই মানুষ সামাজিক জীব। তাই মানুষের স্বত্তা ও তার চিন্তাধারা সামাজিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। ইতিহাসের ব্যাপক ও বিস্তৃত চর্চা এবং অনুসন্ধানের ফলে মার্কস্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন যে, মানুষের বিবেক তার জীবন ধারনের প্রণালীর উপর নির্ভর করে; কারণ তার অর্থোপার্জনের এবং জীবন যাত্রার ধারার উপরই, মানুষের চিন্তাধারা ও তার প্রকাশ নির্ভর করে। ধর্ম, দর্শন, কান্তবিদ্যা, আইন কানুন - সবই সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আদর্শের বিভিন্ন রূপ।

মানুষ যখনই উপলব্ধি করে যে, সামাজিক জীব হিসাবে সে নিজেই তার ভাগ্য বিধাতা তখনই সে ভূয়ো পরমার্থিক নৈতিক আদর্শের বাদবিচার ও অত্যাচার থেকে নিজেকে মুক্ত করে। চিরন্তন সত্য বা ভাল মন্দর অবাস্তব ধারণা জীবনের আদর্শ নয়। জীবনের আদর্শ - পরিবর্তন, অগ্রগতি এবং উন্নততর অবস্থায় পরিবর্তিত হওয়া। এই নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতি মানুষ তার স্বীয় অর্জিত সামাজিক জ্ঞানের সাহায্যে সম্পন্ন করে। মানুষের আদর্শ ও ধারণা চিরপরিবর্তনশীল। মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাস সেই

পরিবর্তনের প্রতিকৃতি। পুরাকালে সামাজিক পরিবর্তন কোন নিয়মাধীন ছিলনা, তাই এই ধারণা হয়েছিল যে, মানুষের জীবন এক অলৌকিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত। বিজ্ঞানের সাহায্যে আজ মানুষ তার নিজের ভবিষ্যত নির্ধারণ করবার ক্ষমতা অর্জন করেছে, আজ সামাজিক পরিবর্তন পূর্বকল্পিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবর্তন করা সম্ভব। মানুষের নৈতিক আদর্শকে এভাবে গঠন করতে হবে যাতে মানুষের ভবিষ্যত সামাজিক সংগঠনে তা সাহায্য করে। একমাত্র সমষ্টিগত সামাজিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আদর্শ ও মাপকাঠিতে, সকলের পক্ষেই যা মঙ্গল জনক - তাই ধার্য এবং গ্রাহ্য হবে। সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধারণারও পরিবর্তন হওয়া উচিত।

চিরন্তন অপরিবর্তনীয় আদর্শ হিসাবে নীতি প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার সমর্থনের দার্শনিক ভিত্তি। সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রয়োজন এবং এই পরিবর্তনকে সাহায্যকরার জন্য নৈতিক আদর্শের যে বাস্তব ও পরিবর্তনশীল ধারণার প্রয়োজন - তা সমর্থন না করে এবং সমাজের পরিবর্তে মাত্র কয়েকজনের স্বার্থ রক্ষায় প্রবৃত্ত হয়ে, নীতি তার স্বীয় আদর্শকেই ব্যর্থ করছে।

ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদির ধারণার উপরই চিরাচরিত নীতি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই সব আদর্শের কখন কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নির্ধারণ করা হয় নি বা কোন ব্যাখ্যা করা হয় নি। সামান্য আলোচনা বা বিচার করলেই ইহাদের বৈপরীত্য এবং অযৌক্তিকতা প্রকাশ পায়। প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে মঙ্গলজনক এবং তার সমর্থক না হলেই, তাকে কুআখ্যা দেওয়া হয়। সর্বসাধারণের মঙ্গলার্থে যখন কোন সামাজিক পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হয়, তখন জাগৃতিশক্তি প্রচলিত 'সু' কে অগ্রাহ্য করে, চিরাচরিত শ্রদ্ধেয় আদর্শকে ধ্বংস করে। তাই বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত সমাজে যা মন্দ, ভবিষ্যতের পক্ষে তাই ভাল। প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক পরিবর্তনের জন্য, জীবনের মৌলিক আদর্শের ভিত্তিতে ইহা সাধিত হয়।

ক্যান্ট যুক্তিবাদের আদর্শের নীতিকে গড়ে তোলবার বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর আনুমানিক স্থির সিদ্ধান্তের সঙ্গে প্লেটোর মতের মূলতঃ কোন প্রভেদ নেই। 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' এর চিরন্তন আদর্শের উপর প্লেটোর দর্শন প্রতিষ্ঠিত, এর মধ্যে সত্যম্ এবং সুন্দরম্ পার্থিব জগতের স্থান-কাল-পাত্র জনিত

সীমার অতীত ভূমা বিশেষ। কিন্তু নৈতিক স্বাধীনতা ও ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা এই জগতেরই ব্যাপার - অসীমের নয়। সেই জন্যই পার্থিব সংজ্ঞার প্রয়োজন এবং কান্টিয় মতানুবর্তী দার্শনিকেরা তা' উপলব্ধি করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, জ্যাকবীর মতে নীতির শেষ অনুমোদন অতিমানবীয় তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যুক্তিবাদী পরমার্থিক নৈতিক দর্শনের সার এই যে, বিশ্বাসই সবের মূল এবং ইহাই দর্শনের শেষ জ্ঞান। এই মতবাদই ক্যান্টিয় দর্শনের উপসংহার। ফলে, কতকগুলি অবাস্তব আদর্শে বিশ্বাসই নীতির মূল ভিত্তি হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, 'পরমার্থিক নৈতিক আদর্শ' ঐশ্বরিক আদর্শেরই রূপান্তর ওঠে।

কিন্তু যখনই চিরন্তন সত্যের এই বিরাট মিথ্যা প্রকাশ পায় তখন নৈতিক দর্শনের সমস্ত ভিত্তি চূর্ণ হয়ে যায়। এই বৈপ্লবিক জ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যেই সম্ভব এবং আধুনিক বিজ্ঞানের দার্শনিক মতবাদ হলো মার্কস্‌বাদ।

নৈতিক আদর্শ চিরন্তন স্থির সত্য নয়, ইহা আপেক্ষিক সংজ্ঞা মাত্র। একের পক্ষে যা ভাল অপরের পক্ষে তা ভাল নাও হতে পারে, হয়তো অপরের পক্ষে তা. অত্যন্ত মন্দ। সময়ের সাথে সাথেও আবার এই ভাল মন্দর ন্যায্যতা পরিবর্তিত হয়। আজ যা ভাল কাল হয়তো তা ভাল নাও থাকতে পারে। সমস্ত নৈতিক আদর্শই এই রকম আপেক্ষিক সংজ্ঞা মাত্র। বস্তুর অপেক্ষা অবাস্তব গুণের আদর আরও বেশি ভ্রমাত্মক। এই আদর্শের সঙ্গে পার্থিব জগতের কোন সংশ্রব নেই। এই সব পরমার্থিক ও ধর্মাত্মক ভিত্তিকে শিথিল করে দিয়ে বিজ্ঞান নৈতিক আদর্শে এক বৈপ্লবিক পরবর্তন এনে দিয়েছে।

এই সব পরমার্থিক বাদ বিচারের অত্যাচার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মনুষ্যবাদ প্রথমে এক ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। ধর্ম এবং নীতির এই অত্যাচারের অবসান করতে হলে ভুয়ো ঈশ্বরবাদকে বিনষ্ট করে, তার পরিবর্তে মানুষের আচার ব্যবহারের আদর্শ হিসাবে বাস্তবিক, মূলগত ও প্রমাণযুক্ত সত্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মনুষ্যবাদ দ্বারা ইহা সম্ভব নয়। মনুষ্যবাদ ঐশ্বরিক ক্ষমতাকে বিনষ্ট করে কিন্তু তার পরিবর্তে অতিমানুষকে প্রকৃতি অপেক্ষা উচ্চতর স্থানে প্রতিষ্ঠা করে।

ইতিহাসের প্রত্যেকটি মুহূর্তে এবং ব্যক্তিগত জীবনের প্রত্যেকটি রূপে, মানুষের জীবন ও আদর্শ নির্ভর করে তার সাময়িক, ঐতিহাসিক, সামাজিক পরিবেশ এবং বিশেষ বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। কিন্তু ঈশ্বরবাদের

বাস্তবতা দূর করে তার পরিবর্তে অতি মানুষের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করলে অবস্থার কোন প্রভেদ হয়না। "আত্মার অমরতা ঐশ্বরিক ক্ষমতা বা পরমার্থিক নৈতিক আদর্শ অপেক্ষা মানুষের প্রকৃতির চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় এবং স্বভাবজাত সদ্‌ভাবের আদর্শ অধিকতর প্রত্যক্ষ সত্য নয়"।

যখনই মানুষ অনুভব করে যে সে এই পার্থিব জগতেরই এক অংশ তখনই সে অবাস্তবতার ধোঁয়া এবং ঈশ্বরবাদের অত্যাচার থেকে মুক্ত হতে পারে। দর্শন হিসাবে কার্যকরী হতে হলে মনুষ্যবাদকে প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক হতে হবে, নৈতিক হলে হবে না। মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবধারা এবং অন্যান্য অভিব্যক্তি পার্থিব জগতেরই অংশ বিশেষ, সুতরাং মানুষের স্বভাবও প্রকৃতির ব্যাপারের ন্যায় পরিবর্তনশীল। ভ্রমাত্মক ধারণা মানুষের ভাল মন্দ বিচারের শ্রেষ্ঠ আধার হতে পারেনা। সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকলেই বোঝা যায় যে, মানুষের প্রকৃতি অপরিবর্তনীয় নয়।

পার্থিব এবং সামাজিক পরিবেশের উপর, এবং স্থান ও কালের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের নৈতিক আদর্শও পরিবর্তিত হয়। মানুষ সামাজিক জীব; তাই সমাজের সমষ্টির রক্ষণাবেক্ষনের জন্য সে যা করে এবং যা তাকে করতে হয়, তার উপরই তার স্বভাব ও প্রকৃতি নির্ভর করে। মনুষ্যসমাজ চিরস্থির নয়; ইহা পরিবর্তনশীল। সমাজের অস্তিত্বের উপায় ও নির্বন্ধ এবং সমষ্টিগত মঙ্গলের আধার, মানুষের নৈতিক আদর্শকেও পরিবর্তিত করে। সমাজের বাহিরে মানুষের ব্যক্তিগত কোন সত্তা নেই। সমষ্টিগত ভাবেই সে তার সত্তা অনুভব করে, যদিও সমাজ ব্যক্তিগত মানুষের কোন চিহ্নই বহন করেনা। সামাজিক পরিবেশের উপরই ব্যক্তিগত সত্তা নির্ভর করে। ঐতিহাসিক এবং সামাজিক বিবর্তনের প্রতিচ্ছবি হচ্ছে মানুষ। নৈতিক দর্শন ও আদর্শ আসলে সামাজিক দর্শন ও আদর্শ। সামাজিক প্রয়োজনীয়তার উপরই বাদবিচার প্রতিষ্ঠিত এবং সমষ্টিগত মঙ্গলের উপরই সেই নৈতিক আদর্শের বিচার হবে।

নৈতিক দর্শন যখন কোন প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার রক্ষার জন্য সমষ্টির মঙ্গলের বিরুদ্ধে কোন বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ সমর্থন করতে প্রবৃত্ত হয়, তখন নৈতিক দর্শন অবাস্তব গুণের ভ্রান্ত পরমার্থিক আদর্শের আশ্রয় নেয়। অন্যায় সমাজ ব্যবস্থার সমর্থন এই কাল্পনিক, ঐশ্বরিক নৈতিক আদর্শ দ্বারাই সম্ভব হয়। এই অবিনশ্বর অপরিবর্তনীয় নৈতিক আদর্শই ঈশ্বরবাদের ভিত্তি। আজ যে

পৃথিবী এই অবস্থার উন্নীত হয়েছে তার কারণ বিবর্তনের চাপে ইহার অন্যথা হওয়ার উপায় ছিলনা। মার্কস্‌বাদ নৈতিক দর্শনকে এই সব ভুয়ো অবাস্তবতার থেকে উদ্ধার করেছে।

ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা
(Historical Role of Islam)

ইসলামের ইতিহাস চর্চা করতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে তার অভ্যুত্থানের আপাতপ্রতীয়মান আকস্মিকতা। আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তার প্রসারও তেমন নাটকোচিত ঘটনাসঙ্কুল, নাটকীয়ভাবে গতিময়। ইসলামের ইতিবৃত্ত তাই সমগ্র মানোবেতিহাসের একটি চমকপ্রদ অধ্যায় হিসাবে গণ্য হওয়ার দাবী রাখে। এই পর্বটির নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ আজ প্রাসঙ্গিক।

মহম্মদ ছিলেন আরব দেশের মানুষ। তাঁর অনুগামীদের একটা অংশ কিন্তু ভারতবর্ষের অধিবাসী। একটা ব্যাপার অনেক সময়ই আমরা খেয়াল করি না যে, যে কোনও ইসলামি দেশের তুলনায় ভারতবাসী মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেশি। বহু শতাব্দী ধরেই তাঁরা এদেশের নাগরিক। তা সত্ত্বেও বিরাট সংখ্যক এই দেশবাসীদের কিন্তু বহিরাগত বলেই মনে করা হয়। এই মনোভাব যতটা অসমীচীন তার চেয়েও বেশি উদ্বেগজনক ঃ ভারতের জাতিসত্তা এমনিতেই তেমন সুসম্বদ্ধ নয়; মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রাখার ফলে সেই অসম্বদ্ধ জাতিসত্তায় আরও একটা ফাটল দেখা দিয়েছে।[১]

সমস্যাটির উদ্ভব অবশ্য অকারণে ঘটে নি। ভারতবর্ষে প্রথম মোসলেম পদক্ষেপের সময়ই আমরা অশুভ এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। বিদেশি আক্রমণকারী হিসাবে সেদিন তাদের আগমন। ভারতবর্ষ তাঁরা জয় করলেন, বেশ কয়েক বৎসর ধরে শাসনও করলেন। সম্পর্কটা ছিল তখন বিজেতা বিজিতের। সেই সম্পর্কের ছাপ স্বভাবতই জাতির ইতিহাসে মুদ্রিত রয়েছে।

ভারতবর্ষের বেশিরভাগ মানুষ গোঁড়া হিন্দু-মুসলমান মাত্রই তাদের কাছে 'ম্লেচ্ছ' অশুচি, বর্বর। নিজেদের সমাজের নিম্নতম বর্ণের মানুষের প্রতি যে ধরনের আচরণে এরা অভ্যস্ত, তার চেয়ে ভাল ব্যবহার - এদের বিচারে কোনও মুসলমানেরই প্রাপ্য নয়। মুসলমান যতই সদ্বংশজাত হ'ক, সুশিক্ষিত

হ'ক, সংস্কৃতিবান হ'ক - গোঁড়া হিন্দুর বিচারে কোনও ব্যতিক্রম নেই। গোঁড়ামির ফলে দেশে আজ এক সঙ্গীন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে।

অনমনীয় এই মনোভাব অবশ্য অকারণে বা আপতিক কারণে সৃষ্টি হয় নি। বিজিত জাতির উপর উৎপীড়ন যেমন স্বাভাবিক, বিদেশি আক্রমণকারীর প্রতি বিজিত জাতির ঘৃণার উদ্রেকও তেমনই স্বাভাবিক। অতীতে হিন্দু মানসে বিজয়ী মুসলমানদের জন্য যে ঘৃণা সঞ্জাত হয়েছিল, আজকের অযৌক্তিক বিরূপতা তারই পরিণাম। ঘৃণার প্রত্যক্ষ কারণটির - অর্থাৎ যে রাজনৈতিক সম্পর্কের ফলে ঘৃণার জন্ম, সেই সম্পর্কটির - বহুকাল আগেই অবসান ঘটেছে। তা সত্বেও কিন্তু অশ্রদ্ধা আজ পূর্ণমাত্রায় সক্রিয়। জাতীয় সংহতির পক্ষে বিরাট বাধা এই অশ্রদ্ধা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকে পক্ষপাতদুষ্ট করে তুলেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী পাশাপাশি বাস করেও হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। দীর্ঘকালের প্রতিবেশীদের মধ্যে এই ধরনের মানসিক দূরত্ব প্রায় নজিরবিহীন। বস্তুত কোনও সভ্যসমাজের মানুষই ইসলাম সম্বন্ধে হিন্দুদের মতো এমন অজ্ঞ নন; মুসলমান ধর্মকে এত অবজ্ঞাও তাঁরা করেন না।

ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতা আমাদের জাতীয়তাবাদের একটি প্রধান লক্ষণ। এবং এই প্রবণতা মুসলমান ধর্মের ক্ষেত্রেই সমধিক স্পষ্ট। মুসলমান ধর্মমত সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাগুলিও নিতান্ত অজ্ঞতাপ্রসূত। ইসলামের অন্তর্নিহিত বিরাট বৈপ্লবিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষিত হিন্দু প্রায় কিছুই জানেন না; সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনার প্রভাব কতটা কার্যকর হতে পারে তা স্বভাবতই তাঁর কল্পনার বাইরে। ইসলামের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

ইসলাম সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাগুলি নিতান্তই হাস্যকর। শুধু তাই হলে অবশ্য ধারণাগুলিকে গুরুত্ব না দিলেই চলত। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়, ধারণাগুলি বিপজ্জনকও বটে। ভারতবাসীর স্বার্থে, বিজ্ঞানের স্বার্থে এবং ঐতিহাসিক সত্যের স্বার্থে ঐসব বিভ্রান্তিমূলক ধারণার অপনোদন আবশ্যিক। ভারত ইতিহাসের এই যুগ সন্ধিক্ষণে ইসলামের সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের প্রকৃত মূল্যায়ন আজ সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গিবন এর মতে - ইসলামের অভ্যুত্থান এবং প্রসার "বিশেষভাবে স্মরণীয় একটি বৈপ্লবিক ঘটনা: এই বিপ্লব সকল জাতিরই

জনমানসে চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছে''। ইসলামের অভ্যুত্থানের আগে 'সাধারণ বেদুইন' ছাড়া আরবদের কোনও পরিচয় ছিল না, নূতন ধর্ম বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা মরুভূমি থেকে বেরিয়ে পড়ল; এবং প্রাচীন যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী দুটি সাম্রাজ্য তাদের আক্রমণে ভেঙে পড়ল। এবং সমস্ত ব্যাপারটা বিস্ময়কর গতিময়তার সঙ্গে নিষ্পন্ন হল।

ধর্মপ্রচারক হিসাবে মহম্মদ ছিলেন অনন্য ঃ তলোয়ারের মাধ্যমে তিনি শান্তির বাণী প্রচার করেন। পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই তাঁর অনুগামীরা বিরাট এক ভূখন্ড - ভারতবর্ষের সীমানা থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র এলাকা জয় করে সেখানে ইসলামের বিজয় পতাকা উত্তোলন করেন। দামাস্কাস-খলিফাদের সাম্রাজ্য এত বিস্তার লাভ করেছিল যে সবচেয়ে দ্রুতগামী উটের পিঠে চড়েও পাঁচ মাসের আগে সেই সাম্রাজ্য পার হওয়া যেত না। হিজরা২-র প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে এই খলিফারা 'বিশ্বাসীদের অধিনায়ক' আখ্যায় ভূষিত হন। এঁরা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সম্রাট হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

ধর্মগুরু মাত্রই কিছু অসাধারণ ক্ষমতার দাবি করেন, বিস্ময়কর কিছু কর্মকান্ডের মাধ্যমে দাবি প্রতিষ্ঠা করেন। মহম্মদ তাঁর ব্যতিক্রম নন। তবে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ধর্মগুরুর তুলনায় তিনি প্রামাণ্য। ইসলামের প্রসারই সকল বিস্ময়ের সেরা বিস্ময়। এই উক্তিটি শুধু কথার কথা নয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকেই এর যথার্থ বোঝা যাবে।

অগস্তস্ রোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবার পরে রোমানরাও দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বড় বড় বেশ কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভও করেছিলেন তাঁরা; পরবর্তীকালের বীর ত্রায়ন্ এর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিও ঘটে। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তারের জন্য সময় লেগেছিল কয়েকশ' বছর। অপরপক্ষে একশ বছরেরও কম সময়ে আরব সাম্রাজ্য যে আয়তন লাভ করেছিল, রোমান সাম্রাজ্য তার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারে নি। আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যও খলিফাদের সাম্রাজ্যের তুলনায় একটা ভগ্নাংশ মাত্র। পারস্য সাম্রাজ্য কয়েকশ' বছর ধরে রোমের প্রচন্ড অস্ত্রশক্তিকে প্রতিহত করেছিল। এই প্রতিরোধ ক্ষমতা কিন্তু 'আল্লাহ্‌র তরবারি'র সামনে দশ বছরও টিঁকতে পারে নি। ইসলামি অভ্যুত্থানের বিস্ময়করত্ব বিষয়ে ঐতিহাসিক ফিশার

লিখেছেন[৩] ঃ

"আরবরাষ্ট্রের চিহ্নমাত্র কোথাও ছিল না - চিহ্ন ছিল না স্থায়ী কোনও সেনাবাহিনীর, সর্বগ্রাহ্য কোন রাজনৈতিক আদর্শের। আরব দেশের মানুষ রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাত না - তারা ছিল কবি, স্বপ্নবিলাসী যোদ্ধা বণিক। ধর্মের মধ্যেও তারা ঐক্যের বা স্থায়ীতার সূত্র খুঁজে পায় নি - অনুন্নত বহুদেববাদ না এনেছিল সংহতি, না দিয়েছিল সামাজিক শৃংখল।... অখ্যাত এই অসভ্যরাই কিন্তু একুশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী গোষ্ঠী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হল। তারা সীরিয়া এবং মিশর জয় করল; বিপুলবিক্রমে পারস্যকে অভিভূত করে নতুন ধর্মে দীক্ষা দিল; নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করল তুরস্কে, পাঞ্জাবের এক অংশেও; বাইজান্টীয় এবং বেরেবের[৪]-দের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল আফ্রিকা; ভিসিগথদের হাত থেকে কেড়ে নিল স্পেন। পশ্চিমে ফ্রান্স এবং পূর্বে কন্সটান্টিনোপ্‌ল্ - দুই মহাশক্তির পক্ষেই তারা বিপদ সৃষ্টি করল। আলেকজান্দ্রিয়ায় এবং সীরিয়ার বন্দরগুলিতে তৈরি হল জাহাজের পর জাহাজ - গড়ে উঠল শক্তিশালী আরব নৌবহর। এই সব জাহাজ ভূমধ্যসাগরে টহল দিয়ে বেড়াত, গ্রিসের বিভিন্ন দ্বীপে হানা দিয়ে লুঠপাট করত, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের নৌবাহিনীর সঙ্গেও শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হত। এই বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছিল প্রায় বিনা বাধায়, গুরুতর কিছু বাধা এসেছিল শুধু পারস্যের অধিবাসী এবং এ্যাটলাস পর্বতমালার বেরবেরদের কাছ থেকে"।

অভিযানের পর অভিযানে এই ধরনের সাফল্য নিশ্চয় বিরাট বিস্ময়েরই উৎস; রূপকথার শক্তিশালী জাদুর সঙ্গেই এর তুলনা চলে। আমরা ভাবতে বাধ্য হই - অভূতপূর্ব এই ঘটনা সমন্বয় কেমন করে সম্ভব হল? প্রশ্নটি এখনও ঐতিহাসিকদের কাছে জটিল একটি ধাঁধা। অতীতে এই ধাঁধার একটা উত্তর দেবার চেষ্টা হয়েছিল ঃ ইসলাম ছিল হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, বেপরোয়া, গোঁড়া মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত; অন্ধশক্তির বলে বলীয়ান হওয়ার ফলেই সে শান্তিপ্রিয়, পরমতসহিষ্ণু সম্প্রদায়গুলির উপর প্রভুত্ব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। এই তত্ত্বের কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই - আধুনিক সুধীসমাজ এটিকে অগ্রাহ্য করেছেন। গোঁয়ারতুমি নয় - বিপ্লবী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবার স্বভাবী ক্ষমতাই ইসলামের অপ্রত্যাশিত জয়জয়কারের মূল কারণ। শুধু গ্রিস বা রোমে

নয়, পারস্যে, মহাচিনে - এবং ভারতবর্ষেও - প্রাচীন সভ্যতাগুলি ভেঙে পড়ার ফলে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। জনসাধারণকে সেই জীর্ণ, নিরাশ্বাস অবস্থা থেকে নিষ্কৃতির পথ দেখাতে পেরেছিল বলেই ইসলাম সাফল্য অর্জন করেছিল।

ইসলামের উদ্দিষ্ট

ইসলামের সুদূরপ্রসারী বৈপ্লবিক সম্ভাবনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোনও কোনও পণ্ডিত মুসলমানদের সামরিক কৃতিত্বের উপরে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ এই কৃতিত্বকে প্রশংসার চোখে দেখেছেন কেউ বা করেছেন নিন্দা। সারাসেনাদের সামরিক কৃতিত্ব অবশ্যই শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু ঐতিহাসিক ভূমিকা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সামরিক কৃতিত্বকেই যদি একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে ধার্য করা হয়, তাহলে ইসলামের অনন্যতা কোথায়? তাতারী কিংবা সাইথিয়ার বর্বর জাতিরাও - গথ, হূণ, ভ্যান্ডাল, আরব, মংগোল ইত্যাদি - উল্লেখযোগ্য সামরিক কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। ইউরোপ এবং এশিয়ার প্রান্তদেশ থেকে এদের অভিযান শুরু হত পশ্চিম দক্ষিণ ও পূর্বাভিমুখী। জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের মতো এরা সব কিছুকেই প্লাবিত করত, ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের তোড়ে ভেঙে পড়ত সব কিছুই। ...কিন্তু এই সব অভিযান ছিল শুধুই লুণ্ঠনভিত্তিক - আরব ধর্মোন্মাদনার বিস্ফোরণের সঙ্গে এই ধরনের উপদ্রবের পার্থক্য ছিল আকাশ-পাতাল। ইসলাম অল্প সময়ের মধ্যে ফুরিয়ে যায়নি। মানব-প্রজাতির সাংস্কৃতিক বিবর্তনের নতুন একটি পর্বের সূত্রপাত করার ফলে ইতিহাসে তার জন্য একটি স্থায়ী আসন সংরক্ষিত হল। ইসলামের কর্মকান্ডে ধ্বংসসাধনে যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার ভূমিকা ছিল - সামগ্রিক বিচারে নিতান্তই আনুসঙ্গিক মানুষের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশের পথ সেদিন রুদ্ধ হতে চলেছিল। সেই পথ খোলা রাখবার জন্য নতুন ব্যবস্থার প্রয়োজন ঘটেছিল; নূতনকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই ইসলাম সেদিন পুরাতনকে ধ্বংস করেছিল।

সীজারদের প্রচেষ্টায় রোমে, এবং খসরুদের উদ্যমে পারস্যে দুটি মহতী সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। যুগ যুগ ধরে মানুষ যে জ্ঞানসম্পদ অর্জন করেছিল,

ঐ দুটি সভ্যতার ভাণ্ডারে তা সঞ্চিত ছিল। কালের প্রভাবে 'পবিত্র' 'স্বপ্নসৌধ দুটির পতন যখন আসন্ন হয়ে পড়ল, তখন ঐ অমূল্য রত্নভাণ্ডার ধ্বংসস্তুপের নিচে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। ইসলাম এই রত্নরাজিকে শুধু উদ্ধার করেই ক্ষান্ত হয় নি, ভাবীকালের মানুষের জন্য তাদের সংরক্ষণ ও বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা করেছিল। এই কর্তব্যটি সম্পাদনের জন্যই ইসলাম প্রাচীন, আসন্ন ধ্বংস পূতসৌধগুলিকে ধূলিসাৎ করেছিল।

সারাসেন অশ্বারোহীদের দক্ষতা ছিল নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ, কিন্তু এটাই তাঁদের একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল না। এই দক্ষতা আমাদের বিমুগ্ধ করে, বিস্মিত করে এবং এই অসাধারণ প্রাণোচ্ছলতার উৎস-সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করে। ফওজ-এ-এলাহীর-[৫] রণকৌশল ছিল অতুলনীয়, অবিশ্বাস্য, এই চোখ ধাঁধানো নৈপুণ্যের বিবরণ পড়লে ইতিহাসের সাধারণ ছাত্রের - তিনি মুসলমান হলেও - খেই হারিয়ে যায়, ইসলামি বিপ্লবের মহত্তর কীর্তি সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ থেকে যান। বস্তুত, যুদ্ধের পর যুদ্ধে জয়লাভ সমাজ-জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল - সামাজিক ও সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আরও চমৎকার, আরও স্থায়ীফলপ্রদ কর্মকান্ডের সুযোগ মুসলমানদের সামনে উপস্থিত হয়েছিল। যুদ্ধজয়ের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে রাজনৈতিক সংহতি গড়ে উঠল, আবার সেই সংহতি আর্থিক সমৃদ্ধি এবং মানসিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে একটি নবযুগের প্রবর্তন করল। নতুন ধ্যান ধারণায়, নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি সমাজ ব্যবস্থার আবির্ভাব যাতে সম্ভব হয়, তার জন্য রোমের এবং পারস্যের সাম্রাজ্যগুলির বিরাট ধ্বংসস্তূপের অপসারণ আবশ্যিক হয়ে উঠেছিল। মেজাইড গুহ্যতত্ত্বের অন্ধ কুসংস্কার এবং গ্রিক গির্জা - কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি জনমানসকে মারাত্মক রকম কলুষিত করে তুলেছিল; ফলত পারসিক এবং বাইজান্টাইন্ সাম্রাজ্যে নৈতিক তথা মানসিক উৎকর্ষ অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। জরথুস্ত্রের ধর্মতত্ত্ব মানুষকে বিপথগামী করে তুলেছিল; এবং খ্রিষ্টধর্ম আপজাত্যের শিকারে পর্যবসিত হবার ফলে তার মূলধন হয়ে দাঁড়িয়েছিল জাদুভিত্তিক কুসংস্কার, মঠাশ্রয়িতার কালব্যাধি এবং - পৌত্তলিকতারই নামান্তর - সন্তপূজা। মহম্মদের একেশ্বরবাদে অনুপ্রাণিত সারাসেনরা তলোয়ারের সাহায্যে শুধু পৌত্তলিকতারই উচ্ছেদ ঘটাল না, আনুষঙ্গিক বিভিন্ন কুপ্রথা থেকেও মানুষকে মুক্ত করল। মানবজাতির অগ্রগতি অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টায় ইতিহাসের অজেয় অস্ত্র হিসেবে কাজ করাই সারাসেন

সমরশক্তির বিস্ময়কর সাফল্যের মূল কারণ।

প্রাচীন গ্রিসের গৌরবময় সভ্যতা ভাবীকালের জন্য রেখে গিয়েছিল ভাবনাচিন্তা-তথা-জ্ঞানের বিরাট উত্তরাধিকার। সেই অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল, খ্রিষ্টিয় কুসংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। সারাসেন সমরশক্তি এবং ইসলামি একেশ্বরবাদ যে সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করল তারই পক্ষে সম্ভব হয়েছিল গ্রিক উত্তরাধিকারকে পুনরুদ্ধার করা। নতুন সমাজব্যবস্থায় বুদ্ধিবাদ আবার বিকাশ লাভ করল, অবসাদ ও নৈরাজ্যকে জয় করে মানুষ আধুনিক সভ্যতার পত্তন করল। কালক্রমে এই শক্তি সকল ধর্মের - সকল অন্ধ বিশ্বাসের - সমাধি রচনা করেছিল।

আপাতদৃষ্টিতে ইসলামকে বিভিন্ন ধর্মীয় আন্দোলনের অন্যতম বলে মনে করা হয়, কিন্তু সেটাই তার একমাত্র পরিচয় নয়, এমন কি মূল বৈশিষ্ট্যও নয়। প্রধানত একটি রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছিল। আবির্ভাবের একেবারে গোড়ার দিকে কিছু সময় পর্যন্ত এর মূল আবেদন ছিল সংহতির। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আরবের বিভিন্ন বেদুইন গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যসাধন করে ইসলাম মরুভূমির বাইরে পা বাড়াল। এশিয়া এবং আফ্রিকার কোনও কোনও অঞ্চল তখনও রোম সম্রাজ্যের অন্তর্গত। জরাজীর্ণ সমাজব্যবস্থা সেখানে ভেঙে পড়েছে। ইসলামের ধর্মীয় তথা রাজনৈতিক ঐক্যসাধনের আদর্শ ঐ সমাজগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করল। মহম্মদের আগে যীশুখ্রিষ্টও একবার বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু খ্রিষ্টধর্মের বৈপ্লবিক আবেদন কিছুকালের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়। মঠাশ্রয়িতার কল্যাণে খ্রিষ্টিয় ধর্মমত একদিকে যেমন সামাজিক অরাজকতার মতবাদে পর্যবসিত হয়, অন্যদিকে তেমন ধ্বংসোন্মুখ সাম্রাজ্যবাদের অবলম্বন হিসাবে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ফলত বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। সামাজিক সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে খ্রিষ্টধর্মের অধঃপতনও ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে থাকে। ঘুণধরা রোম সাম্রাজ্যের সর্বত্রই তখন দুর্নীতির মোচ্ছব। ব্যতিক্রম ঘটেছিল শুধু আরব সওদাগরদের ক্ষেত্রে। উটের পিঠে বেসাতি চাপিয়ে দল বেঁধে এরা বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করত; নানান, প্রলোভন সত্ত্বেও স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হত না; ঐকান্তিক অধ্যবসায়ের ফলে শ্রীবৃদ্ধি ছিল এদের সুনিশ্চিত;

এরাই সেদিন বয়ে এনেছিল আশা এবং মুক্তির বারতা। বস্তুত 'ইসলামি বিদ্রোহ'-র ফলেই সেদিন মানবসমাজ বর্বরতার অচলায়তন থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

ইসলামি ইতিহাস সম্বন্ধে প্রামাণ্য জ্ঞানের অধিকারী একজন পণ্ডিত মহম্মদের কর্মসাধনা সম্বন্ধে আলোচনাসূত্রে তৎকালীন পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। 'সমগ্র একটি জাতি তাঁর অনুগামী হয়েছিল; তাঁর সমর্থকরা দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল; জ্ঞান ও ক্ষমতার জন্য তাদের আকাঙ্খাও ছিল দুর্নিবার। আরব জনমানসের এই উদ্দীপনাই মহম্মদের সাফল্যকে রূপায়িত করেছিল। পরিস্থিতির এই আনুকূল্যে সেই সময় - মহম্মদের জীবদ্দশাতেই - আরও অনেক ধর্ম প্রবর্তকের আবির্ভাব ঘটেছিল''।

অনেকে ইসলামি ইতিহাসের অতিসরলীকৃত একটি ব্যাখ্যায় আগ্রহী ঃ আরবরা, তাঁদের মতে ছিল একদল বেপরোয়া গোঁড়া যুদ্ধবাজ, বেদুইন, তারা যখন রক্তজমানো চিৎকারে 'আল্লাহ্-হো-আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে নাটকীয়ভাবে আবির্ভূত হত, তখন ভীতিবিহ্বল মানুষের মনে প্রতিরোধের কল্পনাও স্থান পেত না; আরবরা তখন এ সব মানুষের সামনে দুটিমাত্র বিকল্প রাখত - কোরান, অথবা যুদ্ধ। অর্থাৎ মুসলমানদের প্রয়োগসফল সমরপ্রবণতাই - এই ব্যাখ্যানুযায়ী - ইসলামি ইতিহাসের সারবস্তু।

এই ব্যাখ্যাটি যাদের মনঃপূত তারা ইসলামি ইতিহাসের একটি বৈশিষ্ট্য হয় লক্ষ্য করেন নি, নতুবা জেনেশুনেও উপেক্ষা করেছেন। মহম্মদের অব্যবহিত পরেই যাঁরা ইসলামের প্রধান হিসাবে আসীন হয়েছিলেন, শুধু তাঁরাই এই ধরনের ঐহিক-তথা-পারত্রিক বিজয়াভিযানে ব্যস্ত হয়েছিলেন, এবং তাঁরাও মানুষের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন না। অ্যালারিক, অ্যাটিলা, জেনসেরিক, চেঙ্গিস্ খাঁ, তৈমুরলঙ্ প্রভৃতি বর্বরদের সঙ্গে তাঁদের স্বভাবগত পার্থক্য লক্ষণীয়। মহত চরিত্র, উদ্দেশ্যের সততা, নৈতিক পবিত্রতা, প্রভৃতি অনেক সদ্‌গুণে তাঁরা ভূষিত ছিলেন। তাঁদের ধর্মনিষ্ঠা কুসংস্কারের সাহায্যে 'শক্তিসঞ্চয় করে থাকতে পারে, কিন্তু কপটতার দ্বারা কলুষিত হয় নি। গোঁড়ামি থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না বটে, কিন্তু ঔদার্য ও কান্ডজ্ঞান তাঁদের গোঁড়ামিকে সহনীয় করে তুলেছিল। তাঁদের বিজিগীষা ছিল স্বার্থবুদ্ধি থেকে মুক্ত, নিজেদের লোভ-লালসাকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখবার জন্য

তাঁরা ঈশ্বরপ্রেমের ভান করতেন না।

প্রথম খলিফা আবুবকরের কথাই ধরা যাক। তাঁর চেয়ে বেশি বৈচিত্র্যময়, বেশি ধর্মনিষ্ঠ, বেশি অকপট, বেশি বিনয়নম্র মানুষের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না বললেই চলে। 'ফৌজ-এ-এলাহী'-র প্রতি তাঁর একটি অনুজ্ঞা অবিস্মরণীয় ঃ "ন্যায়ের পথে স্থির থেকো - অন্যায় আচরণ কখনও শ্রীবৃদ্ধি আনতে পারে না। ভয়কে জয় করো ঃ বরং মৃত্যুবরণ করো, কিন্তু পরাজয় স্বীকার করো না। মমতাময় হও; বৃদ্ধ, নারী বা শিশুদের হত্যা করো না। ফলের গাছ, খাদ্যশস্য বা গো-সম্পদ ধ্বংস করো না। প্রতিশ্রুতি - শত্রুকে দিলেও - রক্ষা করবে। যাঁরা সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেছে তাঁদের কখনও উৎপীড়ন করবে না"। অনুজ্ঞাটি আন্তরিকতার সঙ্গেই উচ্চারিত হয়েছিল। ধর্মপ্রাণ অনুগামীরা যে অক্ষরে অক্ষরে তাঁর নির্দেশ পালন করেছিল, তার প্রমাণ 'ফৌজ-এ-এলাহী'-র অপরাজেয় অভিযানগুলির ইতিহাসে পাওয়া যায়।

সক্রিয় হ'ক বা মৌন হ'ক, বিজিত জাতির সমর্থন না পেলে কোন আক্রমণকারীই স্থায়ী প্রতিপত্তি লাভ করতে পারে না। ইসলামি স্থায়িত্বের মূলেও ছিল ব্যাপক জনসমর্থন। নিপীড়িত জনগণ সর্বত্রই ইসলামকে স্বাগত জানিয়েছিল। বাইজান্টিয়ামের দুর্নীতি, পারস্যের অপশাসন এবং খ্রিষ্টিয় কুসংস্কারের অত্যাচার-উৎপীড়নে তাদের জীবন যখন অসহনীয় হয়ে উঠেছিল, তখন তাদের মুক্তিদাতারূপে 'ফৌজ-এ-এলাহী'-র আবির্ভাব ঘটল। পয়গম্বরের বৈপ্লবিক শিক্ষায় সারাসেনাদের বিশ্বাস ছিল অটল; খলিফার মহৎ, বিচক্ষণ, ফলপ্রসূ, নির্দেশগুলিকে তারা সাগ্রহে পালন করত; ফলত বিজিত দেশগুলিতে জনসাধারণ তাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখেছিল, সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছিল।

দ্বিতীয় খলিফা ওমরের দিগ্বিজয়ের চমৎকারিতার তুলনায় তাঁর জীবনযাত্রা প্রণালী ছিল নিতান্তই সাদামাটা। তাঁর গর্বোদ্ধত অশ্বারোহী বাহিনী একদিকে পারস্য-সাম্রাজ্য অধিকার করে একেবারে অক্সাস্ নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল, আবার অন্যদিকে রোম সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী আলেক্জান্দ্রিয়া দখল করেছিল। বিজয়ী খলিফা উটের পিঠে চড়ে জেরুজালেম শহরে প্রবেশ করলেন। সেই উটের পিঠে রাজকীয় পাথেয় হিসাবে তাঁর সঙ্গে সর্বসাকুল্যে যে জিনিস ছিল তার তালিকা থেকে তাঁর

জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায় ঃ অনুৎকৃষ্টমানের লোম নিয়ে তৈরী ছোট্ট একটি তাঁবু; এক বস্তা ভুট্টা; এক থলি খেজুর; কাঠের তৈরী একটি বাটি, চামড়ার তৈরী একটা জলের ভিস্তি। পারস্য, মেসোপটেমিয়া, সীরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং মিশর যারা জয় করেছিল, তাদের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, ধর্মনিষ্ঠা, সমদর্শিতা এবং ন্যায়পরায়ণতার বিবরণ গিবনের রচনায় পাওয়া যায় ঃ "চলার পথে যেখানেই তিনি থামতেন, সেখানেই - কোনও ভেদাভেদ না করে - সকলের সঙ্গেই তাঁর সাধাসিধে খাবার ভাগ করে খেতেন। প্রার্থনা এবং খলিফার ভাষণের মাধ্যমে খাদ্যাদিকে শুদ্ধ করে নেওয়া হত। অভিযান বা তীর্থযাত্রার সময় তিনি ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। আরব সমাজে তখন বহু বিবাহের প্রচলন ছিল; তিনি এই লম্পটসুলভ কুপ্রথার সংস্কার করেন। করদ রাজগুলির কাছ থেকে নিষ্ঠুরভাবে জোর করে কর আদায় করাও তিনি বন্ধ করেন। সারাসেনদের মধ্যে বিলাসপ্রিয়তা লক্ষ করলে তিনি তাদের দামি রেশমি পোষাক কেড়ে নিতেন, এবং মাটিতে তাদের মুখ ঘষে দিতেন"।

রূপকথায় যে ধরনের বীরত্বের বিবরণ পাওয়া যায়, খালেদের শৌর্য ছিল সেইরকমই চমকপ্রদ। স্বয়ং মহম্মদ তাঁকে 'সায়ফুল্লাহ' অভিধায় বিভূষিত করেছিলন। তিনিই আরবদেশ, মেসোপটেমিয়া এবং সীরিয়ায় ইসলামের পতাকা উত্তোলন করেন এবং এই দেশগুলির ঐক্যসাধন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর সম্পত্তির তালিকা ঃ তাঁর ঘোড়া তাঁর অস্ত্রশস্ত্র এবং একটিমাত্র ক্রীতদাস। যৌবনেই নাকি তিনি ঘোষণা করেছিলেন - সীরিয়ার ভোগ্যসামগ্রীর লোভে বা নশ্বর ঐহিক সুখের আশায় আমি ধর্মের কাছে জীবন উৎসর্গ করি নি, আমি শুধু আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রেরিত পুরুষের অনুগ্রহ কামনা করি।[১০]

মিশর-বিজয়ী ওমরু ছিলেন আর একজন খ্যাতিমান পুরুষ। বীরত্বের সঙ্গে তিনি কবিত্বগুণেরও অধিকারী ছিলেন। আবার নিচের উদ্ধৃতিটি থেকে তাঁর সমাজ-চিন্তারও পরিচয় পাওয়া যায় ঃ

"কৃষিজীবিরা পিঁপড়েদের মতোই সংখ্যাবহুল কিন্তু পিঁপড়েদের মতো পরিশ্রমী নয়। তত্ত্বাবধায়কের কশাঘাতেই তারা সহজাত আলস্য পরিত্যাগ করে। তাদের পরিশ্রমের ফলে যে সম্পদ উৎপন্ন হয়, তা কিন্তু সাম্যের ভিত্তিতে বাটোয়ারা হয় না - মালিকরাই সিংহভাগ গ্রাস করে"। উদ্ধৃতিটি খলিফা ওমরের কাছে

পাঠানো একটি রিপোর্টের অংশবিশেষ।

পরবর্তীকালের বিচারে ওমরুর এই মন্তব্যের মধ্যে অসাধারণ কিছু পরিলক্ষিত হবে না বরং নিতান্তই স্বাভাবিক মনে হবে। কিন্তু সমসাময়িক দৃষ্টিতে এই ধরনের বিশ্লেষণ নতুন ভাবনাচিন্তার সূত্রপাত করেছিল। প্রাচীনতর কোনও সভ্যতাই সামাজিক সাম্য নিয়ে মাথা ঘামায়নি - সাম্যের ধারণাই ছিল অনুপস্থিত। 'ক্রীতদাস শ্রেণী' বা 'শূদ্রবর্ণ' - যে গোষ্ঠীরই সে অন্তর্ভুক্ত হ'ক শ্রমজীবী মাত্রই ছিল অবজ্ঞা ও শোষণের পাত্র, মানুষ বলে সে গণ্যই হ'ত না।

শ্রমজীবীদের মানসিক অধিকার প্রকাশ্য স্বীকৃতি পেতে শুরু করল প্রথম খলিফা আবুবক্‌র-এর আমলে। অবিস্মরণীয় একটি ফরমানে নতুন একটি অর্থনৈতিক তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট হল - প্রচলিত সমাজ-চিন্তায় বিপ্লব ঘটল। নতুন তত্ত্বটি অবশ্য সওদাগর-শ্রেণীর স্বার্থেই রচিত হয়েছিল। শ্রমজীবী শ্রেণীই সম্পদ উৎপাদন করে। সৃষ্ট সম্পদের একটা অংশে যদি স্রষ্টার মালিকানা স্বীকৃত হয় তাহলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় বাণিজ্যের তৎপরতা। ফ্যারাও-দের বা টোলেমি-দের শাসনাধীন মিশরে শ্রমিক-নিপীড়নকে অন্যায় বলে মনে করা হত না। মিশর-বিজয় সম্পন্ন হলে ওমরু এই অসাম্যকে শাসনব্যস্থার মাধ্যমে অপসারণ করবার চেষ্টা করলেন। যে মিশর শত শত বছর ধরে গ্রিক এবং রোমান শাসকদের দ্বারা বঞ্চিত ও লুণ্ঠিত হচ্ছিল, সারাসেন শাসনে সেই মিশর সমৃদ্ধির মুখ দেখল।

ইসলামি ইতিহাসের শুরুতে সারাসেনদের জয়তৃষ্ণা ছিল অতিমাত্রায় প্রবল। ক্রমে-কালের প্রভাবেও বটে, সমৃদ্ধির ফলেও বটে - এই বিজিগীষার তীব্রতা হ্রাস পেয়েছিল। যুদ্ধের মাধ্যমে নয়, শিল্পবাণিজ্যের মাধ্যমে ধনসম্পদ আহরণ করতে সচেষ্ট হল তারা, রণক্ষেত্রে নয়, বিজ্ঞান-তথা-সাহিত্যে ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জনের চেষ্টা করল, শুধু অদ্বিতীয় একেশ্বর এবং একমাত্র পয়গম্বরের মাহাত্ম্য কীর্তনেই নয়, শান্তির সঙ্গে সামাজিক তথা গার্হস্থ্য জীবনযাপনের মধ্যেও তারা সুখের আস্বাদ পেল। পূর্বপুরুষের পরাক্রমে গড়ে উঠেছিল যে বিসংবাদমুক্ত নতুন জগৎ, তার শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া তাদের মনে আগ্রহের উদ্রেক করত, সঞ্চার করত আনন্দ। এই পূর্বপুরুষেরা জড়ো হয়েছিল আবুবক্‌র্ এবং ওমরের পতাকাতলে, রণসাজে সজ্জিত হয়ে; তাদের অভীষ্ট ছিল বেহেশত্ এবং উপরি হিসেবে - লুণ্ঠিত কিছু ঐহিক সম্পদ। যুদ্ধক্ষেত্রের এই গৌরব কিন্তু নতুন

প্রজন্মকে আকৃষ্ট করল না, স্বল্পতর গৌরবময় বৃত্তিতেই তারা সন্তুষ্ট থাকল। তারা আবিষ্কার করল - যুদ্ধের তুলনায় শিল্প-বাণিজ্য বেশি সম্পদ-বর্ধক, বিজ্ঞান-দর্শনের চর্চা বেশি তৃপ্তিদায়ক।

এইভাবে - শান্তি, সমৃদ্ধি এবং ক্রমবিকাশের আবহাওয়ায় - তিনটি শতাব্দী কেটে গেল। সারাসেন ধর্মোন্মাদনার প্রকোপ অবশ্য আবার মাথাচাড়া নিয়ে উঠেছিল, কিন্তু তা ঘটেছিল ধর্মযুদ্ধের নামে খ্রিষ্টান আগ্রাসনের মোকাবিলা করবার উদ্দেশ্যে। বস্তুত, মধ্য এশিয়ার মঙ্গোল বর্বরদের কাছে সারাসেন শক্তি পরাভূত হওয়ার পরেই লুঠতরাজ এবং অত্যাচার-নিপীড়ন ইসলামি জয়যাত্রার একটি লক্ষণ হয়ে দাঁড়াল। দরবারী বিলাসব্যবসনের দুষ্টপ্রভাব ইতিমধ্যে সক্রিয় হয়েছে, আরব জ্ঞানচর্চা ও সংস্কৃতি হয়েছে কলুষিত; নিষ্ঠা পেয়েছে হ্রাস, পরিবর্তে তুর্কী লালসা উজ্জ্বল ইসলামি আদর্শে গ্লানিমা আরোপ করেছে।

ইসলামকে লড়াইবাজ আন্দোলন হিসেবে দেখলে ইতিহাস বিকৃত করা হয়। সারাসেন যোদ্ধাদের নয়, আরব সওদাগরদেরই ধর্মগুরু ছিলেন হজরত মহম্মদ। নিজের ধর্মমতকে তিনি যে নামে অভিহিত করেছিলেন তা থেকেই এটা প্রমাণ হয়। 'ইসলাম' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ - শান্তি-স্থাপন বা শান্তি-নির্মাণ। বহু দেবতার পরিবর্তে এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে সম্মান জানিয়ে এবং বহু উপজাতিতে বিভক্ত আরবদের মধ্যে ঐক্য এনে তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। পার্থিব শান্তির প্রয়োজনটা ছিল জরুরি, আরব সওদাগরদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত; শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতেই বাণিজ্যের দ্রুত সমৃদ্ধি সম্ভব। সেই শান্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভেঙে পড়া রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ব্যাভিচারী ধর্মবিশ্বাস। এই ভাঙন এবং ব্যাভিচার বীজ রোপন করে চলেছিল অবিরাম যুদ্ধের, অনবসান বিদ্রোহের; এদের ধ্বংসসাধনই ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। মহম্মদের ধর্মমত সেই শর্ত পালন করেছিল। সারাসেনদের সামরিক দক্ষতাই সমরখন্দ থেকে স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট ভূখন্ডের মানুষের কাছে শান্তির আশীর্বাদ বয়ে এনেছিল।

রোমান এবং অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার আওতায় যে সব দেশ গড়ে উঠেছিল সেখানে উৎপাদন-ভিত্তিক বৃত্তিগুলি মর্যাদা পেত না। সেই সব দেশের শাসকশ্রেণী শিল্প-বাণিজ্যকে অবজ্ঞার চোখে দেখত। পেশা হিসাবে যুদ্ধ এবং যাগযজ্ঞকেই তারা সম্মানজনক মনে করত। আরবদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র।

মরুভূমির যাযাবর জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে তারা শ্রমকে মর্যাদা দিতে শিখেছিল, স্বাধীন জীবনযাপনে শ্রমের গুরুত্ব অনুভব করেছিল। বাণিজ্য তাদের কাছে অপাংক্তেয় ছিল না, বরং বাণিজ্যকে তারা একেবারে সম্মানযোগ্য এবং লাভজনক - অর্থাৎ সভ্য মানুষের উপযুক্ত - পেশা বলেই মনে করত। প্রাচীন সভ্যতাগুলির নাগপাশে বন্দি রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্য ইসলামি রাষ্ট্রের সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতেও প্রতিফলিত হয়েছিল। আরব সওদাগরদের জীবন-দর্শন এবং স্বার্থের দ্বারাই মুসলমান রাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত ও পরিচালিত হত। কোনও দেশ আরব দেশ দ্বারা বিজিত হলে সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো হত, সেদেশ দ্রুত সমৃদ্ধিলাভ করত। ধর্ম শ্রমকে মর্যাদা দিত, কামনা-বাসনার সুষ্ঠু চরিতার্থ সাধনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করত। বাণিজ্য ছিল অবাধ - এবং জীবিকা হিসাবে রাষ্ট্রপরিচালনা, সৈনিকবৃত্তি, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের মতই সম্মানজনক বলে স্বীকৃত। বাগ্‌দাদের খলিফারা শুধু বাণিজ্যর বড়ো সমর্থক ছিলেন না; তাঁদের অনেকে কোনো না কোনো হাতের কাজও শিখেছিলেন। কেউ কেউ নিজের শ্রমলব্ধ আয় থেকে নিজের ভরণপোষণ চালাবার জন্য ঐ কাজকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

আরব দার্শনিক ও পন্ডিতদের অধিকাংশই ছিলেন সম্পন্ন বণিক পরিবারের সন্তান। বস্তুত, বাণিজ্য ইসলামি জগতের সকল ক্ষেত্রেই পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। বোখারা ও সমরখন্দের দরবারে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ ও শিষ্টাচারের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটল; আফ্রিকার ফতেমীয় শাসকদের দানশীলতার এবং আন্দালুসিয়ার সুলতানদের জাঁকজমকের তো তুলনা নেই। এ সবকিছুই ছিল বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির ফসল - কোনটার জন্যই জোর করে অতিরিক্ত কর বসাতে হয় নি।

সওদাগর-বৃত্তি মানুষের মনে নানান ধরনের পরিবর্তন ঘটায়। বণিক দূরদেশে যাতায়াত করে, বিচিত্র রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হয়, নানান সমাজের মানুষের সঙ্গে মেশে। স্বদেশের যে সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় তার চরিত্র গড়ে ওঠে তার অনেক সঙ্কীর্ণতা, অনেক পূর্বধারণাকে সে বর্জন করে। অপরের আচার-আচরণ, মতামত ও ধর্মবিশ্বাসকে সে বুঝতে শেখে, সে সম্বন্ধে সহনশীল হয়, সহানুভূতিসম্পন্ন হতে অভ্যস্ত হয়। অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেবার জন্য, অচেনা দেশে চলাফেরা করার জন্য অনুসন্ধিৎসা ও পর্যবেক্ষণ-শক্তির উপরে নির্ভর করতে হয়। এই সব গ্রহণ-বর্জনের ফলে নির্বিচার বিশ্বাসের

আরাম আর তাকে আকৃষ্ট করে না। তাছাড়া তার ক্রিয়াকলাপ তাকে বিমূর্ত চিন্তনেও অভ্যস্ত করে। পশম অথবা শস্য অথবা মশলা কী কী জিনিসের আমদানি বা রপ্তানি, উটের পিঠে না জাহাজে বোঝাই করে - এসব দৃশ্য ব্যাপারের অন্তরালে 'লাভ' নামে অদৃশ্যের হিসেব তাকে রাখতে হয়। তার বিচারশক্তি বৃদ্ধি পায়। মানসিকতার এই পরিবর্তন বণিক-বৃত্তির একটি আবশ্যিক শর্ত।

নানান দেশে যাতায়াত করলে লোকচরিত্র সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন অন্ধবিশ্বাস অপৌরুষেয় জ্ঞানের মর্যাদা পায়; উদ্ভট যে সব আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয় সেগুলিও ভিন্ন ভিন্ন; ভিন্ন ভিন্ন পূর্ব ধারণা ধর্মের নামে শাশ্বত সত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। সওদাগর তার অভিজ্ঞতা দিয়ে সব কিছুরই বিচার করে, কিন্তু বৃত্তির প্রয়োজনেই সে অপরিচিতের জন্য সহনশীলতা, সহানুভূতির সঙ্গে বোঝবার প্রবণতা, পূর্বধারণা থেকে মুক্তি, পর্যবেক্ষণের শক্তি, নির্বিশেষে চিন্তার ক্ষমতা প্রভৃতি যে সব সদ্‌গুণের অধিকারী হয়, তাদের সমন্বয়ে সে একটা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিও আয়ত্ত করে। তার বিশ্বনাগরিক মন তখন অপরিচিত সমাজের দোষত্রুটিকে নিন্দা না করে সহ্য করে; সেই সমাজের দুর্নীতিতে বেদনাবোধ করে; এবং বিভিন্ন সমাজের শাস্ত্রীয় আপ্তবাক্য এবং পূজাপদ্ধতির বৈচিত্র্যের মধ্যে যে সাধারণ নিষ্ঠাবোধ সক্রিয়, তাকে সম্মান করে।

যে সব দেশ মুসলমান ধর্মগ্রহণ করে সারাসেন সাম্রাজ্যের পতাকাতলে একত্র হয়েছিল, মধ্যযুগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সংযোগ-সাধক পথগুলি তাদেরই উপর দিয়ে চলে গিয়েছিল। চিনের সঙ্গে বাণিজ্যের পথটি ছিল উত্তরদিকে - কন্‌স্তান্তিনোপল্‌ থেকে ইতালি ও অন্যান্য পশ্চিম ইয়োরোপীয় দেশের ভিতর দিয়ে। কিন্তু ঐ পথে বিপদেরও বেশ ঝুঁকি ছিল - সাইথীয় দস্যুরা অতর্কিতে আক্রমণ করত, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য অন্যায়ভাবে উৎপীড়ন করত। সীরিয়া, মেসোপটেমিয়া, পারস্য এবং অ'াসের অপর পারেও কয়েকটি রাজ্যে আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর আরবরা চিনের বাজার দখল করে। তখন তারা নিজেদের অধিকারভুক্ত উত্তর আফ্রিকা এবং স্পেনের ভিতর দিয়ে পশ্চিম ইয়োরোপ পর্যন্ত মাল-চলাচলের ব্যবস্থা করল। দীর্ঘকাল ধরে-অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত একদিকে ইয়োরোপ এবং অন্যদিকে চিন ও

ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য আরবদের একচেটিয়া ছিল। হাজার হাজার সওদাগর ঐ সময় দল বেঁধে ভারতবর্ষ ও চিনের দূর দূর প্রত্যন্ত থেকে মহার্ঘ পণ্যসামগ্রী নিয়ে মরক্কো ও স্পেনে পর্যন্ত যাতায়াত করেছে। গ্রিস ছাড়া প্রাচীন সভ্যতাপুষ্ট সকলদেশেই সওদাগরদের জন্য নির্যাতন ছিল অবধারিত, কিন্তু এই নতুন পথের কোথাও বণিকরা অত্যাচার বা ঘৃণার শিকার হয় নি। কারণ, সারাসেন সাম্রাজ্যে সওদাগরেরা ছিলেন শাসকশ্রেণীর অন্তর্গত।

যে সমাজের নেতৃত্ব সমরবৃত্তিধারী অভিজাতশ্রেণী এবং উগ্রকর্মা পুরোহিত-সম্প্রদায়ের অধীন, সেখানে মানুষ বিভ্রান্তির শিকার হয়, আদর্শনিষ্ঠা পর্যবসিত হয় কর্তাভজা অন্ধবিশ্বাসে অথবা ধোঁয়াটে অতীন্দ্রিয়বাদে। দর্শন, অর্থাৎ বিশ্বব্যাখার যুক্তিসিদ্ধ প্রয়াস সেখানে সম্ভব নয়। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য প্রয়োজন হয় বাণিজ্য-বৃত্তিধারী অভিজাতশ্রেণী। এই শর্তটি পূরণ হওয়ার ফলেই আয়োনীয় গ্রিসের নগর-রাষ্ট্রগুলি দর্শনের জন্ম দিতে পেরেছিল। ঐ একই কারণে সারাসেন সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল, এবং তার উপরে মানসিক ঔদার্য বিশ্ব জনীন দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্ধবিশ্বাস-বিরোধী জীবন-দর্শনের ছাপ পড়েছিল। এই সদ্‌গুণগুলি-বলা বাহুল্য-বণিকবৃত্তির অনুষঙ্গ।

মানব-প্রগতির সোপান হিসেবে ইসলাম ইতিহাসের একটি কার্যকরী সৃষ্টি। নতুন সামাজিক সম্বন্ধের, বৈপ্লবিক মানসিক পরিবর্তনের মতবাদ রূপেই তার উদ্ভব। তবে কোনও সমাজব্যবস্থাই সর্বকালের জন্য সমান ফলপ্রসূ থাকে না। কালের প্রভাবে জরাগ্রস্ত প্রাচীন ব্যবস্থাগুলির উচ্ছেদ ঘটিয়ে ইসলাম তাদের স্থানাধিকার করেছিল; আবার কালেরই প্রভাবে মানবিকতার বিকাশে তার ভূমিকা গৌণ হয়ে গেল, নতুন পরিস্থিতিতে নতুন ব্যবস্থার হাতে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব তুলে দিতে হল। তবে যে সব মতবাদ পরবর্তী সমাজবিপ্লবের সোপান হিসেবে কাজ করেছে, তাদের সঙ্কলনে ইসলামের অবদান অনস্বীকার্য; পরীক্ষাভিত্তিক বিজ্ঞান এবং যুক্তিভিত্তিক দর্শনের ধারক ও বাহক হিসেবে ইসলাম অবশ্যই গর্ব করতে পারে।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা ইয়োরোপকে মধ্যযুগীয় বর্বরতার অরাজক বিশৃঙ্খলা থেকে উদ্ধার করেছিল। যুক্তিভিত্তিক দর্শনের স্বভাবজ শক্তির সাহায্যেই খ্রিষ্টিয় ঈশ্বরতত্ত্ব এবং ক্যাথলিক গির্জার একাধিপত্যের সঙ্গে সংগ্রাম

করা এবং শেষ পর্যন্ত তাদের পরাস্ত করা সম্ভব হয়েছিল। তাত্ত্বিক বিতর্কে যুক্তিবাদি একটি মারাত্মক অস্ত্র। প্রাচীন গ্রিসের জ্ঞান-বৃদ্ধেরা এই অস্ত্রের আবিষ্কর্তা। গ্রিকদের কাছ থেকে আরব পন্ডিতরা এই বিদ্যাটি লাভ করেন। এই উত্তরাধিকারকে সংরক্ষণ করেই তারা ক্ষান্ত হন নি, যথেষ্ট উন্নতিসাধনও করেছিলেন। তাঁদের কাছে থেকেই এই বিদ্যাটি আধুনিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতাদের হাতে আসে। আরব মরুভূমির বেদুইনেরা ইসলামের ধর্মধ্বজা উড়িয়ে যে ঐতিহাসিক সংগ্রাম শুরু করেছিল, তার কালিক ব্যাপ্তি ছিল হাজার বছর, স্থানিক ব্যাপ্তি তিনটি মহাদেশ। এই কঠিন সংগ্রামের মীমাংসা খুব সহজে হয় নি - একটু একটু করে প্রতিষ্ঠিত শক্তির ক্ষয়সাধন করতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ইয়োরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর "এনলাইটেনমেন্ট"[১১] ও বুর্জোয়া বিপ্লবের শাস্ত্রবিরোধী পতাকাতলে এই ঐতিহাসিক সংগ্রাম জয়যুক্ত হয়।

উল্লেখ্যপঞ্জী ঃ

১। মানবেন্দ্র নাথ রায় কারারুদ্ধ অবস্থায় এই বইটির পান্ডুলিপি রচনা করেন। 'দ্য হিস্টরিক্যাল রোল অব্ ইসলাম' নামে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। তখনো দেশবিভাগ হয় নি; বর্তমানকালের তিনটি সার্বভৌম রাষ্ট্র - ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ - নিয়ে তখন ইংরেজাধীন ভারতবর্ষ গঠিত ছিল।

গান্ধীবাদ ও মানবতাবাদ

(Gandhism and Humanism)

"সহকর্মীদের সঙ্গে গান্ধীজির শেষ আলোচনা" শীর্ষক এক অতি মনোজ্ঞ প্রতিবেদন সম্প্রতি শ্রী পিয়ালী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। আলোচনাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল "১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্ধে" অর্থাৎ গান্ধীহত্যারূপ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটার মাত্র মাস দু'য়েক আগে। উল্লিখিত ঘটনার কোন পূর্বাভাষ মহাত্মা পেয়েছিলেন কি না আমি জানি না। তবে তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তিনি ঈশ্বরের হাতের হাতিয়ার মাত্র। কাজেই তাঁর পক্ষে এমন কোন পূর্বাভাষ পাওয়া হয়ত অসম্ভব ছিল না। বিশ্বাস করা আর না করার উপরই সমস্ত জিনিসটা নির্ভর করছে। যাই হোক, সেই আলোচনাকালে তিনি যা বলেছিলেন তা তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত বলে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং তাঁর মনের গুপ্ত অভিপ্রায়ের সবখানি না হলেও অন্তত কিছুটার পরিচয় আমরা তা থেকে পাই।

আপাতত আমি সেই অভিপ্রায়ের ভাল-মন্দ বিচার করতে বসি নি। ইতিহাস ও সত্যের খাতিরে অবশ্য তা একদিন আমাদের করতেই হবে। ইত্যবসরে সাম্প্রতিক কালে আমাকে বারংবার যে প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হয়েছে তার উত্তর দেওয়া শ্রী পিয়ারী লালের প্রতিবেদন বহুল পরিমানে সহজ করে দিয়েছে। প্রশ্নটি হল - গান্ধীজির বক্তব্য ও নয়া মানবতাবাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আমার আচরণও কি বাইবেলে কথিত সেই ব্যক্তির মতন নয় যে অপর একজনকে উপহাস করতে এসে শেষ অবধি তাকেই ভজনা করতে শুরু করল?

এযাবৎকাল আমি এই প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ্যে এড়িয়ে গেছি। আমি আমার বিজ্ঞ প্রশ্নকর্তাদের শুধু এই কথা বলেছি যে, তাঁরা ও নিজেরা বিচার করে দেখুন এবং তারপরে যদি তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌছন যে, গান্ধীজি ও মানবতাবাদের মধ্যে বাস্তবিকই কোন পার্থক্য নেই তাহলে তাঁদের সিদ্ধান্তে আমি কোন আপত্তি

জানাব না। বরাবর আমি গান্ধীবাদের একজন কট্টর সমালোচক, মানবজাতির একমাত্র আশা ভরসার স্থল বলে এই মতবাদের অনুকূলে যে দাবী উত্থাপিত হয়েছে সে সম্বন্ধে আমার গভীর সংশয়ের কথা আমি কখনও রেখে-ঢেকে বলি নি। আমার উক্ত সংশয় যদি ভিত্তিহীন বলে প্রমানিত হয় তাহলে আমিও বিনা বাক্যব্যয়ে গান্ধী ভজনা করতে কসুর করব না। একথা ঠিক যে, ব্যক্তি-গান্ধীকে আমি কখনও ছোট করতে চাই নি। বস্তুত আমার গান্ধী সমালোচনা কখনও অভিসন্ধিমূলক ও বিদ্বেষপ্রসূত ছিল না, এমন কি কখনও একথা আমার মনে হয় নি যে, গান্ধীবাদের সমালোচনা করে আমি কোন অন্যায় কাজ করছি। যে সব ব্যক্তি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদীদের কর্মকান্ড থেকে গান্ধীবাদকে আলাদা করে দেখতে চাইছেন তাঁদের জন্য আমি গভীর অনুকম্পা বোধ করছি। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, জাতীয়তাবাদীরা আজও গান্ধীজিকে তাঁদের পৃষ্ঠপোষক মহাত্মারূপে আরাধনা করে। তার অর্থ নিশ্চয়ই এই দাঁড়ায় না যে, আমি অকস্মাৎ গান্ধীবাদের মধ্যে মানবতাবাদ আবিষ্কার করেছি। যে যা বিশ্বাস করে সে যদি তার হয়ে সাফাই গাইতে লাগে তাহলে আমাদের নিশ্চয়ই আপত্তি করা সাজে না।

একথা অনস্বীকার্য যে, মহাত্মার কিছু মানবাভিমুখী গুণাবলী আছে এবং তিনি একজন নীতিবাদীও বটে। তার জন্য আমি তাঁকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়েছি। কিন্তু তাঁকে একজন মানবতাবাদী না বলে মানবহিতকারী বলাই বোধ হয় অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে। এই পার্থক্যটি সাধারণত করা হয় না। কোন বিভেদ না রেখে সকল মানুষের মঙ্গলসাধনের অভিপ্রায় নিশ্চয়ই অতি প্রশংসা। কিন্তু তার তাৎপর্য এই নয়, মানুষকে সর্বোচ্চ মূল্য দেওয়া হল। মহাত্মা মানুষকেই মানুষের সব কাজের লক্ষ্যবস্তু বলে গণ্য করেন না। মানুষকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধনের এক উপায়স্বরূপ দেখে থাকেন। এখন, এভাবে দেখা একটা উঁচু ধরনের দর্শন হতে পারে কিন্তু তা মানুষকে তার স্বকীয় স্বাধীনতা ও সৃজনশীলতা থেকে বঞ্চিত করে। মানবতাবাদ কখনও তা করে না। উপরন্তু, এক অতি-মানবিক ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পনের এই মনোভাবের মধ্যে মানুষ এমন অনেক কিছু করার সমর্থন খুঁজে পাবে যা হয়ত এক স্বাধীন সত্ত্বা হিসেবে সে করতে একান্ত পরাঙ্মুখ হবে।

জীবনের অন্তিম দিনগুলিতে মহাত্মা বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করতে

পেরেছিলেন সত্য ও অহিংসার পথ থেকে তাঁর বিচ্যুতি ঘটেছে। তবে এক উচ্চতর শক্তির কাছে আত্মসমর্পনের ধর্মীয় মনোভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ থাকার দরুন তিনি তাঁর কৃতকর্মের দায়িত্ব থেকে নিজেকে অব্যহতি দিতে পেরেছেন। মানবতাবাদে কিন্তু এমন কোন সুবিধাজনক অছিলার অবকাশ নেই। তা মানুষের কাজের জন্য মানুষকেই দায়ী বলে ধরে আর তার ফলশ্রুতিতে সে যে ন্যায় ও সত্যের পথ অনুসরণ করে চলবে বলে বেছে নিয়েছে তা থেকে যে সে সরে আসবে না সে বিষয়ে অধিকতর নিশ্চয়তা দেয়। মানবতাবাদ মানুষের স্বাধীনতার দাবীতে সোচ্চার আর সে দাবী অযৌক্তিকও নয় কারণ সে তার কৃতকর্মের সমস্ত দায়িত্ব নিজেই বহন করে। গান্ধীবাদী জীবনদর্শন অবশ্য মানুষকে তার কৃতকর্মের দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দেয় এবং এই স্বাধীনতা বেশ আরামদায়কও বটে। কিন্তু মানুষ তা পেয়ে থাকে একমাত্র তার বিচার বুদ্ধির স্বাধীনতার বিনিময়ে।

শ্রী পিয়ারী লালের প্রতিবেদনটিতে মহাত্মাকে অনুতপ্ত গলায় বলতে শোনা যায় ঃ "বর্তমানে আমার চোখ খুলে গেছে। আমি এখন দেখতে পাচ্ছি যে, অহিংসার নামে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে এত কাল যা আচরণ আমরা করছিলাম তা প্রকৃত অহিংসা নয়। ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বর তখন আমার চোখ ঢেকে দিয়েছিলেন কারণ আমাকে দিয়ে তিনি তাঁর এক মস্ত উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যপূরণের পর ঈশ্বর এখন আমার দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরিয়ে দিয়েছেন"। বলা বাহুল্য, এরকম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানুষের যে কোন অপকর্মেরই সাফাই গাওয়া যায়। এর ফলে ঈশ্বরকে সর্বদাই সুবিধাজনকভাবে কাজে লাগান যায় এবং আমরা তখন আমাদের সকল আচার-আচরণে 'উদ্দেশ্য মহৎ হলে উপায় যাই হোক না কেন' এই কপট নীতির দ্বারা পরিচালিত হই। ঈশ্বর-বিশ্বাসকে ভিত্তি করে গান্ধীবাদ দাঁড়িয়ে আছে আর ঈশ্বরবিশ্বাসীদের মতে এইখানেই মানবতাবাদের চেয়ে গান্ধীবাদের শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু অন্যেরা এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষন করতে পারেন। এখন আমি সে প্রশ্ন তুলছি না। বর্তমানে আমাদের বিচার্য বিষয় হল, ঈশ্বর যদি সৎ উদ্দেশ্য সাধনে অসৎ উপায় অবলম্বনের নীতি সমর্থন করে থাকেন তা হলে গান্ধীবাদের পক্ষে তা মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? ঈশ্বর যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই করেন। তা ছাড়া, ঈশ্বরের চেয়ে মানুষ মহত্তর হতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেবল তাত্ত্বিক

ক্ষেত্রে নয়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও উক্ত নীতি বর্জন করা গান্ধীবাদের পক্ষে সঙ্গত কাজ হয়েছে বলে তুলে ধরা হয়েছে। তবে এবিষয়ে আমার বরাবর-ই একটা সন্দেহ ছিল। আমার সে সন্দেহ যে একেবারে অমূলক নয় তা মহাত্মা স্বয়ং এখন দেখিয়ে দিলেন।

মানুষকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যসাধনের উপায়মাত্র বলে প্রদর্শন করাই হল গান্ধীবাদের সর্বপ্রধান কাজ আর সেটাই রাজনীতিতে নৈতিক মূল্যবোধের প্রবর্তন করে রাজনীতিকে পরিশুদ্ধ করতে মহাত্মার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছে। গান্ধীজি নিজে ও তাঁর ঘনিষ্ঠতম সহকর্মীবৃন্দ ঐ ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছেন। অনুরূপ কারণেই সর্বযুগের ও সর্বদেশের ধর্মীয় নীতিবাদীরা যে সব ঐশ্বরিক মতবাদ প্রচার করেছেন তাঁদের স্বীকৃত অনুগামীরা কার্যত সেগুলিকে নিঃসঙ্কোচে বর্জন করেছেন। গান্ধীবাদের সঙ্গে মানবতাবাদের খালি এই সাদৃশ্যটুকু রয়েছে যে, উভয়েই সৎ উপায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন। তবে রাজনীতিতে নীতির স্থান নিয়ে মানবতাবাদ আরও অনেক বেশি আপোষহীন। সে অতিরিক্ত যে কথা বলতে চেয়েছে তা হল যতদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মৌল প্রেরণা থাকবে ক্ষমতা দখল করা ততদিন অবধি বিঘোষিত নৈতিক মূল্যবোধগুলিকে কঠোরভাবে মেনে চলা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না।

ক্ষমতার রাজনীতির সঙ্গে অবশ্য গান্ধীবাদেরও সম্পর্ক নেই বলে ধরা হয়। শ্রী পিয়ারী লালের সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনটি এই বিষয়ের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। সেখানে বলা হয়েছে আলোচনা চলাকালে গান্ধীজি মন্তব্য করেন যে, "অহিংসাকে শক্তিমানের অস্ত্র বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে তা নিছক একটা অলীক কল্পনা ও স্বপ্ন থেকে যাবে এবং একটা বিশ্বশক্তি ও বিশ্বশান্তির পরিপোষক হিসেবে অহিংসার কোন ভবিষ্যত-ই থাকতে পারে না যদি না এটা দেখান যেতে পারে যে অহিংসার মাধ্যমে যে ক্ষমতা অর্জিত হয়েছে অহিংসার দ্বারাই তা টিকিয়ে রাখা ও আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। অর্থাৎ যতক্ষণ না তা ক্ষমতার রাজনীতিকে সার্থকভাবে প্রভাবিত ও পরিচালিত করতে সক্ষম হচ্ছে। একথা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না যে, গান্ধীবাদ ক্ষমতার রাজনীতির বিরোধী নয়। তা ক্ষমতার রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে না বটে, তবে তাকে পরিচালিত করে। একথাও না মেনে উপায় নেই, অহিংসার

দ্বারা একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল ক্ষমতা হস্তগত করেছে এবং এর সাহায্যে সে যে সেই ক্ষমতা রক্ষা করতে সক্ষম তা প্রমাণ করতে ব্যস্ত। সেক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে এই উপসংহারে আসা অসঙ্গত হবে না, যেহেতু গান্ধীবাদ ক্ষমতা দখলের রাজনীতিকে সমর্থন করে সেহেতু উপায়ের পবিত্রতা নিয়ে পীড়াপীড়ি করা তার সাজে না।

আলোচনার মধ্যে গান্ধীজির কয়েকজন অনুগামী মত প্রকাশ করেন যে, রাজনীতি করা কংগ্রেস সদস্যরা নন, সত্যিকারের গান্ধীপন্থীদের সরকারে ঢুকে পড়া উচিত যাতে "সরকারকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা এক অহিংস সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হন"। এ বিষয়ে অনুগামীদের সঙ্গে মহাত্মার ঐক্যমত স্থাপিত হয় নি। তিনি জোর দেন নঈ তালিম বা নয়া শিক্ষার প্রসারের উপর যার ফলে অহিংসার জয় লাভের অনুকূল এক বাতাবরণের সৃষ্টি হবে। নয়া মানবতাবাদও ঠিক এই জিনিসটাই করতে আগ্রহী। এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে তাহলে কি তারা মহাত্মার পদাঙ্ক-ই অনুসরণ করছে না? অহিংস অস্ত্রের অপব্যবহার করে আর ক্ষমা- সুন্দর সেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে স্বাধীন ভারতে যাঁরা ক্ষমতাসীন হয়েছেন তাঁরা গান্ধীজি যখনই চাইবেন তাঁর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেবেন। তবে তিনি সেটা চাইবেন না। ক্ষমতা আয়ত্তের মধ্যে এলেও তা পাবার জন্য প্রলোভিত না হওয়া নিশ্চয়ই চরম আত্মত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু অপর এক দিক থেকেও ব্যাপারটা দেখা যেতে পারে। তিনি যখন সর্বেসর্বা তখন তিনি আরও ক্ষমতা পাবার জন্য আর লালায়িত হবেন কেন, বিশেষ করে এই বেশি পাওয়া আরও কম পাওয়ায় গিয়ে পর্যবসিত হতে পারে?

রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতি গান্ধীজির মনোভাব স্পষ্টতরভাবে ধরা পড়ে যখন তিনি নঈ তালিমের ভবিষ্যত ব্যাখ্যা করছিলেন ঃ "ক্ষমতা বর্জন করে আর ভোটদাতাদের নিঃস্বার্থ ও বিশ্বস্ত সেবা দিয়ে আমরা তাদেরকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করতে পারি। সরকারে যোগ দিলে আমরা যে ক্ষমতা লাভ করব তার চেয়ে এইভাবেই আমরা অনেক বেশি পরিমানে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হব। তারপর এমন একটা স্তর হয়ত আসবে যখন জনগণ নিজেরাই অন্য সকলকে বাদ নিয়ে শুধু আমাদেরকে ক্ষমতায় বসাতে চাইবে। তখন ব্যাপারটা বিবেচনা করা যাবে। খুব সম্ভবত সে সময় আমি জীবিত থাকব না। কিন্তু যখন

সেই সময় আসবে তখন আমাদের সঙ্ঘসমূহ তাদের ভেতর থেকে এমন কোন ব্যক্তিকে তুলে ধরবে যিনি তাঁর নিজের হাতে শাসনভার নিয়ে নেবেন। তখনই ভারতবর্ষ এক আদর্শ রাষ্ট্রের রূপ নিতে শুরু করবে"।

এর পরেও তিনি বলতে থাকেন ঃ "নিজেরা সরকারে না ঢুকেও আমরা আমাদের পছন্দ মতন ব্যক্তিকে সরকারে পাঠাতে পারি"। এবং "আজকে আমাদের নিজস্ব সরকার গঠিত হয়েছে। আমরা যদি আমাদের যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে পারি তাহলে সর্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থায় জনগণের উপর আমাদের এতখানি প্রভাব অন্তত থাকা উচিত যাতে আমাদের মনোনীত প্রতিটি প্রার্থীই নির্বাচিত হতে পারেন"। তারপরে আবার "মনে কর তোমরা নিজেরা ক্ষমতা নিলে না কিন্তু জনগণের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছ। সেক্ষেত্রে যাকেই তোমরা নির্বাচনে দাঁড় করাবে সেই জিতে আসবে। যতকাল পর্যন্ত ভোটদাতারা তোমাদের হাতে রয়েছে ততকাল পর্যন্ত শাসক দলের সদস্যভুক্ত হওয়া নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই"। পরিশেষে বলা হয়েছে ঃ "ক্ষমতা দখলের ধারণাটাই ছেড়ে দাও তাহলেই তোমরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের চালিয়ে নিতে পারবে ও সঠিক পথ থেকে তাদেরকে সরে আসতে দেবে না"।

রাজা যাঁরা তৈরি করছেন তাঁরা নিজেরা কেন রাজপদে বসতে যাবেন, বিশেষ করে রাজা হলে যখন দায়-দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে হবে? যে সর্ব শক্তির আধার তার কোন দায়িত্ব নেই। শক্তিমান হওয়ার জন্য লালায়িত হওয়া আর ক্ষমতা ছেড়ে থাকা কখনই এক জিনিস নয়। গান্ধীজির ভাষণে "জনগণের উপর বিস্তৃত প্রভাব" "আমাদের প্রার্থী বেছে নেওয়া", "ক্ষমতা পরিচালিত করা" ইত্যাদি শব্দের বহুল ব্যবহার আদৌ অহেতুক নয়। ভাষার ব্যবহার ভাব প্রকাশের লজিকের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। আর শ্রী পিয়ারীলালের সাক্ষ্য থেকে আমরা জানতে পারছি যে, তৎকালে যে সব বিচক্ষণ বাণী তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছিল সেগুলি ছিল অসাধারণ তাৎপর্যমন্ডিত। স্বাধীন ভারতে গঠনমূলক কর্মপন্থার ভবিষ্যত ভূমিকা কী হবে এবং ক্ষমতার রাজনীতির সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কতটুকু এই সব নিয়ে তিনি মনে মনে যা ভাবছেন তার একটা ইঙ্গিত আমরা এখানে পাচ্ছি।

গান্ধীবাদী আদর্শ রাষ্ট্র কী রূপ নেবে তারও একটা আভাস মহাত্মার

ভাষণটিতে ফুটে উঠেছে। জনমানসের উপর ঐকপত্য থাকার ফলে গান্ধীবাদীদের মধ্যে কেউ (এক বচনের প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়) স্বহস্তে সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে নেবেন এবং জনগণ তখন ক্ষমতায় বসা গান্ধীবাদীর নির্দেশানুসারে কাজ করবে। এ একটা অহিংস সমাজ ব্যবস্থা হতে পারে তবে তা হবে মানসিক জুলুমবাজির উপর প্রতিষ্ঠিত কারণ তা না হলে জনগণের মধ্যে সম্পূর্ণ মতৈক্য বজায় রাখা কখনই সম্ভব হবে না। কিন্তু উক্ত রাষ্ট্রকে কোনক্রমেই একটা গণতন্ত্রসম্মত মানবতাবাদী ব্যবস্থা বলা যেতে পারে না। বস্তুত গান্ধীবাদী সমাজব্যবস্থাকে স্বর্গীয় সমাজব্যবস্থারই এক পার্থিব প্রতিরূপ বলা যেতে পারে। স্বর্গীয় ব্যবস্থায় মানুষ এক অতি মানবিক ঈশ্বরীয় উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্রমাত্র আর গান্ধীবাদী ব্যবস্থায় নাগরিকবৃন্দ তাদের অহিংস শাসক কুলের কিংবা কোন ত্রাণকর্তা একনায়ককে অন্ধভাবে অনুসরণ করবে। এর অর্থ হল লোককাহিণীর রামরাজত্বে প্রত্যাবর্তন।

মানুষ ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় স্বরূপ গান্ধীবাদের এই মৌল ধারণা যে নৈতিক মূল্য বোধের জন্ম দিয়েছে তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও কার্যক্ষেত্রে তা একেবারে ব্যর্থ হয়েছে। অপর পক্ষে, মানবতাবাদ মানুষের যুক্তিশীলতার উপর তার নৈতিক দর্শনকে স্থাপিত করেছে। কাজেই আচরণে ঐ নীতি অনুসরণ করে চললে মানুষ ক্রমেই স্বকীয় সহজাত যুক্তিমত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে এবং তার ব্যবহারিক জীবন যুক্তি-শাসিত হবে। গান্ধীবাদ মানুষকে এক অপ্রতিরোধ্য ঈশ্বরীয় ইচ্ছার কাছে তার বিচার বুদ্ধির স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে শেখায়। তার বিশ্বাস, এতেই মানুষের মঙ্গল হবে। গান্ধীবাদ মানুষকে খালি একটা যন্ত্র - একটা উপায়রূপে দেখে, কখনই তাকে এক চূড়ান্ত লক্ষ্যবস্তু বলে গণ্য করে না। মানবতাবাদে কিন্তু এমন কোন অলৌকিক শক্তির স্বীকৃতি নেই যার কাছে মানুষকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। যে যুক্তিশীলতা মনুষ্য চরিত্রের জন্মলব্ধ ধর্ম তাকে ভিত্তি করেই মানুষের চারিত্রনীতি গড়ে উঠেছে। মানবতাবাদ সদম্ভে ঘোষণা করে মানুষ হিসেবেই মানুষ নীতিবাদী হতে পারে এবং রাজনৈতিক আচরণ এক ধরনের মানবিক ক্রিয়াকলাপ হওয়ায় তাও নৈতিক আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হওয়ার অপেক্ষা রাখে।

ক্ষমতার প্রতি পোষিত মনোভাব থেকেও মানবতাবাদ অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। ক্ষমতার রাজীনতির অকপট সমালোচক হওয়ার দরুন তা দলীয়

রাজনীতিও বর্জন করেছে। সেক্ষেত্রে ক্ষমতার লালসা ছাড়াই রাজনীতি করা যেতে পারে। রাজনৈতিক দলসমূহ অসাধু রাজনীতির জনক। অতএব একমাত্র দলহীন রাজনীতিতেই নৈতিক আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ থাকা সম্ভব। আমরা যাকে ক্ষমতা বলি আসলে তা হল কর্মশক্তি এবং তা-ই তা স্বতঃই দুর্নীতির উৎস হতে পারে না। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ একটা অশুভ প্রবণতা। গান্ধীবাদী আদর্শ রাষ্ট্রে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবে "কোন এক ব্যক্তির" হাতে। এটি হল কেন্দ্রীকরণের এক চরম রূপ। যেহেতু প্রতিটি মানুষের মধ্যে অসীম সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে সেহেতু মানবতাবাদ এমন এক সমাজ ব্যবস্থা রচনার স্বপ্ন দেখে যেখানে ক্রমবর্ধমান পরিমাণে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিত হতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তা সর্বত্র সমানভাবে বন্টিত হবে। সংক্ষেপে এটাই হল গান্ধীবাদ ও মানবতাবাদের মধ্যে প্রভেদ।

পরিশিষ্ট-১

মানবেন্দ্রনাথের নতুন দর্শনের পরিকাঠামো

এক

মানুষই সমাজের মূল আদর্শ। সহযোগিতামূলক সমাজ সম্পর্ক ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির বিকাশে সাহায্য করে মাত্র। কিন্তু ব্যক্তির বিকাশই সমাজ প্রগতির একমাত্র মাপকাঠি। সামাজিক স্বাধীনতা ও প্রগতি বলতে যদি সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীনতা ও কল্যাণের সমষ্টিকে না বোঝায় তবে তা কাল্পনিক আদর্শই থেকে যায়, কোনদিনই তা বাস্তবে রূপায়িত হয় না। ব্যক্তি যে কল্যাণ উপভোগ করে তাই প্রকৃত কল্যাণ। মানব-গোষ্ঠীর (জাতি, শ্রেণী, ইত্যাদি) উপর সমষ্টিগত অহংবোধ আরোপ করা অন্যায়। কারণ, তাতে করে ব্যক্তির স্বার্থ বলি দেওয়া হয়। ব্যক্তি-মানুষের কল্যাণের ভিতর দিয়েই আসে সমষ্টিব কল্যাণ।

দুই

মুক্তির আকাঙ্খা ও সত্যানুসন্ধিৎসা মানব প্রকৃতির মূল প্রেরণা। মুক্তির আকাঙ্খা -বুদ্ধি ও আবেগের উচ্চস্তরে জৈবিক-সংগ্রামের সম্প্রসারণ মাত্র। সত্যানুসন্ধিৎসা তারই অনুসিদ্ধান্ত। প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে ক্রম-বর্ধমান জ্ঞানের সাহায্যেই মানুষ বাস্তব ও সামাজিক পরিবেশের এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর অত্যাচার থেকে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। সত্য হচ্ছে জ্ঞানের বিষয়বস্তু।

তিন

মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সব কাজেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে অধিক থেকে অধিকতর স্বাধীনতা অর্জন। শুধুমাত্র সমাজ জীবনের অঙ্গ হিসেবে নয়, মানুষ হিসাবে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির বিকাশের পথে যেসব বাধা আছে তার ক্রমাপসারণই হচ্ছে স্বাধীনতা। সমাজে ব্যক্তি-মানুষের স্থান দিয়েই সমষ্টিগত প্রচেষ্টা ও সামাজিক স্বাধীনতা ও প্রগতিমূলক তাৎপর্যের বিচার করতে হবে। ব্যক্তির কল্যাণই সমষ্টিগত কল্যাণের একমাত্র মাপকাঠি।

চার

নিয়ম-শাসিত প্রাকৃতিক জগতের পটভূমি থেকে মানুষের উদ্ভব হয়েছে বলে মানুষ যুক্তিশীল। যুক্তি একটা জৈবিক বৃত্তি, তাই ইচ্ছার সঙ্গে তার কোন বিরোধ নেই। বুদ্ধি ও ভাবাবেগ একই জৈবিক বৃত্তি থেকে উদ্ভূত। কাজেই ঐতিহাসিক নির্দেশাবাদ ইচ্ছার স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়। প্রকৃতপক্ষে, যেসব শক্তির দ্বারা ইতিহাসে গতি সবচেয়ে বেশী পরিমাণে নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে, মানুষের ইচ্ছা তার অন্যতম। অন্যথা, যুক্তি-সম্মতভাবে নির্দ্ধারিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্যে বিপ্লবের কোন স্থানই থাকত না। যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত নির্দেশ্যবাদকে ধর্মীয় পূর্বনির্দ্ধারণবাদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না।

পাঁচ

ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা বস্তুবাদের ভুল ব্যাখ্যা থেকে উদ্ভূত। এতে দ্বৈতবাদকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বস্তুবাদ অদ্বৈতবাদী দর্শন। ইতিহাস পূর্ব-নির্দ্ধারিত। কিন্তু তার একাধিক কারণ রয়েছে। মানুষের ইচ্ছা হচ্ছে তারই একটি, সে ইচ্ছাকে সর্বদা কোন না কোন অর্থনৈতিক প্রেরণার সঙ্গে যুক্ত করা চলে না।

ছয়

চিন্তা দৈহিক ক্রিয়া মাত্র। পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা থেকেই চিন্তার উদ্ভব। কিন্তু চিন্তাধারাগুলি একবার গঠিত হয়ে গেলে তা স্বাধীন সত্তা লাভ করে এবং তার নিজস্ব নিয়মে চালিত হয়। গতিশীল চিন্তাধারা ও সমাজ বিবর্তনধারা পরস্পরকে প্রভাবিত করে এগিয়ে চলে সমান্তরাল গতিতে। কিন্তু মানব বিবর্তনের কোন স্তরেই গতিশীল চিন্তাধারা ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করা চলে না। (এখানে চিন্তাধারা বলতে দার্শনিক ভাবধারা ও মতবাদকেই বোঝাবে)। সাংস্কৃতিক নক্সা ও নৈতিক মূল্যমান প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক সম্পর্কের শুধু ভাবগত উপরিতলমাত্র নয়, সেগুলিও ইতিহাসের নিজস্ব যুক্তি দ্বারা নির্দ্ধারিত।

সাত

এক স্বাধীন নতুন জগৎ গড়ে তুলতে হলে বিপ্লবকে সমাজের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সীমা অতিক্রম করে যেতে হবে। শোষিত ও নির্যাতিত জনগণের নামে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করে উৎপাদন-যন্ত্র থেকে ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ

করলেই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

আট

কম্যুনিজম বা সমাজতন্ত্র স্বাধীনতা অর্জনের উপায় মাত্র। কিন্তু তাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে কিনা তার বিচার একমাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়েই হতে পারে। যে রাজনৈতিক মতবাদে বা অর্থনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রক্তমাংসের বাস্তব মানুষকে সমষ্টিগত অহং-এর বেদীমূলে (তা জাতিই হোক আর শ্রেণীর হোক) বলি দেওয়া হয়, তা দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে কি না, তাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। একদিকে, স্বাধীনতার অস্বীকৃতির ভিতর দিয়েই স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌছান যাবে, এ বিতর্ক যেমন অর্থহীন - অন্যদিকে, ব্যক্তি-মানুষকে কাল্পনিক সমষ্টিগত অহং-এর কাছে বলিদানকে আর যাই বলা যাক, স্বাধীনতা বলা চলে না। সে সমাজ-দর্শন বা সমাজ-পুনর্গঠন-পরিকল্পনায় ব্যক্তির সার্বভৌমত্ব অস্বীকৃত, ব্যক্তি-স্বাধীনতা কাল্পনিক শূন্য-গর্ভ আদর্শ বলে পরিত্যক্ত তার বৈপ্লবিক ও প্রগতিমূলক তাৎপর্য সীমাবদ্ধ না হয়ে পারে না।

নয়

রাষ্ট্র সমাজের রাজনৈতিক সংগঠন, কাজেই কম্যুনিজমের অধীনে রাষ্ট্রের বিলোপ হবার সম্ভাবনা শুধু কল্পনা-বিলাস মাত্র। বাস্তব অভিজ্ঞতায় তা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক শিল্পভিত্তিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য চাই শক্তিশালী রাষ্ট্র। একমাত্র রাষ্ট্রের উপর গণতান্ত্রিক কর্তৃত্বই নতুন সমাজ-ব্যবস্থায় স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাকে সুনিশ্চিত করতে পারে। রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করেই ব্যবহারের জন্য উৎপাদন সম্ভব হতে পারে।

দশ

শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানা বা পরিকল্পিত অর্থনীতির দ্বারা শ্রমিক-শোষণের অবসান হয় না, কিংবা তাতে যে ধনের সমবন্টন হবে এমন কোন কথাও নেই। অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা যতটুকু, রাজনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশী নয়।

এগারো

একনায়কত্বের নিজেকে চিরস্থায়ী করার ঝোঁক দেখা যায়। একনায়ক রাষ্ট্রের অধীনে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কার্যকুশলতা, সমষ্টিগত প্রচেষ্টা আর সমাজ-

প্রগতির অজুহাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্বিত হয়ে থাকে। ফলে সমাজতান্ত্রিক সমাজে যে উচ্চতর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা কল্পনা করা হয়, তা সম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। একনায়কত্ব তার স্বীকৃত উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দেয়।

বারো

পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের ত্রুটিও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে ধরা পড়েছে। সে ত্রুটির উদ্ভব হয়েছে প্রতিনিধিমূল শাসনব্যবস্থা থেকে। গণতন্ত্রকে কার্যকরী করে তুলতে হলে সব ক্ষমতা ন্যস্ত করতে হবে জনসাধারণের উপর। জনগণ শুধু সাময়িকভাবেই নয়, দৈনন্দিন শাসনকার্যেও তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা যাতে করে প্রয়োগ করতে পারে তার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। বস্তুত, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, নিস্ক্রিয় নাগরিকগণ অধিকাংশ সময়ের জন্যই ক্ষমতাহীন। নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাষ্ট্রের উপর স্থায়ী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কোন উপায়ই তাদের হাতে নেই।

তেরো

আনুষ্ঠানিক পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে উদারনৈতিক আদর্শ মিথ্যা ব্যঙ্গে পরিণত হয়েছে। "অবাধ বাণিজ্য নীতি" মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণকে আইন-সংগত করে তোলে। "অর্থনৈতিক মানুষের" ধারণা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের কার্যকারিতাকে নষ্ট করে দেয়। "অর্থনৈতিক মানুষ" হয় নিজে দাস হবে, নয়তো অন্যকে দাস করে রাখবে। মানুষ সম্পর্কে আমাদের এই ইতর ধারণার বদলে মানুষ যে স্বভাবতই যুক্তিশীল অতএব নীতিপরায়ণ - এ সত্যটাকে তুলে ধরতে হবে। নীতির আবেদন বিবেকের কাছে, আর বিবেক হচ্ছে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা ও তার প্রতি প্রতিক্রিয়ার ফল মাত্র। বিবেক চেতনার স্তরে একটা যান্ত্রিক জৈবিক ক্রিয়া। অতএব তা যুক্তিশীলও বটে।

চৌদ্দ

পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের বিকল্প একনায়কত্ব নয়। পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, অসহায় নিস্ক্রিয় নাগরিকদের নিয়ে গঠিত আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের বিকল্প হচ্ছে সংহত গণতন্ত্র। তারই উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে এক পিরামিড আকার রাষ্ট্র। পার্লামেন্ট হবে তারই চূড়া। সমাজের রাজনৈতিক সংগঠন (অর্থাৎ রাষ্ট্র) সমাজের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যাবে। ফলে, রাষ্ট্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে জনগণের স্থায়ী কর্তৃত্ব।

পনের

চিন্তাশীল বৈপ্লবিক মানুষই হচ্ছে এ জগতের স্রষ্ট্রা - এ ঐতিহাসিক সত্যটার গুরুত্ব স্বাধীনতার বৈপ্লবিক দর্শন করে নেবে। মানুষের মস্তিষ্ক এক উৎপাদন-যন্ত্র বিশেষ। তাতে উৎপন্ন হয় সবচেয়ে বৈপ্লবিক পণ্য-সামগ্রী। বিপ্লব মাত্রেরই মূলে আছে কালোপাহাড়ী চিন্তা। নিজেদের সৃষ্টি ক্ষমতায় সচেতন, নতুন জগৎ গড়ে তোলার অদম্য সংকল্পে দৃঢ়, চিন্তাক্ষেত্রে নব নব অভিযানে অনুপ্রাণিত এবং মুক্ত মানুষের সমবায়ে যুক্ত সমাজ গড়ে তোলার আদর্শে উদ্দীপ্ত মানুষের সংখ্যা যতই বাড়বে, ততই গড়ে উঠবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ।

ষোল

বিপ্লবের কর্মসূচী ও পদ্ধতি সমাজ-প্রগতির মূল তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই রচনা করতে হবে। স্বাধীনতা ও যুক্তিনির্ভর সমবায়িক জীবন যাত্রার মূলনীতিগুলি জনগণকে শিক্ষা দেবার সুদৃঢ় ও ব্যাপক প্রচেষ্টা থেকেই সমাজে আসবে নবজাগরণ। জনগণকে গণপঞ্চায়েতের ভিতর সংঘবদ্ধ করে তুলতে হবে। এই গণ-পঞ্চায়েতগুলি হবে সমাজের রাষ্ট্রীয় ভিত্তি। সমাজ-বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন নব-জাগরিত মানুষের সঙ্গে গণ-পঞ্চায়েতের ঘনিষ্ট যোগাযোগ। তেমনি স্বাধীনতা, যুক্তি ও সুসমঞ্জস্য সমাজ সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে রচিত হবে বিপ্লবের কর্মসূচী। ফলে, সর্বপ্রকার একচেটিয়া ব্যবস্থা ও কায়েমী স্বার্থের নিয়ন্ত্রণ থেকে সমাজ জীবন হবে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

সতের

মৌলিক গণতন্ত্র বলতে সমাজের অর্থনীতিকে এরূপ ভাবে পুনর্গঠন করা বোঝায়, যাতে করে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান ঘটে। সমাজের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তির ভৌতিক (material) প্রয়োজন মেটানোর উপর নির্ভর করে তার বুদ্ধিবৃত্তি ও অন্যান্য সুক্ষ্ম মানবীয় সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ। ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান যাতে ক্রমে বৃদ্ধি পায়, এরূপ পুনর্গঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরই মৌলিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি হচ্ছে স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছবার এক অপরিহার্য শর্ত।

আঠার

নতুন সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তি হবে ব্যবহারের জন্য উৎপাদন ও প্রয়োজন অনুসারে বন্টন। তার রাজনৈতিক সংগঠনে প্রতিনিধিমূলক শাসনের

কোন স্থানই থাকবে না, কারণ প্রতিনিধিমূলক শাসন জনগণকে তাদের কার্যকরী ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে। সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের গণপঞ্চায়েতের মারফৎ শাসনকার্যে সরাসরি অংশগ্রহণই হবে তার রাজনৈতিক ভিত্তি। জনগণের মধ্যে জ্ঞানের ব্যাপক প্রসার এবং বিজ্ঞান ও অন্যান্য সৃজনাত্মক কাজে যত কম সম্ভব বাধা-নিষেধ আরোপ ও যত বেশী সম্ভব উৎসাহ দানই হবে তার সাংস্কৃতিক ভিত্তি। বিজ্ঞান ও যুক্তির উপর নির্ভর করে গড়ে উঠবে বলে এ নতুন সমাজ-ব্যবস্থা হবে স্বভাবতই পরিকল্পিত। কিন্তু সে পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা। কাজেই, এ নতুন ব্যবস্থার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক - সব দিক দিয়েই হবে স্বাধীন। ফলে, এ গণতন্ত্র আত্মরক্ষায় হবে সম্পূর্ণ সক্ষম।

উনিশ

এক স্বাধীন জগৎ গড়ে তুলতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, মুক্তবুদ্ধি মানুষের সমবেত প্রচেষ্টাতেই মৌলিক গণতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হবে। তাঁরা জনগণের ভাবী শাসকের ভূমিকা গ্রহণ করবে না, গ্রহণ করবে তাঁদের পথপ্রদর্শক, বন্ধু ও দার্শনিকের ভূমিকা। স্বাধীনতার লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে তাদের রাজনৈতিক আচরণ হবে যুক্তিসম্মত অতএব নীতিসম্মত। জনগণের মুক্তির আকাঙ্খা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রচেষ্টাও ক্রমে জোরদার হবে। আলোকপ্রাপ্ত জনমতের সমর্থনে ও জনগণের সুবিবেচনাপূর্ণ সক্রিয় সহযোগিতায় অবশেষে উদ্ভব হবে মৌলিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ স্বাধীনতার লক্ষ্যের সঙ্গে খাপ খায় না বলে মৌলিক গণতন্ত্রবাদীরা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণকেই তাদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করবে।

কুড়ি

শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে খর্ব না করে সমাজ-প্রগতি ও কল্যাণের উপযোগী সামাজিক পুনর্গঠন একমাত্র গণশিক্ষার ভিতর দিয়ে সম্ভব। গণপঞ্চায়েতগুলি হবে জনসাধারণের রাজনৈতিক ও নাগরিক শিক্ষার পাঠশালা। মৌলিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গঠন ও কার্যপ্রণালী অনাসক্ত মানুষদের সমাজের পুরোভাগে এসে দাঁড়াবার সুযোগ করে দেবে। এরূপ লোকেদের দ্বারা চালিত রাষ্ট্র আর শ্রেণী বিশেষের হাতে অত্যাচারের যন্ত্রে পরিণত হতে পারবে না। একমাত্র ক্ষমতাসীন, মুক্তবুদ্ধি মানুষের পক্ষেই

দাসত্বের শৃঙ্খল চূর্ণ করে সকলের জন্য স্বাধীনতা আনা সম্ভব।

একুশ

মৌলিক গণতন্ত্র সমাজকে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে গড়ে তুলে ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টি-জীবনের সমন্বয় ঘটাতে চায়। স্বাধীনতার নৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য এতে স্বীকৃত হয়েছে। সমাজ-প্রগতির এক নতুন ব্যাখ্যা এতে তুলে ধরা হয়েছে। অর্থনৈতিক নির্দশ্যবাদ ও চিন্তাধারার গতিশীলতা-দুইই তাতে যথাযোগ্য স্বীকৃতি পেয়েছে। সমাজ-প্রগতির সে তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে সমাজ-বিপ্লবের যুগোপযোগী কার্যপ্রণালী ও কর্মসূচী।

বাইশ

''মানুষই সবকিছুর পরিমাপক'' (প্রোটাগোরাস), অথবা ''মানুষই মানবজাতির মূল'' (মার্কস)) এ বিজ্ঞবাণী থেকেই মৌলিক গণতন্ত্রের সূত্রপাত। মৌলিক গণতন্ত্র আমাদের কাছে তুলে ধরেছে মুক্তবুদ্ধি, নীতিনিষ্ঠ মানুষের সমবায়ে, সৌভ্রাতৃত্বমূলক সমবায়িক রাষ্ট্ররূপে জগৎকে পুনর্গঠনের আদর্শ।

পরিশিষ্ট - ২

মানবেন্দ্রনাথ রায় রচিত পুস্তক ও পুস্তিকার তালিকা

1. El Camino Para La Paz Duradera del Mundo (The Way to Durable Peace . An open letter to President Wilson) including chapters on Monroe Doctrine; Mexico, 1917
2. La India : su pasado, su presente su porvenir; Mexico, 1918.
3. Letters to Indian Nationalists, 1920
4. The Problems of India, 1920.
5. India in Transition, Geneva, 1922. Also Russian version, 1921 and German version, 1922.
6. What do we want? Geneva, 1922
7. India's Problem and its solution, 1923
8. One year of Non-Co-operation from Ahmedabad to Gaya, jointly with Evelyn Roy, Calcutta, 1923
9. Political Letters, Zurich, 1924
10. Cawnpur Conspiracy Case · An open letter to the Rt Hon.J R. Macdonald, London, 1924.
11. What is to be done? 1925
12. The Aftermath of Non-Co-operation; London, 1926
13. The Future of Indian Politics ; London 1926 Also Russian edition : German edition, Hamburg, Berlin.
14. La Liberation Nationale des Indes, Paris, 1927.
15. Les Allies Internationaux de l' Opposition du P. C.'et de l' RUSS. Paris, 1927.
16. Die Internationlen Verbundeten der Opposition in der KPDSU. Hamburg, 1928.
17. Kitaiskaia revoliutsiia i Kommunisticheskii International; Moscow & Leningard, 1929.
18. The Lessons of the Lahore Congress, 1930.
19. Revolution und Konter Revolution in China. Berlin, 1930. English version, 'Revolution and Counter-revolution in China'. Published from Calcutta, 1946.

20. Our task in India 1932
21. I accuse, New York, 1932 Same text published in India at the same time under the title, My Defence
22. Our Problems, 1937.
23 Letters to Congress Socialist Party, 1937
24 Our Differences, 1938
25 My Experiences in china, 1938
26 Fascism Its Philosophy, Profession and Practice, 1938
27 The Historical Role of Islam, 1939
28. Heresies of Twentieth Century, 1939
29. From Savagery to Civilization, 1939
30. The Alternative, 1940.
31 Materialism An Outline of the History of Scientific Thought, 1940.
32 Science and Superstition, 1940
33. Man and Nature, 1940.
34 Letters to Mahatma Gandhi 1940
35 Gandhism, Nationalism and Socialism, 1940
36 The Memories of a Cat 1941
37 Ideal of Indian Womanhood, 1941
38. Freedom or Fascism? 1942.
39. Scientific Politics, 1942.
40. War and Revolution, 1942.
41 India and War, 1942
42. Communist International, 1943
43. Nationalism, An Antiquated Cult, 1943
44. Indian Labour and Post-War Reconstruction, 1943
45. Nationalism, Democracy and Freedom, 1943
46. Poverty or Plenty? 1943.
47. Planning a New India, 1943.
48. Letters from Jail, 1943.
49. People's plan for Post-War Economic Development of India, Introduction to; 1944.
50. Alphabet of Fascist Economics, 1944.
51. National Government or People's Government? 1944.
52. Constitution of India, A Draft, 1944.

53. This way to Freedom, 1944.
54. Last Battles of Freedom, 1944.
55. Problems of Freedom, 1945.
56 Jawaharlal Nehru, 1946
57 I.N.A and The August Revolution, 1946
58 New Orientation, 1946
59 Beyond Communism, 1946
60. New Humanism, 1947.
61 Science and Philosophy, 1947
62. The Russian Revolution, 1949.
(The first part of the book was originally published as a smaller book in 1937)
63. India's Message, 1950.
64. Radical Humanism, 1952
65. Reason, Romanticism and Revolution, 2 vols, 1952
66. Crime and Karma, Cats and Women, 1957.
67. Politics, Power and Parties, 1962.
(Posthumously published)
68. Memoris, 1964 - (Posthumously published)
69. Men I Met, 1968 - (Posthumously published)

PAMPHLETS

1. My Crime (on his expulsion from the Comintern), 1937
2. On Stepping Out of Jail; 1936.
3. Which way, Lucknow? (Written in Jail); 1936.
4. On the Congress Constitution; 1938.
5. My Differences with the Congress; 1940.
6. Tripuri and After; 1940.
7. This war and our Defence; 1940.
8. The new Path Manifesto of the Radical Democratic Party); 1940.
9. Message to the U.S.S.R.; 1942.
10. History is not made this way (with others); 1945.
11. On Communal Question.
12. What is Marxism? 1940.
13. The Future of Socialism; 1943.

14. A New Approach to Communal Problem.
15. Indian Renaissance Movement; 1944.
16 New Orientation; 1946.
17. The Congress and the Kisans.
18. States Peoples' Struggle and the Congress
19. Principles of Mass Mobilisation; 1940.
20. Twentieth Century Jacobinism; 1940.
21. Relation of Classes; 1940.
22. Your Future; 1944
23 Future of Democracy, 1945
24. Sino-Soviet Treaty; 1945.
25. Satyagraha and the potentialities of the Congress; 1938
26. Origin of Radicalism in Congress; 1939.
27 People's Party.
28. Whither Europe? 1940.
29 World Crisis; 1940.
30. Problems of Indian Revolution; 1941.
31. Post-war Perspective; 1942.
32 Library of a Revolutionary, 1942.
33 Leviathan and Octopus; 1947.
34. Asia and the World; 1947
35. Cultural Prerequisites of Freedom.
36 The 22 Thesis of Radical Democracy; 1947.
37. The Concept of Causality in Modern Science; 1949
38. The Way Ahead in Asia; 1951.
39. Humanist Politics; 1950.

পরিশিষ্ট - ৩

ঘটনাপঞ্জী

১৮৮৭, ২১ মার্চ ঃ আড়বেলিয়ায় (উত্তর ২৪ পরগণা) নরেন ভট্টাচার্যের জন্ম।

১৮৯৯ ঃ চাংড়ীপোতায় (দক্ষিণ ২৪ পরগণা) পিতা দীনবন্ধু ভট্টাচার্যের নিজের কেনা বাড়িতে বাস পরিবর্তন।

১৯০১ ঃ শিবনারায়ণ স্বামীর নিকট লাঠি খেলা ও যোগ শিক্ষা শুরু।

১৯০২, ২০ মার্চ ঃ সতীশচন্দ্র বসু কর্তৃক "অনুশীলন সমিতির" প্রতিষ্ঠা।

ডিসেম্বর ঃ যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 'ইষ্ট ক্লাব' প্রতিষ্ঠা।

১৯০৩ ঃ বৈষ্ণব সাধু রামদাস বাবাজীর কাছে শিক্ষা শুরু।

১৯০৪ ঃ আড়বেলিয়ার সম্পর্কীয় ভাই অবিনাশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (পরে নিরালম্ব স্বামী) ইষ্ট ক্লাবে যোগদান।

১৯০৫, মে ঃ পিতা দীনবন্ধু ভট্টাচার্যের মৃত্যু।

জুলাই ঃ ব্রিটিশ ভাইসরয় কার্জন কর্তৃক বঙ্গ-বিভাগ পরিকল্পনা ঘোষণা।

১৬ই অক্টোবর ঃ বঙ্গ বিভাগ কার্যকরী করার তারিখ।

ঃ বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শোভাযাত্রা সংগঠন করে অভ্যর্থনা করার জন্য হরিনাভি বিদ্যালয় হইতে বহিস্কৃত।

ঃ অনুশীলন সমিতির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে যোগদান।

১৯০৬ ঃ মায়ের ডাক, নরেন ভট্টাচার্যের প্রথম বাংলা বই

		রচনা। আজও অপ্রকাশিত।
১৯০৭	ঃ	যতীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা।
৬ ডিসেম্বর	ঃ	চাংড়ীপোতা রেল স্টেশনে বাংলার প্রথম রাজনৈতিক ডাকাতি নরেন ভট্টাচার্য একার দ্বারা সম্পাদিত।
১৯০৮, ২০জানুয়ারী	ঃ	চাংড়ীপোতায় গ্রেপ্তার ও জামিনে মুক্তি।
জানুয়ারী	ঃ	মাতার মৃত্যু।
১৯০৯	ঃ	অনুশীলন সমিতি এবং আরও অনেকগুলি সমিতি বে-আইনি ঘোষিত।
১৯০৯, ২৫ এপ্রিল	ঃ	২৪ পরগণা জেলার নেত্রায় হরিকুমার চক্রবর্তী সহযোগে ডাকাতি।
	ঃ	আরও কয়েকটি ডাকাতি।
১৯১০, ২৯ জানুয়ারী	ঃ	হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় নরেন ভট্টাচার্য ও যতীন মুখোপাধ্যায় সহ ৪৪জন গ্রেপ্তার।
১৯১১, এপ্রিল	ঃ	অপরাধ প্রমাণাভাবে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের মুক্তি।
মে	ঃ	হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার খরচের জন্য নরেন ভট্টাচার্য্যের উপর ২০০ টাকা ধার্য হয়। সেই টাকা দেবার জন্য চাংড়ীপোতার পৈতৃক বাড়ি বন্ধক।
১২ ডিসেম্বর	ঃ	বৃটিশ সরকার কর্তৃক দুই বাঙলার পুনরেকীকরণ এবং কলিকাতা থেকে ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত।
১৯১১-১৩	ঃ	যতীন মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নতুন করে বিপ্লবী দল সংগঠন করার জন্য নরেন ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টার। সাধুর ছদ্মবেশে বাঙলা, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন শহরে বিপ্লবী দলের সংগঠনের কাজে ভ্রমণ।

১৯১৪, ৪ আগষ্ট ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু।

ঃ যতীন মুখোপাধ্যায়ের সর্বময় নেতৃত্বে নতুন বিপ্লবী বাহিনী সংগঠিত।

২৬ আগষ্ট ঃ রডা কোম্পানীর গুদাম থেকে ৫০টি মজার পিস্তল এবং ৪৬,০০০ গুলি লুঠ।

১৯১৫, ১২ ফেব্রুয়ারী ঃ নরেন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গার্ডেনরীচে বার্ড কোম্পানির গাড়ি থামিয়ে ১৮,০০০ টাকা লুঠ।

১৩ ফেব্রুয়ারী ঃ নরেন ভট্টাচার্য গ্রেপ্তার।

২২ ফেব্রুয়ারী ঃ জামিনে মুক্তি; বেলেঘাটার ডাকাতি।

২৮ ফেব্রুয়ারী ঃ নরেন ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তারের অপরাধে পুলিশ ইনসপেক্টর সুরেশ মুখার্জীকে যতীন মুখোপাধ্যায়ের আদেশে গুলি করে হত্যা।

মার্চ ঃ যতীন মুখোপাধ্যায়কে বালেশ্বরের নিকট মোহনদিয়ার গুপ্ত ঘাটিতে স্থানান্তরিত।

এপ্রিল ঃ রেভারেন্ড চার্লস মার্টিন ছদ্মনামে নরেন ভট্টাচার্যের বাটাভিয়া যাত্রা; ম্যাভরিক জাহাজে প্রেরিত ৩০,০০০ রাইফেল এবং প্রতি রাইফেলের জন্য ৪০০ গুলি করাচীর পরিবর্তে সুন্দরবনের রায়মঙ্গল দ্বীপে পাঠাবার ব্যবস্থা করার জন্য এবং জার্মানদের সঙ্গে অন্যান্য কথাবার্তার জন্য।

১৪ জুন ঃ নরেন ভট্টাচার্যের প্রত্যাবর্তন এবং মোহনদিয়ায় যতীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরামর্শ।

আগষ্ট ঃ ম্যাভরিক জাহাজ না পৌঁছানোর জন্য, অস্ত্রের সন্ধানে রেঃ মার্টিন ছদ্মনামে দ্বিতীয় বার ব্যাটাভিয়া যাত্রা। যাত্রার পূর্বে মোহনদিয়ায় যতীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরামর্শ।

৯ই সেপ্টেম্বর ঃ পুলিশ কর্তৃক বালেশ্বরের ইউনিভার্সাল

এম্পোরিয়াম তল্লাস, হরিকুমার চক্রবর্তী ও তার ভাই গ্রেপ্তার। মোহনদিয়ার ঘাঁটিতে পুলিশের অনুসরণ, পুলিশের সঙ্গে লড়াই-এ যতীন মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

১৯১৬, জুন : অস্ত্রের সন্ধানে ইন্দোনেশিয়া, মালয়, চিন, জাপান ঘুরে জার্মানির পথে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে আগমন। পথে ম্যানিলায় যতীনদার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তি।

১৯১৬, ১৫ জুন : স্যান ফ্রানসিসকোয় আগমন।

১৬ জুন : প্যালো এ্যাল্টো শহরে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় -এর আতিথ্য গ্রহণ ও নতুন নাম গ্রহণ - মানবেন্দ্রনাথ রায় এভেলিন ট্রেন্টের সঙ্গে পরিচয়।

১৫ সেপ্টেম্বর : মানবেন্দ্রনাথ ও এভেলিন লস এ্যাঞ্জেলেস শহরে।

অক্টোবর : জার্মানি যাওয়ার উদ্দেশে নিউ ইয়র্ক শহরে।

১৯১৭, ৭ই মার্চ : কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মানবেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার।

৯ই মার্চ : জামিনে মুক্তি। কয়েকদিন পর মেক্সিকোর পথে টেক্সাস অভিমুখে যাত্রা।

৬ এপ্রিল : জার্মানির বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ ঘোষণা।

১৭ এপ্রিল : ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টী কর্তৃক আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনকে লেখা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ‘খোলা চিঠি’ প্রকাশিত।

১৫ জুন : মেক্সিকো শহরে আগমন।

আগষ্ট : মেক্সিকোর সোশালিস্ট পার্টিতে আমন্ত্রিত।

৭ নভেম্বর : রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির ক্ষমতা দখল।

	ঃ	স্থায়ী শান্তির পথ স্প্যানিশ ভাষায় প্রকাশিত।
১৯১৮, আগষ্ট	ঃ	মেক্সিকোর সোশালিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত।
অক্টোবর	ঃ	সারা লাতিন আমেরিকার সোশালিষ্ট কনফারেন্স সংগঠন।
	ঃ	লা ইন্ডিয়া, সু গ্যাসাডো, সু প্রেসেন্টে ই সু পারভেনির (ভারতবর্ষ ঃ অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ) স্পানিশ ভাষায় রচনা ও প্রকাশ।
১৯১৯, ১৫ জানুয়ারী	ঃ	স্পার্টাকাসবান্দ-এর নেত্রী রোজা লাক্সেমবুর্গকে জার্মান সৈন্য কর্তৃক গ্রেপ্তার ও গুলি করিয়া হত্যা।
মার্চ	ঃ	তৃতীয় (কমিউনিষ্ট) আর্ন্তজাতিকের (কমিনটার্ন) প্রতিষ্ঠা।
মে	ঃ	সোভিয়েত সরকারের প্রতিনিধি বরোদিনের মেক্সিকো আগমন, মানবেন্দ্রনাথের আতিথ্য গ্রহণ।
২৫ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর	ঃ	মেক্সিকোর সোশালিষ্ট পার্টির বিশেষ অধিবেশনে রাশিয়ার বাহিরে পৃথিবীর প্রথম কমিউনিষ্ট পার্টি মানবেন্দ্রনাথ কর্তৃক মেক্সিকোতে সংগঠিত।
ডিসেম্বর	ঃ	লেনিনের আমন্ত্রণে কমিনটার্নের দ্বিতীয় বিশ্ব-কংগ্রেস যোগদানের জন্য মস্কো অভিমুখে যাত্রা।
২৮ জুন	ঃ	প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ভার্সাই চুক্তি সম্পাদিত।
১৯২০, জানুয়ারী-এপ্রিল	ঃ	জার্মানিতে মানবেন্দ্রনাথ। জার্মান কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ ও আলোচনা।
এপ্রিলের শেষ দিকে	ঃ	লেনিনগ্রাড হয়ে মস্কোয় উপস্থিতি। লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ।
১ মে	ঃ	রেড স্কোয়ারে মে দিবস উপলক্ষে বক্তৃতা।

মে : লেনিনের সঙ্গে ঔপনিবেশিক প্রশ্ন সম্পর্কে কয়েকদিন আলোচনা।

১৯২০, ১৯ জুলাই -

৭ আগস্ট : কমিনটার্নের দ্বিতীয় বিশ্ব-কংগ্রেস।

সেপ্টেম্বর : তাসখন্দে কমিনটার্নের সেন্ট্রাল এশিয়াটিক ব্যুরো মানবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে গঠিত। মুহাজিরদের শিক্ষার জন্য কমিউনিস্ট স্কুল ও সামরিক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

১৭ অক্টোবর : তাসখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা।

১৯২১, ১৬ মার্চ : ইংলন্ডের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত।

মার্চ : বোখারায় মানবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠা।

এপ্রিল : তাসখন্দের ঘাঁটি তুলে মস্কোয় প্রত্যাবর্তন - ২২ জন মুহাজিরসহ।

: মস্কোতে কমিউনিস্ট ইউনিভার্সিটি ফর দি টয়লার্স অফ দি ইস্ট প্রতিষ্ঠা। মানবেন্দ্রনাথ রাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক, ওর স্ত্রী এভেলিন শিক্ষিকা।

২২ জুন- ১২ জুলাই : কমিনটার্নের তৃতীয় কংগ্রেস।

আগস্ট : রুশভাষায় 'ইন্ডিয়া ইন ট্রানজিশন' (পরিবর্তনের পথে ভারত) রচনা ও প্রকাশ।

সেপ্টেম্বর : নলিনী গুপ্তকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম ইস্তাহারসহ ভারতবর্ষে প্রেরণ।

: দফায় দফায় মুহাজিরদের ভারতবর্ষে প্রেরণ। প্রথম দুজন মোহম্মদ আকবর খাঁ ২৫শে সেপ্টেম্বর এবং হাফিজুল্লা খাঁ ২৮শে সেপ্টেম্বর পেশোয়ারে গ্রেপ্তার।

	ঃ	ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা শুরু।
নভেম্বর	ঃ	আফগানিস্তানের সঙ্গে রাশিয়ার চুক্তি।
	ঃ	কলকাতায় মুজফ্ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতির সঙ্গে নলিনী গুপ্তের সাক্ষাৎ ও আলোচনা।
ডিসেম্বর	ঃ	জাতীয় কংগ্রেসের আহমেদাবাদ অধিবেশনে এম. এন. রায় প্রেরিত কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার পেশ। গান্ধীজি প্রস্তাবিত অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
১৯২২ মার্চ	ঃ	নলিনী গুপ্তের জার্মানী প্রত্যাবর্তন
এপ্রিল	ঃ	জার্মানিতে মানবেন্দ্রনাথের ঘাঁটি স্থাপন।
১৫ মে	ঃ	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম মুখপত্র, 'ভ্যানগার্ড অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেডেন্স' এর প্রথম সংখ্যা বার্লিন থেকে প্রকাশিত।
জুন	ঃ	ইন্ডিয়া ইন ট্রানজিশন এর প্রথম ইংরাজি সংস্করণ, ভারতবর্ষের সমস্যা ও তার সমাধান এবং আমরা কি চাই - ৩খানি বই ইংরাজি ভাষায় রচনা ও প্রকাশ।
৭ নভেম্বর - ৩ ডিসেম্বর	ঃ	কমিনটার্নের চতুর্থ কংগ্রেস। মানবেন্দ্রনাথ কমিনটার্নের কার্যকরী সমিতির (ই,সি,সি, আই) ক্যান্ডিডেট মেম্বার এবং প্রাচ্য কমিশনের সদস্য নির্বাচিত।
নভেম্বর	ঃ	নলিনী গুপ্তকে দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে প্রেরণ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে লেখা মানবেন্দ্রনাথের চিঠিসহ।
২২ ডিসেম্বর	ঃ	জাতীয় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনের প্রাক্কালে দেশবন্ধুকে পাঠানো মানবেন্দ্রনাথের ইস্তাহার প্রধান প্রধান ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত।
	ঃ	জার্মানি হইতে বহিস্কৃত।

১৯২৩ : মানবেন্দ্রনাথ এবং 'এভেলিন রচিত আহ্‌মেদাবাদ থেকে গয়া' প্রকাশিত।

জুন : কমিনটার্নের প্রেসিডিয়াম (সভাপতি মন্ডলী) -এর সভ্য নির্বাচিত (ইন্‌প্রেকার, III-৪৫ (১৯২৩), পৃঃ ৪৩৮)

: পেশোয়ার কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় ১০ জন অভিযুক্ত কমিউনিস্টদের মধ্যে ৫ জনের ৫ বৎসর সশ্রম কারাদন্ড। ১০ জন অভিযুক্তদের মধ্যে ৯ জন তাসখন্দে প্রতিষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য।

১৯২৪, ২১ জানুয়ারী : লেলিননের মৃত্যু।

: ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নতুন মুখপত্র, ম্যাসেস এবং ঔপনিবেশিক কমিশনের কার্যালয় প্যারিসে স্থানান্তরিত।

এপ্রিল-মে : কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের।

অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ. নলিনী গুপ্ত, মুজফ্‌ফর আহমেদ, শ্রীপদ ডাঙ্গে, শৌকত ওসমানী।

জুন : কমিনটার্নের পঞ্চম কংগ্রেস।

১৯২৫, ১ জানুয়ারী : মাসেস পত্রিকার নাম পরিবর্তন। 'মাৎসেস অফ ইন্ডিয়া' নতুন নামে প্যারিস হইতে প্রকাশিত।

জানুয়ারী : আরি বারবুসের সভাপতিত্বে প্যারিসে কমিটি প্রো-হিন্দু স্থাপিত।

৩০ জানুয়ারী : প্যারিসে গ্রেপ্তার এবং ফ্রান্স হইতে ২৪ ঘন্টার নোটিশে মানবেন্দ্রনাথ বহিস্কৃত।

এপ্রিল : ফরাসি প্রেসিডেন্টের নিকট মানবেন্দ্রনাথের প্রতিবাদপত্র। লন্ডন হইতে প্রকাশিত রজনী পাম দত্ত সম্পাদিত দি লেবার মন্ডলী পত্রিকায়

	এভেলিনের প্রতিবাদ ও মানবেন্দ্রনাথের প্রতিবাদ পত্র প্রকাশ।
২৫ জুন	ঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু।
আগষ্ট	ঃ এভেলিনের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ। এভেলিনের আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন। মানবেন্দ্রনাথ মস্কোয়।
২৪ সেপ্টেম্বর	ঃ মস্কো থেকে গ্রেট ব্রিটেন কমিউনিস্টপার্টির প্রতি চিঠিতে নির্দেশ-মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ না করে ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়ার জন্য।
অক্টোবর	ঃ মানবেন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা স্ট্যালিন কর্তৃক বাতিল।
১লা নভেম্বর	ঃ কাজি নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে লেবাব স্বরাজ্য পার্টি প্রতিষ্ঠা।
১৯২৬ ফেব্রুয়ারী	ঃ 'ম্যাসেস অফ ইন্ডিয়া' পত্রিকায় লেবার স্বরাজ্য পার্টি-কে মানবেন্দ্রনাথের অভিনন্দন প্রকাশিত।
	ঃ মানবেন্দ্রনাথ কমিনটার্নেব মুখপত্র, ইনপ্রেকর পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচিত।
৬-৭ ফেব্রুয়ারী	ঃ লেবার স্বরাজ্য পার্টির নাম পরিবর্তন করে পেজান্টস এ্যান্ড ওয়ার্কস পার্টি করা হলো: প্রখ্যাত আইনজীবি ডঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত সভাপতি এবং অতুলচন্দ্র গুপ্ত সহ-সভাপতি।
ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ঃ কমিনটার্নের কার্যকরী সমিতির ষষ্ঠ প্লেনাম। মানবেন্দ্রনাথ প্রেসিডিয়ামের সভ্য এবং প্রাচ্য কমিশনের সভাপতি নির্বাচিত। তাছাড়া কমিনটার্নের সম্পাদক মন্ডলীর এবং অর্গব্যুরোর (সংগঠন ব্যুরো) সভ্য নির্বাচিত।
	ঃ ভারতবর্ষের রাজনীতির ভবিষ্যত (দি ফিউচার অফ ইন্ডিয়ান পলিটিক্স) রচনা ও প্রকাশ।

২২ নভেম্বর- ১৬ ডিসেম্বর	ঃ	কমিনটার্নের কার্যকরী সমিতির সপ্তম প্লেনাম।
	ঃ	মানবেন্দ্রনাথ ব্রিটিশ এবং কৃষি কমিশনের সদস্য, চিন কমিশনের যুগ্ম-সম্পাদক এবং রাজনৈতিক সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত।
ডিসেম্বরের শেষদিকে	ঃ	চিন যাত্রা।
১৯২৭, ফেব্রুয়ারী	ঃ	ক্যান্টনে উপস্থিতি।
১৯-২০ ফেব্রুয়ারী	ঃ	অতুলচন্দ্র গুপ্তের সভাপতিত্বে বেঙ্গল পেজান্টস এ্যান্ড ওয়ার্কস পার্টির দ্বিতীয় সম্মেলন।
৩১মার্চ-১ এপ্রিল	ঃ	বেঙ্গল পেজান্টস এ্যান্ড ওয়ার্কস পার্টির তৃতীয় সম্মেলন-অতুলচন্দ্র গুপ্তের সভাপতিত্বে নতুন নামকরণ, ওয়ার্কার্স এ্যান্ড পেজান্টস পার্টি।
এপ্রিল-মে	ঃ	চিন কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস।
আগস্টের প্রথম সপ্তাহ	ঃ	হ্যানকাও থেকে গোবি মরুভূমির মধ্যে দিয়ে মস্কো প্রত্যাবর্তন।
৩ অক্টোবর	ঃ	জার্মানির ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্তন।
নভেম্বর	ঃ	সোভিয়েত ইউনিয়নের দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত। জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে মস্কোয় সাক্ষাৎ।
	ঃ	সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু।
১৯২৮, ৯-২৫ফেব্রুয়ারী	ঃ	কমিনটার্নের অষ্টম প্লেনাম। ট্রটস্কি কমিনটার্ন থেকে বহিষ্কৃত।
মার্চ	ঃ	মানবেন্দ্রনাথ অসুস্থ; অস্ত্রোপচারের জন্য জার্মানিতে প্রত্যাবর্তন।
জুন	ঃ	আমেরিকার জে, লাভস্টোন, জার্মানির আগস্ট থ্যালহাইমার, হাইনরিখ ব্রান্ডলার এবং তাদের দলবল কমিনটার্ন থেকে বহিষ্কৃত।

আগষ্ট	ঃ	এলেন গটসচাকের সঙ্গে পরিচয়।
সেপ্টেম্বর	ঃ	কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেস। অসুস্থতার জন্য মানবেন্দ্রনাথ অনুপস্থিত। ভারতবর্ষ সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথের রিপোর্ট আলোচিত।
২৮ সেপ্টেম্বর	ঃ	দিল্লীর কেন্দ্রীয় বিধান কাল্পনিক সভায় মানবেন্দ্রনাথ রচিত এ্যাসেম্বলি লেটার সম্পর্কে আলোচনা।
১৯২৯, ২০ জানুয়ারী	ঃ	সোভিয়েত ইউনিয়ন হইতে ট্রটস্কী বহিস্কৃত তুরস্কের কনস্ট্যান্টিনোপল-এ।
ফেব্রুয়ারী	ঃ	প্রাভদা পত্রিকার সম্পাদকের পদ হইতে বুখারিনের অপসারণ।
২০ মার্চ	ঃ	মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা শুরু। ফিলিপ স্প্র্যাট প্রমুখ ৩১ জন গ্রেপ্তার ও অভিযুক্ত।
মার্চ	ঃ	কমিনটার্নের মুখপত্র ইনপ্রেকর পত্রিকায় মানবেন্দ্রনাথের শেষ লেখা প্রকাশিত।
৩-১৯ জুলাই	ঃ	কমিনটার্নের দশম প্লেনাম। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে এমনকি জওহরলাল নেহেরু ইত্যাদি কংগ্রেসের বাম-মনোভাবাপন্ন কংগ্রেসীদের সঙ্গে ইন্ডিপেডেন্স অফ ইন্ডিয়া লীগের সঙ্গেও সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছেদ করার জন্য ভারতীয় কমিউনিস্টদের প্রতি নির্দেশ।
	ঃ	ষষ্ঠ কংগ্রেস এবং দশম প্লেনামের মধ্যে মানবেন্দ্রনাথ ইনপ্রেকর পত্রিকায় ৫টি প্রবন্ধ লেখেন কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসের নীতির সমালোচনা করে।
	ঃ	দশম প্লেনামে কুসিনেন বলেন ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ্ ইন্ডিয়া লীগ এর সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করতে বলার জন্যই রায় কমিনটার্ন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে

বিরূপ সমালোচনা করেছেন।

সেপ্টেম্বর ঃ মানবেন্দ্রনাথের প্রথম রচনা, কমিনটার্নে সঙ্কট ব্রান্ডলারের পত্রিকা 'গেগেন ডেন স্ট্রাম'-এ প্রকাশিত।

ঃ ব্র্যান্ডলারের পত্রিকায় লেখার জন্য মানবেন্দ্রনাথকে কমিনটার্ন থেকে বহিস্কার করার সিদ্ধান্ত গ্রহন।

ঃ কমিনটার্নের প্রেসিডিয়াম থেকে বুখারিনের অপসারণ।

নভেম্বর ঃ কমিনটার্ন থেকে বুখারিন বহিস্কৃত।

ডিসেম্বর ঃ কমিনটার্ন থেকে মানবেন্দ্রনাথের বহিস্কার ঘোষণা।

১৯৩০ নভেম্বর ঃ মিঃ ব্যানার্জী ছদ্মনামে ভারতবর্ষের অভিমুখে যাত্রা।

১২ই ডিসেম্বর ঃ করাচীতে নাম পরিবর্তন করে ডঃ মাহ্‌মুদ নামে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন।

ডিসেম্বর ঃ জার্মান ভাষায় রচিত "রেভোলিউশন এ্যান্ড কাউন্টার-রেভোলিউশন ইন চায়না" প্রকাশিত।

১৯৩১, জানুয়ারী-জুলাই ঃ গোপনে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রচার ও সংগঠন। "Our Task in India" রচনা ও প্রকাশ। ঐ সময়ে বোম্বাই-এর সোস্যালিস্ট শ্রমিক নেতা, চার্লস ম্যাসক্যারেনহাস এর সম্পাদনায় রায়পন্থীদের পত্রিকা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া নামে প্রকাশিত হয়, মানবেন্দ্রনাথের রচনাসহ। ঐ পত্রিকাটিকে লীগ অফ্ ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স এর মুখপত্র হিসাবে অভিহিত করা হয়।

মার্চ ঃ জাতীয় কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনের জওহরলাল নেহরুর আমন্ত্রনে যোগদান।

২১ জুলাই	ঃ	বোম্বাই শহরে গ্রেপ্তার।
১৯৩১-৩৬	ঃ	জেলের মধ্যে লেখা প্রায় ৫০০০ পৃষ্ঠা সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ক নোট। বেশির ভাগই আজও অপ্রকাশিত।
১৯৩৬, ২০ নভেম্বর	ঃ	জেল থেকে মুক্তি। জওহরলাল নেহেরুর এলাহাবাদের বাড়িতে এক সপ্তাহ অতিথি, এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা।
ডিসেম্বর	ঃ	জাতীয় কংগ্রেসের ফৈজপুর অধিবেশনে ডেলিগেট নির্বাচিত, জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান।
১৯৩৭, ১০ মার্চ	ঃ	এলেন গটসচাকের সঙ্গে বিবাহ।
৬ এপ্রিল	ঃ	মানবেন্দ্রনাথ সম্পাদিত ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া সাপ্তাহিত পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত।
১৯৩৯, ২ সেপ্টেম্বর	ঃ	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু।
নভেম্বর	ঃ	মিঃ ব্যানার্জী ছদ্মনামে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা।
১২ ডিসেম্বর	ঃ	করাচিতে নাম পরিবর্তন করে ডাঃ মাহ্‌মুদ নামে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন।
ডিসেম্বর	ঃ	জার্মান ভাষায় রচিত রেভোলিউশন এ্যান্ড কাউন্টার-রেভোলিউশন ইন চায়না প্রকাশিত।
১৯৪০, মে-জুন	ঃ	অল ইন্ডিয়া লীগ অফ্‌ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন এর গ্রীষ্মকালীন স্টাডি ক্যাম্প।
২১ আগষ্ট	ঃ	মেক্সিকোয় ট্রটস্কিকে হত্যা।
সেপ্টেম্বর	ঃ	ফ্যাসিস্ট জার্মান সৈন্য কর্তৃক ফ্রান্স অভিযানের জন্য মানবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে ফ্যাসি-বিরোধী দিবস পালন; শোভাযাত্রা এবং প্রতিবাদ সভা সংগঠন করার জন্য মানবেন্দ্রনাথ কংগ্রেস হইতে বহিস্কৃত।

২৬ অক্টোবর ঃ ব্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রতিষ্ঠা।

৩০-৩১ ডিসেম্বর ঃ বেহালায় ন্যাশন্যাল ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন এম, এন, রায় আহুত কনফারেন্স প্রতিষ্ঠিত।

ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলন এবং জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রতি সমর্থন। পাটনা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ড্ঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ পৌরহিত্য করেন। ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চলের বুদ্ধিজীবি প্রতিনিধির যোগদান। প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন স্যার সুলতান আহ্‌মেদ, ড ঃ এন. বি খারে, মহঃ ইউনুস, কুনওয়ার আনন্দ সিংহ ইত্যাদি।

১৯৪২ ঃ সায়েন্টিফিক পলিটি' (বিজ্ঞান সম্মত বাজনীতি) ১৯০৪ সালে দেরাদুন স্টাডি ক্যাম্পে প্রদত্ত মানবেন্দ্রনাথের বক্তৃতাবলী প্রকাশিত।

৯ আগষ্ট ঃ ''ভারত ছাড়ো'' (কুইট ইন্ডিয়া) আন্দোলন শুরু।

ডিসেম্বর ঃ লক্ষ্ণৌ শহরে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির দ্বিতীয় সম্মেলন।

১৯৪৩ ঃ ফ্যাসিজম, ডি, এম, লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত।

১০ জুন ঃ কমিনটার্নের অবলুপ্তিকরণ।

১৯৪৪ ঃ পিপলস প্ল্যান রচনা ও প্রকাশ। যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।

ডিসেম্বর ঃ র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির কলিকাতা সম্মেলন। "স্বাধীন ভারতের সংগঠন'' - এর খসড়া অনুমোদন ও প্রকাশ।

১৯৪৫,

২৫এপ্রিল-২৬ জুন ঃ ইউনাইটেড নেশনস-এর প্রতিষ্ঠা এবং সংগঠন খসড়া।

৮-১৮ মে ঃ ১৯৪৬ সালের ৮-১৮ মে দেরাদুনে অনুষ্ঠিত গ্রীষ্মকালীন স্টাডি ক্যাম্পে প্রদত্ত

		মানবেন্দ্রনাথের বক্তৃতাবলী "নিউ ওরিয়েন্টেশন" প্রকাশিত।
১৯৪৬	ঃ	ইন্ডিয়ান রেনেশাঁস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা।
ডিসেম্বর	ঃ	বোম্বাই শহরে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির ৪র্থ সর্বভারতীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত।
১৯৪৭, ১৫ আগষ্ট	ঃ	ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ ও বঙ্গ-বিভাগ।
১৯৪৮, ডিসেম্বর	ঃ	নয়া মানবতাবাদ এবং ডেমোক্রেটিক পার্টি কর্তৃক নয়া মানবতাবাদ অনুমোদন ও পার্টির অবলুপ্তি ঘোষণা।
	ঃ	রেনেশাঁস আন্দোলন শুরু।
১৯৪৯-৫২	ঃ	স্মৃতিকথা ঃ অমৃতবাজার পত্রিকা এবং র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট পত্রিকায় সাপ্তাহিক কিস্তিতে প্রকাশিত।
১৯৫২, জুন	ঃ	মুসৌরীতে পাহাড়ে রাস্তায় পা হড়কে পড়ে গিয়ে আঘাতপ্রাপ্তি, পাঁজরার হাড় ভেঙ্গে, এবং পরে হৃদরোগে আক্রান্ত হন।
১৯৫২, আগষ্ট	ঃ	রিজন রোমন্টিসিজম এ্যান্ড রেভোলিউশন (১ম ভলিয়ুম) প্রকাশিত।
১৯৫৩, ৫ মার্চ	ঃ	স্টালিনের মৃত্যু।